উপমহাদেশের
রাজনীতিতে
সাম্প্রদায়িকতা
ও
মুসলমান
ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ

উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা
ও
মুসলমান

আবদুল ওয়াহিদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনেরো শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান

ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ

প্রকাশকাল :

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ; মাঘ ১৩৮৮ : রবিউসসানি ১৪০৩

ই. ফা. প্রকাশনা : ৯৭২

ই. ফা. গ্রন্থাগার : ৯৫৪'০৩

প্রকাশক :

শাহাবুদ্দীন আহমদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

প্রচ্ছদ শিল্পী :

এম. এ. কাইয়ুম

মুদ্রক :

মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দৌলাহ্‌, পাহ্‌লোয়ান

পাহ্‌লোয়ান প্রেস

৫৫, উত্তর শাহজাহানপুর

ঢাকা—১৭

বাঁধাইকার :

ফ্রেন্ডস বুক বাইন্ডার্স

৩৪, রূপচান দাস লেন, ঢাকা-১

মূল্য : ৩৮'০০ টাকা

UPOMOHADESHER RAJNITITEY SAMPRODAEY-KATA O MUSALMAN : Commualism in Politics of the Sub-continent and Musalmans written by Dr. Abdul Wahid and published by the Islamic Foundation Bangladesh to celebrate the fifteenth century Al-Hijrah.

Price : Tk. 38·00; U. S. Dollar : 4·00 February 1983

উপমহাদেশের রাজনীতিতে
সাম্প্রদায়িকতা
ও
মুসলমান

উৎসর্গ

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উপমহাদেশের যে অগণিত অজানা-অচেনা স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ যাঁহারা একদিন বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামে হাসি-মুখে প্রাণ দান করিয়াছিলেন এবং হীন রাজনীতির চক্রান্তের শিকার হইয়া যাঁহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের আত্মার সম্মানে এই পুস্তকখানি শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করিলাম।

আবদুল ওয়াহিদ

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

অনেকের ধারণা ভারত-বিভক্তির প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্যা। এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্যে কে বা কারা দায়ী তা নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। কারও কারও মতে এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য মুসলমানরা দায়ী; কারও মতে হিন্দুরা দায়ী এবং কারও মতে বৃটিশ সরকার দায়ী। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান' নামক বর্তমান গ্রন্থে সেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে লেখক্ জনাব আবদুল ওয়াহিদ প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। 'বিভক্তিকরণ ও রাজ্য শাসন' নামক বৃটিশ প্রশাসন-নীতি এর জন্যে যে অনেকখানি দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও লেখকের মতে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। লেখকের প্রশ্ন সেটা একমাত্র কারণ হলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রনীতি সেই ভারতে এখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কেন হয় ? এখন ত সেখানে বৃটিশ সরকার নেই এবং সেই সাথে মুসলমানদের দাঙ্গা করার মত জনবল, অস্ত্রবল ও মনোবল কোনটাই নেই। তাহ'লে কি এটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে না নিগৃহীত মুসলমানদের আত্মরক্ষার ফরিয়াদ সাম্প্র-দায়িক চেতনা নয় সে হ'ল জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাত্র। তবুও মুসলমানদের উপর সাম্প্রদায়িকতার সমস্ত দায়িত্ব চাপানোর পিছনে যে কারণ আছে সে কারণ এই বর্তমানের শুধু নয় তার কারণ আরও পূর্বের ও দীর্ঘ দিনের। ইসলামের উজ্জ্বল আবির্ভাবে যে সমাজ আপনার মৃত্যুর পরওয়ানা দেখেছিল সে তার হৃৎপিন্ডে দাঁত বসিয়ে তার উদয়ের প্রাক্কালেই তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়। সে ব্যর্থ হয় কিন্তু তার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়ার পিছনে সেই প্রচেষ্টার কারণ যে বর্তমান তাতে সন্দেহ নেই। লেখক গভীর পরিশ্রমে সত্যানুসন্ধিতসু দৃষ্টি নিয়ে ঐ জটিল বিতর্কের একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁর বইতে। ইতিহাসের এই গভীর ব্যাখ্যাটি তাঁর গ্রন্থে পুরোপুরি দৃষ্ট না হলেও সাম্প্রদায়ি-

কতার সৃষ্টিউৎস হিসাবে যেগুলোকে কারণ হিসাবে লেখক দেখেছেন সে গুলোকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী উপমহাদেশের সামাজিক ইতিহাসকে তিনি পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন প্রতিকূল সময় এবং দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রামরত পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে। রাজ্যহারা মুসলিমরা বৃটিশ শাসনামলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, পরিণত হয় অনুন্নত সমাজে। অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের প্রচাপে সে সর্বহারার স্তরে নেমে যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার তার লড়াইকে ন্যায়ের সংগ্রাম না বলে সেটাকেই অনেকে সাম্প্রদায়িক সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে চিহ্ন করণের চাতুর্যকে অনুধাবন করতে না পেরে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীও তাকে সমর্থন করতে দ্বিধা করেন নি। লেখক এতে বেদনাবোধ করেছেন এবং সে জন্যেই এর সত্য ইতিহাস উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছেন।

এই ঐতিহাসিক বিষয়ের অন্তর্গত গভীরের সংগে যেহেতু ইসলামের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে সে কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করা আমরা একটি জরুরী প্রয়োজন বলে মনে করি। গ্রন্থটি কেবল ঐতিহাসিকদের নয়, সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষয়টি সম্বন্ধে কৌতুহলী পাঠকদেরও যে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে তাতে সন্দেহ নেই।

জনাব আবদুল ওয়াহিদ পেশাগতভাবে এলোপ্যাথি ডাক্তার। কিন্তু দীর্ঘ দিন তিনি রাজনীতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এর ফলে এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বাস্তব জ্ঞানও অর্জন করেছেন। বইটি নিঃসন্দেহে তাঁর সেই জ্ঞানের ফসল।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে রহমানুররহিম আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাই।

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসাবে এই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার যেমন সুযোগ পাইয়াছি তেমনিভাবে তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কর্ম-তৎপরতা অনুধাবন করিবার সুযোগও পাইয়াছি যথেষ্ট। আমার শৈশবের শেষ অধ্যায়ে, ১৯২৬ খৃস্টাব্দে সংঘটিত কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা সর্বপ্রথম শুনিতে পাই। তখনকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক একটি এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। এবং প্রাণহানী অপেক্ষা মারপিট, খুনজখম, সম্পত্তি লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ছিল এইসব দাঙ্গার কার্যক্রম। যাহাই ঘটুক না কেন বিগত ষাট বছরে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহু বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি ও পরোক্ষভাবে শুনিয়াছি। এই সকল দাঙ্গার নৃশংসতা ও হিংস্রতার যে বিবরণ জানিতে পারিয়াছি তাহা যে কোন মানুষ দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে তাহা চিন্তাও করিতে পারি নাই। এইরূপ দাঙ্গার উদ্দেশ্য যে কি প্রথম দিকে তাহাও যেমন বুঝিতে পারিতাম না তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক অত্যাচার সকল সময়ই আমাকে বিচলিত করিত।

রাজনৈতিক নেতাগণ এক সময় বলিতেন, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী যখন এই দেশ হইতে চলিয়া যাইবে তখন এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হইয়া যাইবে'। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ যদি ইংরাজের শাসন হইয়া থাকে তবে দেশের রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলো তাহার প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিল কেন ? সত্যিকার রোগ যদি ধরা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সুচিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা বিঘ্নিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ইহার পরেও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। নানাভাবে নানা

কারণে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং পরবর্তীকালে এইরূপ সমস্যা সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ ধারণ করিয়াছে। ক্ষয়ক্ষতি যথাযথভাবে হইয়াছে। ধন-সম্পত্তি, জান ও মালের ক্ষতি যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু নেতাদের সেই একই কৈফিয়ৎ—ভারত স্বাধীন হইলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

যখন দেশে এরূপ অবস্থা বিরাজ করিতেছিল তখন বহু হিন্দু জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য মনোভাব লক্ষ্য করি নাই। সংখ্যালঘুদের মত তাঁহারাও সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

তাহার পর অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুধাবন করার সুযোগ পাই যাহাতে আমার কাছে এই বিষয়টি যথেষ্ট পরিষ্কার হইয়া যায় যে, তিনটি স্বার্থের সংঘাতই এইরূপ নিকৃষ্ট কার্যকলাপের জন্য দায়ী :

১। বৃটিশ কর্তৃক বৃটিশ শাসনকে দীর্ঘায়িত করা।

২। উচ্চ বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজে নেতৃত্ব দান ও কর্তৃত্ব রক্ষার চেষ্টার সাথে সাথে সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্প্রদায়গতভাবে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও স্বচ্ছলতা বজায় রাখিবার চেষ্টা।

৩। দীর্ঘদিন বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের পর সংখ্যালঘু মুসলমান-দের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং অধঃপতিত সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝা-বুঝির বিষয়গুলি আলোচনা মারফৎ অনয়াসে সমাধান করা যাইতে পারিত কিন্তু দেখা যায় বৃটিশ শাসকশ্রেণী সকলের বুদ্ধি ও বিবেচনার অন্তরালে এমন নিখুঁতভাবে এই সকল সমস্যার মধ্যে ধর্মকে টানিয়া আনিয়াছে এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রম চিন্তাধারার সুযোগ

লইয়া হিন্দুদের লালিত-পালিত করিয়াছে তাহাতে সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দুমনে এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বিদেশী, অচ্ছুৎ এবং অত্যাচারী বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। আর ম্লেচ্ছ, বিদেশী, গো-মাংসখাদক বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়াছে; এবং তাহাদেরই ইঙ্গিতে এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমানে বৃটিশ সরকার নাই, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাও নাই। এখনও মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাহা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয় নাই। এই বিষয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম যে আপনারা ভারতকে স্বাধীনতা দিবার পূর্বে ধর্মান্ধতার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় সমাজকে উপহার দিয়াছেন তাহা ফেরৎ লইবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা ভারত বাসীর সকল নৈতিকতা অচিরেই নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার সে অনুরোধের কোন যোগ্য উত্তর পাওয়া যায় নাই। দেখা যায় বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও হরিজনের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা আর এক রূপ গ্রহণ করিয়া আঞ্চলিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে অর্থাৎ বিভেদকামী মনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি আপন জনকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সেইজন্যই গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ উপমহাদেশে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং দেশের সকল বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য নষ্ট করিতেছে। বৃটিশ আমলে কিভাবে এইরূপ চিন্তাধারা ও মনোভাব সমাজে সংক্রমিত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একমাত্র পাঠকগণই বলিতে পারিবেন এই বিষয়ে কতটুকু সফলকাম হইতে পারিয়াছি।

গ্রন্থটির পান্ডুলিপি পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করিয়া দিয়াছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ। ইহার শীর্ষ ও উপশীর্ষ নামগুলিও তাঁহারই দেওয়া। পাঠকের বুঝিবার জন্য ইহা যে অনেকখানি সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রখ্যাত মৌলানা মুহিউদ্দিন খান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেবের উৎসাহ না পাইলে এই পুস্তক ছাপাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। সামান্য ধন্যবাদে তাহাদের ঋণ শোধ হইবার নয়।

পান্ডুলিপি লেখায় যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছেন তিনি আজ ইহজগতে নাই। সেই স্বর্গীয় শ্রীমনোমোহন গুপ্তকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার পর আমার স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক অবদুস সাঈদ, জনাব শামসুজ্জোহা চৌধুরী এবং আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা আবদুর রশীদের নাম উল্লেখ না করিলে অকৃজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

পরিশেষে জানাইতেছি বইটির মধ্যে দুঃখজনকভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। ইহার কিছুটা অপনোদনের জন্যে বইয়ের শেষাংশে একটি সংশোধনী সংযোজন করা হইল। আশা করি পাঠক নিজগুণে এই অবাঞ্ছিত ত্রুটি মার্জনা করিয়া গ্রন্থটির সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করিবেন।

— আবদুল ওয়াহিদ

উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান

প্রথম অধ্যায়

বিভাগ-পূর্ব ভারতকে মুসলমানরা নিজেদের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কোনদিন তাহারা নিজেদের বহিরাগত বলিয়া মনে করে নাই। দেশের শান্তি রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষাকেও তাহারা নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়াছিল। বলা বাহুল্য মুসলমান বলিয়া ইসলামী নীতি সমূহ তাহাদের বিশ্বাসের অর্থাৎ ঈমানের অংশ ছিল। সেজন্য ভারতের মুসলমান কর্তৃক জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক লিখিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ঔরঙ্গজেবের পর হইতে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণেই হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয় নাই। মুসলমানদের প্রতি অভিযোগ এবং ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ দিল্লীর সম্রাটদের নানা প্রকার দুর্বলতা এবং রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় অক্ষমতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ বিচার বিভাগের অব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ মারাঠা, জাঠ, মগ ও বর্গী কর্তৃক জনপদের উপর আক্রমণ, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অব্যবস্থা ও খাজনা আদায়কারীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিকারকল্পে উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিকামী লোকেরা বলিষ্ঠ রাজনীতি ও শক্তিশালী শাসনকর্তার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এরই পাশে পাশে সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর লোকেরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকিয়া, সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া, আপন স্বার্থসিদ্ধি করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

দেখা গিয়াছে বাংলার বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের বিশেষ ক্ষোভ ছিল না। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার পতনের জন্য যাঁহারা দায়ী সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান বাকী চারজন ছিলেন হিন্দু। তাঁহাদের অভিযোগের মধ্যে সত্য

যে ছিল না তাহা নয় তবে স্বার্থসিদ্ধিই ছিল তাঁহাদের মৌল আকাঙ্ক্ষা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনব্যবস্থার মধ্যে দুর্বলতা হয়ত ছিল, যে কথা তাঁহারা প্রচার করিতেন। তবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রচেতনা সম্পর্কে তাঁহাদের চরিত্রের যে অজ্ঞতা ধরা পড়ে তাহাও সন্দেহাতীত। কিন্তু এরূপ অবস্থা এতখানি নগ্নভাবে দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে ধরা পড়ে নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রাজধানী হইতে দূরবর্তী প্রদেশসমূহে দিল্লীর সম্রাটের শাসন ব্যাবস্থার দুর্বলতা এবং কোন কোন শাসনকর্তার নির্বুদ্ধিতা হেতু প্রজাপালনের অব্যবস্থা। সেখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মনে স্বার্থসিদ্ধির হীন মনোভাব হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ইহার প্রতিরোধ করিবার অক্ষমতা দেশের ভিতরে ও বাহিরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। ওদিকে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির অধীনে শাসন-ব্যবস্থা চলিয়া যাইবার পর হঠাৎ ভারতবাসীর সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়। সে তাহার নির্বুদ্ধিতার কারণ বুঝিতে সক্ষম হয় এবং তাহা অপনোদন করার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়। ইহারই ফল স্বরূপ একদল মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু হিন্দুদের একাংশ এই পরিবর্তিত অবস্থাকে প্রভু বদল মাত্র মনে করে এবং তাঁহারা নতুন প্রভুর অধীনে মনের আনন্দে চাকুরী করা নিরাপদ ও উত্তম মনে করে। বৃটিশ কর্তৃক নব গঠিত করদ ও দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকবর্গ বৃটিশ সরকারের সর্বপ্রকার সন্তুষ্টি সাধনে ব্যস্ত থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে হিন্দু শাসকগণ সংখ্যায় ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহারা বৃটিশ সরকারের সর্বপ্রকার সন্তোষসাধনে ব্যস্ত থাকেন। ইঁহারা বৃটিশ রাজশক্তির যথেষ্ট আস্থাভাজন ছিলেন। মুসলিম শাসকেরা নানা কারণে বৃটিশের সন্ধিগ্ধদৃষ্টি হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই। তাহার অন্যতম কারণ হায়দরাবাদ এবং মহীশূরের শাসনকর্তার পুত্রদের মুসলিম জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ইঁহারা পরে তাঁহাদের পিতা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও শাসনকর্তা পিতা বৃটিশ বন্ধুদের কাছে পূর্ণ

আস্থাভাজন হইতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও অধিকাংশ মুসলমান রাজাদের বৃটিশ সরকারের শাসনবিরোধী ব্যবহার বৃটিশের সন্দেহের কারণ হইয়া উঠে। আর সাধারণ হিন্দু-মুসলমান পরিবর্তিত রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া ভাগ্য ও আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই শ্রেয় মনে করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল কেন? ইহার উত্তরে যে সকল যুক্তি ও তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা একাধিক উর্দু ঐতিহাসিক স্পষ্ট করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক মিঃ হান্টারও ইসলামের ধর্মপালন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে জেহাদের মৌলিক শর্তাবলীর আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে নিজ মাতৃভূমি বা জন্মভূমির শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ সঙ্গত ছিল। যাহারা দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ধর্মপালনে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এবং দেশের শান্তি বিনষ্ট করে তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইত না। সেই সময়কার হিন্দুদের মনোভাব বিবেচনা করিয়া ভারতীয় মুসলমানরা ভারতের বিভিন্ন আলেমদের অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান পণ্ডিতদের সহিত আলোচনা করিয়া নিজেদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ করা স্থির করিয়াছিলেন। মক্কা হইতেও তাহারা এ বিষয়ে ফতোয়া আনাইয়াছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বৎসরেরও অধিককাল ভারতের বিভিন্ন স্থানের তেজোদৃপ্ত মুসলমান যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের বৃটিশের সকল সামরিক অস্ত্রের সম্মুখে কোরবানী হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। হাজার হাজার মুসলমান যুবককে বৃটিশের বিচারালয়ে বিচারের নামে প্রহসন লক্ষ্য করিতে, জেল, কালাপানি ও ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করিয়াছিল।

উত্তর বাংলার মালদহ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বস্থিত সকল গ্রাম, জনপদ ও শহর হইতে এই যুদ্ধে যেমন লোক ও অর্থ

সরবরাহ করা হইয়াছিল তেমনি বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সুদূর হায়দরাবাদ, মহীশুর ও বোম্বাই হইতেও কোরবানীর উন্মাদনায় গৃহের সকল শান্তি ও সুখ ত্যাগ করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমান যুবকগণ ছুটিয়া গিয়াছিল। সারা ভারতের সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের জন্য চলিতেছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গিরিপথে এবং পাঞ্জাবের পাহাড়িয়া সীমান্তে এই যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সেদিন এমন কোন স্লোগান ছিল না, এমন কোন দোহাই ছিল না, এমন কোন আহবানও ছিল না যাহা এইরূপ বিপুল পরিমাণে ধন, জন ও সকল স্বার্থ ত্যাগের জন্য জনমনে চাঞ্চল্য আনিতে পারিত, প্রেরণা ও উম্মাদনা আনিতে পারিত। প্রতিবেশী হিন্দুদিগের সহিত শান্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া আক্রমণকারী বিধর্মী ও শত্রুশক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি ছিল একমাত্র লক্ষ্য আর সে জন্যই একদল মুসলমান এই পথ বাছিয়া লইয়াছিল। তাহাদিগের আত্মাহুতি পরবর্তী কালে যে প্রেরণা দিয়াছিল তাহার ফলে সম্ভবপর হইয়াছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। বলা বাহুল্য এই সব অসফল যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা বোধ হয় ভবিষ্যতে মুসলমানদের বৃটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরূপে অস্ত্রধারণ করিতে অনেকটা কুন্ঠিত করিয়াছিল।

দীর্ঘ প্রায় একশত বৎসর পরেও প্রেরণার উৎস হিসাবে, জাতীয়তাবাদের উৎস হিসাবে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ এইরূপ ধর্মবাণীর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে আহবান জানাইয়াছিলেন (গান্ধীজী কর্তৃক ব্রহ্মরাজ্য স্থাপন) সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। দীর্ঘকাল এইরূপ যুদ্ধের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাকে দারুলহরব্ আখ্যা দিয়া কেবলমাত্র ইংরাজদিগের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের যে কোন প্রকার মনোমালিন্য দেখা যায় নাই তাহাই নহে বরং

যে সব হিন্দু নৃপতি শাসিত রাজ্যে মুসলমানরা বাস করিত সেই সব রাজ্যকেও কোনদিন দারুল-হরব্ বা বিধর্মী শত্রু শাসিত দেশ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। কিন্তু হিন্দু নৃপতি ও জনসাধারণের অংশ বিশেষ মুসলমানদিগের প্রতি ক্রমেই বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ওঠেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তখনও কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বা ভুল বুঝাবুঝির অবস্থা সৃষ্টি হয় নাই।

ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের উপর বৃটিশ সভ্যতা ও শিক্ষা ধর্মীয় জীবনের উপর যে প্রচন্ড আঘাত হানিয়াছিল তাহার ফলেই ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ বেরিলীর বিদ্রোহ শুরু হয়, ১৮৩১-৩২ খৃঃ ছোট নাগপুর অঞ্চলেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ও কোল বিদ্রোহ হইয়াছিল। এই সময়েই বঙ্গদেশের বারাসতে তিতুমীরের, ১৮৪৭ খৃঃ ফরিদপুরে দুদুমিয়ার এবং ১৮৫৫—৫৬ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। পাঞ্জাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে শিখদের এবং আফগানিস্তানে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কাবুলীদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মদানের সাক্ষ্য বহন করে। প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব বিদ্রোহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলিম বিদ্রোহী কিন্তু কোথাও শিক্ষিত কিম্বা বর্ণহিন্দুদের কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাহার পর সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধন ভারতীয় নৃপতিদের অনেককে নিতান্ত অসহায় করিয়া তোলে। ডালহৌসী কর্তৃক মোগল সম্রাটকে তাঁহার প্রাসাদ হইতে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব যেমন মুসলমানদের ক্ষোভের সঞ্চার করে তেমনি অযোধ্যাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করিবার ফলে হিন্দুদের মনেও যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কার্তুজে চর্বি থাকিবার জন্যই হউক কিংবা পরিবর্তিত অবস্থার জন্যই হউক যে সিপাহী বিদ্রোহ

বাংলার বহরমপুর ও ব্যারাকপুর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ও মধ্য ভারতে বৃটিশবিরোধী যুদ্ধের তান্ডব সৃষ্টি করে তাহাতেও দেখা যায় যে মিরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মধ্যভারত, বুন্দেলখন্ড, অযোধ্যা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান যোদ্ধা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন ছিলেন তেমনি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরশাহ ও অযোধ্যার বেগম সর্বশক্তি দিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইংরাজকে সাহায্য করিবার জন্য যাহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে দেশীয় নৃপতি ও সামন্তগণ যেমন ছিলেন তেমনি নেপালের জংবাহাদুর, গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দীপঙ্কররাও ও শিখগণ ছিলেন। ঐতিহাসিক স্যার ফুলার, মিঃ হান্টার, কার্লমার্কস সিপাহী বিদ্রোহের সকল তথ্য আলোচনা করিয়া নিতান্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে "সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে ইংরাজের বিরোধিতা করিলেও এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং তাহারাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ." (মিত্র, দি ইন্ডিয়ান এনুয়েল রেজিষ্টার ১৯৩৬ ভলিউম ১, পৃষ্ঠা ৬০ ও স্যার জন ক্যানিং এর পলিটিক্যাল ইন্ডিয়া)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "সেদিন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বেরিলী, মিরাট, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রকাশ্য রাজপথের উপর হাজার হাজার মুসলমানকে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করিয়াছিল ইংরাজ শাসক শ্রেণী "

তাঁতিয়া তোপী প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন আর অগণিত আবাল-বৃদ্ধ মুসলমান নর-নারীর উপর বৃটিশ যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইয়াছিল তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসলমানেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিল। সেই বিদ্রোহ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত নির্বাপিত হয় নাই। ভারতের হিন্দু পক্ষ, সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের পর ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লয়। ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কোন একজন কর্মচারী কোম্পানীকে বিদ্রোহ অবসানের পর লেখেন,"হিন্দুরা আমাদের বন্ধু, কিন্তু মুসলমানরা

এখনও আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন, সেই জন্য তাহাদের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করা কর্তব্য।"—(দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, উইলিয়াম হান্টার)

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর সাধারণ সৈনিক পদেও যে সব মুসলমান চাকুরী করিতেছিল তাহাদের বেশীর ভাগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতা করার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয় এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অযোধ্যার বেগমের প্রাসাদে, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌয়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রতিটি গৃহে চলে ইংরেজদের নারকীয় তাণ্ডব। সেদিনও ভারতীয়দের মনে, ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী স্ফূরিত হয় নাই; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণদানের যুক্তি গ্রহণ করিয়া নেতৃত্বদান করিয়াছিল সাধারণ ভারতীয় মুসলমানগণ। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও ভারতের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় কোন প্রকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পরে নাই।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ হান্টার তাঁহার "ভারতীয় মুসলমান" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "১৮৫৮ সালের পূর্বে হিন্দুস্তানী মুজাহিদ মুসলিম আদি জাতিদের সহিত বৃটিশ সৈন্যের যুদ্ধে যে পরিমাণ অপমান, উৎপীড়ন ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়াও বলিতে হয় যে, সকল সময় মুজাহিদরা বৃটিশ শক্তির সহিত দীর্ঘদিন বিরামহীন সংগ্রাম ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৮৫০ হইতে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এইরূপ যুদ্ধের সংখ্যা ছিল অন্ততঃ কুড়িটি এবং তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য বৃটিশের প্রয়োজন হইয়াছিল ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের। ইহা ব্যতীতও অস্থায়ী সৈন্য ও পুলিশদলও ছিল যথেষ্ট। যাহাদের মধ্যে হিন্দু সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক। ১৮৫৭ সালে তাহারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হইল এবং তাহার পরে তাহারা স্পর্ধার সহিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাহিয়া বসিল এবং তাহাদের জন্য জাকাত আদায় করিয়া দিতে বলিল। আমাদের পক্ষ হইতে এইরূপ নির্দেশ অস্বীকার করার ফলে তাহারা জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্যুত গতিতে আক্রমণ করিল।"

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "১৮৬২ সালে হিন্দুস্তানী মুসলিম জেহাদীদের সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল যাহার জন্য পাঞ্জাব সরকার একটি সীমান্ত যুদ্ধের সুপারিশ করিতে বাধ্য হইল। ১৮৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মুজাহিদ বাহিনী বৃটিশ এলাকায় হামলা করে। সেই মাসেই থানাওয়ালের মিত্র-সৈন্যদের উপর নতুনভাবে আক্রমণ চালায় ও প্রত্যেক ধর্মভীরু মুসলমানকে এইরূপ জেহাদে যোগদান করিতে আহ্বান জানায়। যতদিন আমরা মুজাহিদদের উপর নজর দিই নাই ততদিন তাহারা দলে দলে হামলা করিয়া আমাদের ও মিত্রদের সৈন্যদের ধরিয়া লইয়া যাইত কিংবা হত্যা করিত আর যখনই শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের নির্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছি আমাদের সৈন্যদের মারাত্মকভাবে পরাজিত করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যগুলিও কম হিংস্র ও ধর্মান্ধ ছিল না। সিন্ধুনদের তীরে পূর্বদিকের কালা পাহাড় ঘুরিয়া ইহাদের অবস্থিতি এবং এ্যাবটাবাদে অবস্থিত আর একদল অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যদের তীক্ষ্মদৃষ্টি তাহাদের সকলকে সর্বদা সংযত রাখিতেছিল। ১৮৬৩ সালে এইরূপ ষাট হাজার সৈন্য সশস্ত্র হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়।"

তাহার পরও এইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া যায় এবং সিপাহী বিপ্লবের অবসানের পরও হিন্দুস্তানী মুজাহিদরা যে বৃটিশের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ও ধর্মরক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শসস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়াছিল তাহা মিঃ হাণ্টারের লিখিত তথ্য হইতেই প্রকাশ পায়। ১৮৬৮ সালের পর মুজাহিদ বাহিনী শ্রান্ত, ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনের চাপে এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বৃটিশবিরোধী জেহাদী যুদ্ধ স্তিমিত হইয়া আসে এবং ১৮৭৩ সালের প্রথম দিকে সকল রণাঙ্গণে শুদ্ধতা বিরাজ করিতে থাকে। ইহাই হইল ১৮২০ সাল হইতে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের একটানা বৃটিশবিরোধী রাজনীতি ও যুদ্ধের ইতিহাস।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের পক্ষে স্বাধীনতার জন্য সর্ব প্রকারের

ত্যাগ ও আত্মদান কংগ্রেস ও ভারতীয় হিন্দু কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ বিশেষ বলিয়া স্বীকৃতি পায় না। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের এইরূপ যুদ্ধকে ধর্মান্ধতার ফল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং সেইভাবেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ইহার ফলে মুসলমানদের মনে ক্ষোভের ও দুঃখের সঞ্চার হয়। অনেক ইতিহাসে এইরূপ যুদ্ধকে বৃটিশের সহিত উপজাতীয় অসভ্য মুসলদের সংঘর্ষ বলিয়া যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা যে কত অসত্য তাহা মিঃ হান্টারের মন্তব্য হইতে সহজেই অনুমান করা সম্ভবপর।

সিপাহী বিপ্লবের অবসানের পরে ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ভারতের শাসনভার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনে যায় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারাণীরূপে ঘোষিত হন। মহারাণী ভারতের সকল প্রজাদের প্রতি সমান ব্যবহার এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সকল সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকেই সমান সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এইরূপ ঘোষণার ফলে ভারতের শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় কৃতার্থবোধ করেন এবং মুসলমাদের অংশ বিশেষ তাঁদের অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ আসিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের শেষ পর্যায়ে, ভারতে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক হিন্দু সমাজের এক বিরাট পরিবর্তন অন্যতম। তাহারা একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে ধর্মসংস্কারে মন দেন। তাহাদের লক্ষ্য ছিল দেশের শিক্ষিত সন্তানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও সভ্যতায় সংস্কৃতিবান করিয়া তোলা। ইহাতে তাঁহারা যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেন। কেবলমাত্র তাহাই নহে এই সময়ের মধ্যে পূর্ব হইতে হিন্দু সমাজে যে সকল কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছিল—যেমন শিশু হত্যা, সতীদাহ, বিধবা বিবাহে বাধা প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ

ইংরাজ শাসক শ্রেণীর সাহায্যে তাঁহারা ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। ক্রীশ্চান পাদ্রীগণ কর্তৃক বাংলা ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং গদ্য সাহিত্য রচিত হইতে থাকে। এই সময়েই শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ বহু মনীষী হিন্দু সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। হিন্দু মনীষীর দ্বারা ইংরাজী ধরণের স্কুল ও কলেজ প্রবর্তিত হয়, মেডিকেল কলেজও স্থাপিত হয়। শুধু নিজেদের প্রয়োজন মোতাবেক হিন্দুদের শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বৃটিশ সরকার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, তেমনি সকল সরকারী দপ্তরে, সকল বিভাগের সকল পদে হিন্দুদেরকে চাকুরী দিবারও ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন ইংরাজ সরকার তাহাদের কর্মসূচী এই পর্যায়েই কেবল সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল তাহা নহে বরং হিন্দু জনসাধারণের মনে মুসলমানদিগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের কোন প্রকার ত্রুটি করে নাই। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পরেও যখন সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছিল ও বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছিল তখন সরকারী আওতায় তাহাদের দমন করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে-ছিল তেমনি নানা গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবার চেষ্টও করিয়া-ছিল। অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলা প্রদেশেও এইরূপ চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি হয় নাই। তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকজন লেখকের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সুসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার লিখিত গল্প, কাহিনী, উপন্যাসের মধ্যে "আনন্দমঠ" উল্লেযোগ্য। এই পুস্তকখানি লিখিত হইবার পর তদানীন্তন বাংলা দেশের হিন্দুরা তাঁহাকে ঋষি উপাধী দ্বারা সম্মানীত করেন। এই উপন্যাসটির মধ্যে ভারতীয় হিন্দুদের স্বাদেশিকতার নামে, দেশাত্মবোধ শিক্ষার নামে "নেড়েমার" আহবান দ্বারা ভারতের মুসলমানগণকে নিগৃহীত করিবার প্রেরণাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেইদিনও এইরূপ শিক্ষিত সমাজে ভারতের

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তাবোধ অজ্ঞাত ছিল তাহাই নহে বরং এইরূপ সমাজে একদিকে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি যেমন সক্রিয় ছিল তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাবও প্রকটভাবে দেখা যাইত। অন্যদিকে ইংরেজ প্রভুদিগকে ভারতের মাটিতে চিরস্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হিল না। যদিও নূতন ভাবে হিন্দুরা মুসলমানদের অচ্ছুত ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলিয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা দিতে থাকে ধর্মের নামে তখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের কারণ ঘটে নাই, কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিপর্যয় দেখা দিতে থাকে। তাহা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণভাবে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই এবং ইংরেজবিরোধী মনোভাবও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বিশেষ করিয়া মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ইংরেজগণ বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করিলে সকলের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

এই সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট নিম্ন পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে তাহাদের নিয়োগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ থাকে। এই অবস্থা সম্পর্কে মিঃ হান্টার সরকারী দপ্তর হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি বিবরণী দিয়াছেন। তাহা হইতে ১৮৭১ সালের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন বাংলাদেশে ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান চাকুরী-জীবীদের সংখ্যা জানিতে পারা যায়। নিম্নে খতিয়ানটির উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

বিভাগ	ইংরাজ	হিন্দু	মুসলমান	মোট
কভেন্যান্টেড্ সিভিল (ইংল্যাণ্ডের মহারাণী নিযুক্ত)—	২৬০	—	—	২৬০
নন-রেগুলেটেড জিলা সমূহে বিচার বিভাগের কর্মচারী—	৪৭	—	—	৪৭
একষ্ট্রা এসিসটেন্ট কমিশনার—	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার—	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬

বিভাগ	ইংরাজ	হিন্দু	মুসলমান	মোট
ইনকাম ট্যাক্স এসেসর—	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট—	৩৩	২৫	২	৬০
ছোট আদালতের জজ ও সাব জজ—	১৪	২৫	৮	৪৭
মুন্সেফ—	১	১০৮	৩৭	১৪৬
পুলিশ বিভাগের সর্বশ্রেণীর গেজেটেড অফিসার—	১০৬	৩	০	১০৯
পি, ডাব্লু, ডি, ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ—	১৫৪	১৯	০	১৭৩
ঐ নিম্ন বিভাগ—	৭২	১২৫	৪	২০১
ঐ একাউন্ট বিভাগ—	২২	৫৪	০	৭৬
চিকিৎসা বিভাগ, মেডিকেল কলেজ, জেলা দাতব্য হাসপাতাল প্রভৃতি জেলাসমূহের ডাক্তার ইত্যাদি—	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
শিক্ষা বিভাগ—	৩৮	১৪	১	৫৩
কাস্টম, মেরিন সার্ভে আবগারী প্রভৃতি বিভাগ—	৪১২	১০	০	৪২২
সর্বমোট—	১৩৩৮	৬৮১	৯২	২০৪১

ইহা হইতে বোঝা যায় যে গত একশত বৎসরের মধ্যে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ক্রমেই কিভাবে হীন হইতে হীনতর হইয়া আসিতেছিল। মিঃ হান্টার আরও লিখিয়াছেন যে,অনেক ক্ষেত্রে চাকুরীর বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইত। এইভাবেই হাইকোর্ট ইত্যাদি বিভাগে একটি মুসলমানকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। উকিল, ব্যরিষ্টার, ডাক্তারদের সংখ্যাও একই প্রকারের ছিল।"

প্রথমতঃ তাহাদের ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করিবার ফল, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ সরকারের মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুসুলভ মনোভাব। "এমন কি সরকারী চাকুরী হইতে বাদ দিবার জন্য গেজেটে মুসলমাদের নাম পর্যন্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইত।" সেইদিন কোন জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত হিন্দুকে মুসলমানদেরকে এইরূপ অসহায় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহারা তখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন।

একথা সত্য যে, ধর্মকেন্দ্রিক ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের নামে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। পরবর্তীকালে ডাক, তার ও যাতায়াতের সুবিধা হইবার ফলে ভারতবর্ষের লোকেরা ভারতের সম্পূর্ণ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে থাকে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চিন্তা করিতে শিক্ষা লাভ করে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃবর্গ প্রথমে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। সেইদিনকার অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান সৈনিকেরা যেরূপ কার্যের সূচনা করিয়াছিল তাহার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ হয় নাই এবং বৃটিশ শাসনেরও অবসান হয় নাই কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সকল ভেদ বুদ্ধি চূর্ণ করিয়া সকল সংস্কার ও সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিতে পারে তাহা প্রমাণ করিয়াছিল এবং প্রয়োজনবোধে হিন্দু-মুসলমান যে কোন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রহণে আহ্বান জানাইতে পারে তাহাও প্রমাণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় সেদিনও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে নাই। পরবর্তীকালেও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই ধরনের এক শ্রেণীর হিন্দু শিক্ষিত ও ধনীদের দেখিতে পাওয়া যাইবে যাহারা বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে।

পূর্বোক্ত এবং আরও বহুবিধ কারণে সিপাহীদের বিপ্লব ও যুদ্ধকে জাতীয়তাবাদীদের বৃটিশবিরোধী যুদ্ধ বলিলে ভুল হইবে। কিন্তু ইহা যে বৃটিশবিরোধী এক শ্রেণী হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীনতা যুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহা প্রতিটি ভারতীয়ের পক্ষে গর্বের বিষয়; ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের জন্য মুসলমান সম্রাটদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হিন্দুরা মুসলিম বিরোধী হইয়া উঠেন এবং বৃটিশকে শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহায্য করেন তাহা যে অসত্য তাহা এই বিদ্রোহ চলাকালীন অবস্থা লক্ষ্য করিলেই প্রমাণিত হয়। নতুবা সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাহারা

সর্ব-ভারতীয় বিদ্রোহী নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই বিদ্রোহে আরও কয়েকটি শিক্ষা লাভের ব্যাপার ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ এই বিদ্রোহ দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতকে যে বৃটিশ শাসনমুক্ত করিতে পারে তাহা, দ্বিতীয়তঃ এই বিদ্রোহ ভবিষ্যতে ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। এই বিষয় দুটি লক্ষ্য করিয়া চলিলে পরবর্তীকালের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে রাজনীতি বুঝিতে সহজ হইবে। বিদ্রোহ সম্পর্কে কালমার্কস কতিপয় বৃটিশ লেখক এবং অন্যান্য বিদেশী ও ভারতীয় বিখ্যাত ও সাধারণ ঐতিহাসিক লিখিত ইতিহাস পাঠ করিলে সকলকেই যেমন রোমাঞ্চিত হইতে হইবে তেমনি লজ্জায়, দুঃখে ও ঘৃণায় শিহরিত হইতে হইবে। অনেক সময় মনে হইবে দেশের বহু ঐতিহাসিক সংস্কারের উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। সত্য বিষয় লিখিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু ঘটনা ও তথ্য বিকৃত করিয়াছেন। যাহারা দেশের অতীত দিনের ইতিহাস লিখিতে এইরূপ মনোভাব গ্রহণ করেন এবং মনে করেন যে, ইচ্ছা করিলেই শক্তি প্রভাব ও অর্থ সত্য ঘটনাকে সকল মানুষের সম্মুখে সর্বকালের জন্য বিকৃত রাখা সম্ভবপর এবং দেশের মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া অর্ধসত্য কিংবা অসত্য ঘটনাকে চিরকালের জন্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভবপর তাহাদের মূর্খ বলিয়া ধারনা করা ছাড়া আর কি বলা সম্ভব।

বিদ্রোহ সমাপ্ত হইবার পর শাসকগোষ্ঠী, দেশের হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণের চিন্তা ও কর্মের উপর বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃটিশ সরকার যখন শিক্ষিত হিন্দু সমাজের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন এবং বিভিন্নমুখী সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছিলেন তখনই এইরূপ তীব্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা প্রথম হইতেই শাসক শ্রেণীর সহিত বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল। অন্যদিকে কোম্পানীর শাসন দ্বারা উদ্ভূত ক্ষতির বিবরণ বিলাতের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইতে থাকে

এবং এক শ্রেণীর ইংরাজগণ মনে করেন যে, ইহাতে বৃটিশ জাতির বদনাম হইতেছে। বৃটিশ পার্লামেন্টে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সেই কারণে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে পার্লামেন্টের মাধ্যমে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ সাল হইতে বিলাতের রাণী ভারত সম্রাজ্ঞী রূপে অধিষ্ঠিত হন এবং অক্টোবর মাসে এলাহাবাদ দরবারে ঘোষণা করেন যে, ভারতের জনসাধারণের প্রতি সরকার ন্যায্য ও সমান ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যতীত সকল প্রজার সম অধিকার প্রভৃতি বহু উদার মতবাদ ঘোষিত হয়। ঘোষিত হয় অতঃপর বৃটিশ সরকার জনসাধারণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার পালনে ও উন্নয়নে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করিবে না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ভারতের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মিঃ ডাব্লু, ডাব্লু, হন্টারকে ভারতের মুসলমানদের অবস্থাও ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী কর্মপন্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তথ্যসমেত বিশদ বিবরণ সরকারের নিকট পেশ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। পূর্বে এ বিবরণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মিঃ হান্টার এই রিপোর্ট তৈয়ারী করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লইয়াছিল। ১৮৭৩ সালে যখন জেহাদী যুদ্ধের সক্রিয়তা বন্ধ হইয়া যায় তখন তিনি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন, যে সমস্ত রাজ্যচ্যুত ভারতীয় মুসলমানরা ধর্মের যুক্তিতে ও ওহাবী আন্দোলনের নামে ইংরাজী ভাষা বর্জন ও বৃটিশবিরোধী আন্দোলন করার চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর নামে বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাহাদের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হানিয়া তাহাদের সর্বপ্রকারে বিপর্যস্ত করিয়াছে ও নিম্নস্তরের এক শ্রেণীর মানুষে পরিবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। রিপোর্টে ইহাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা "শাসক শ্রেণীরূপে ইংরাজরা

মুসলমানদের প্রতি যে সব অন্যায় করিয়াছে তাহার প্রতিকারস্বরূপ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ন্যায়সঙ্গত ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার না করিলে হয়তো যে কোন দিন আরও গুরুতররূপে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে এবং পূর্ব সংঘটিত বিদ্রোহসমূহে যে সব মুসলমান যোগদান করেন নাই, নূতন বিদ্রোহকালে তাহারাও যোগ দিতে পারে; সে সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে এবং তাহার প্রতীক্ষায় থাকার অর্থই যত শীঘ্র সম্ভব বৃটিশ সম্রাটকে তল্পি-তল্পা গুটাইয়া সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা।" পরবর্তীকালে হিন্দু ও জাতীয় রাজনৈতিক দল এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কোন প্রকার স্বীকৃতি দেওয়া যুক্তি যুক্ত মনে করেন নাই। মুসলমানদের প্রতি ইহা কতখানি অবিচার ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করিবার ব্যবস্থা তাহা পাঠকরাই বিচার করিবেন। মনে হয় এই সময় হইতেই মুসলমানদের মনে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের সূচনা হয়।

বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভারতকে সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বতোভাবে একটি পুরোপুরি উপনিবেশ রাজ্যে পরিণত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইংল্যাণ্ডের চাহিদা মত কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশরূপে পরিবর্তিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র ভারতের কুটীর শিল্প ও কারিগর শ্রেণীর উপর ধ্বংসলীলা চালায় নাই। বিলাত হইতে আমদানীকৃত সকল পণ্যের উচ্চ মূল্য স্থির করিয়া ভারতের মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং মজদুর শ্রেণীর জীবন ধারণ ব্যবস্থাকে ক্রমেই দুরূহ করিয়া তুলিতেছিল। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করিবার পর ১৭৯৭ সালে সপ্তম আইন ও ১৮২২ সালে পঞ্চম আইন প্রজাদের ধনমান, জীবন ও সম্ভ্রম জমি-দারগণের খামখেয়ালের ভোগ্য করিয়া তোলে। বৃটিশ শাসকেরা উপ-মহাদেশের শাসকদের শোষণ ত করছিলই উপরন্তু আর একটি স্তরে প্রজাবর্গকে তাহারা অধিকতর শোষিত হইবার পথ করিয়া দেয়। ১৮১৯ সালে এক আইন অনুযায়ী জমিদারদের নিজ জমিদারীকে অধঃস্তন পত্তনিদারদিগকে বিলি করিয়া দিয়া সাধারণ প্রজাও কৃষকমূলক সম্পূর্ণরূপে নির্যাতিত ও বিধ্বস্ত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

তাহারই ফলে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইরূপ বিদ্রোহে পরমশাহ্, তাঁহার পুত্র টিপু, বারাসতের তিতুমীর, ফরিদপুরের ফারাজী নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ্ এবং তাহার পুত্র দুদু মিঞা নেতৃত্ব করেন। নীল কুঠীর মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বাঙালী মুসলমানদের এক বিরাট অংশ মুখ্য স্থান অধিকার করে। নীলকুঠী অত্যাচারের বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যেমন 'নীল দর্পণ' লিখিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তেমনি প্রজাদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে লেখেন মীর মোশাররফ হোসেন, 'জমিদার দর্পণ'। তিনি এই পুস্তকে জমিদারদের সহিত বৃটিশ শাসকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা ও প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনা বিন্যাস এত সত্য ও বেদনাদায়ক ভাবে বর্ণনা করেন যাহা একজন জমিদার কর্তৃক প্রকাশ করা তখনকার দিনে যথেষ্ট সাহসের ও দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। বাংলা প্রদেশের মত সকল প্রদেশে কৃষক এবং মজদুর আন্দোলনেও মুসলমানগণ উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

ইহার পর ভারতের নবজাগরণের যুগের কথা বলা যায়। এই নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বামী বিবেকানন্দ, গোখলে প্রমুখ ব্যক্তির দান কোন প্রকারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও ইঁহাদের সকলেই ছিলেন হিন্দু তথাপি ইঁহাদের ও বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কুসংস্কারচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে সংস্কার করা সম্ভবপর হইয়াছিল। অন্য দিকে বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি হিন্দু নেতারা হিন্দু-মেলা, মহাহিন্দু সমিতি, শিবাজী উৎসব, গণপতি মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা"র লেখক শ্রীনরহরি কবিরাজ বলেছেন, "যাঁরা এই নতুন ভাবধারার ধারক ও বাহক তাঁরা অধিকাংশ ছিলেন ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, পেশার দিক থেকে ছিলেন

চাকুরীজীবী, অনেকেই আবার সরকারী চাকুরে। ধর্মমতের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন হয় হিন্দু, নয় ব্রাহ্ম। আন্দোলন প্রচলিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগ গড়ে ওঠায় এই অধ্যাত্মবাদে হিন্দু ঐতিহ্যের (বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা) রস সঞ্চার হয়ে উঠল। ফলে এই স্বাদেশিকতা অনেকটা হিন্দু স্বাদেশিকতার রূপ গ্রহণ করল।"

রাজনারায়ণ বসু "বৃদ্ধ হিন্দু আসা" নামক পুস্তিকায় মহাহিন্দু সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। জাতীয় মেলা হিন্দু মেলা বলিয়া পরিচিত হইল। "হিন্দু" ও "জাতীয়" দুটি কথা প্রায় একই অর্থবাচক হইয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শটি বর্জিত হইল। রাজনারায়ণ বসু তাই লিখলেন, "মুসলমান ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরা রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যতদূর পারি যোগ দিব, কিন্তু কৃষক যেমন পরিমিত জমি কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ষণ করে না, সেইরূপ হিন্দু সমাজেই আমাদের কাজের ক্ষেত্র হইবে।" মন্তব্য করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আন্দোলনে যাঁরা যোগদান করেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু।" ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এই হিন্দু স্বাদেশিকতার আন্দোলন অনিবার্য ছিল। অন্যত্র-গ্রন্থকার নরহরি কবিরাজ লিখিয়াছেন, "তবে উপরোক্ত হিন্দু স্বাদেশিকতা উদ্বোধনে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের কোন দায়িত্ব ছিল না ভাবিলেও ভুল হইবে। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়া একটি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির মূলে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। বাংলার বুদ্ধিজীবিদের অনেকে ঐতিহাসিকদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের যথার্থ অর্থ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাহারাও এই ইতিহাসকে পুরাপুরি সত্য ইতিহাস মনে করিয়া মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারে কলম ধরিলেন। ব্যক্তিগত কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা বুদ্ধি হইতেও যে তাহারা অনেক সময়ে এই মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করেন তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

যে কারণেই হউক নামে হিন্দু ধর্মের আশ্রয়, হিন্দু অধ্যাত্মবাদের আবেদন, হিন্দুয়ানী এই মনোভাব এক যুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ-টিকে যে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার আদর্শটি মুসলমান সমাজের পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের পথে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল, জাতীয় আন্দোলনের গতি যৎকিঞ্চিৎ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।"

শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত মুসলমানরা সহায়সম্বলহীন হইয়া পড়িলেও তাহাদের এক অংশ—যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতে-ছিলেন তাহারা এবং উদার মনোভাবাপন্ন আলেমশ্রেণী মুসলমানদের তদানীন্তন সর্ববিষয়ে অধঃপতিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজের উন্নতি ও মহারাণীর ঘোষণা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মৌলানা আবদুল হক, মৌলভী কেরামত আলী, শেখ আহমদ আফেন্দি, এল, আনসারী, মৌলভী আবদুল হাকিম ও মৌলভী আবদুল লতিফ খাঁ অন্যতম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃটিশের ভেদনীতি ও মুসলমান

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ১৮৬৮ সালের পর শান্তি-পূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইতে থাকে। কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব যেমন প্রবল ঝটিকার সাথে সাথে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ করে, অনুরূপভাবে ১৮৫৭ সালে একদিকে মুজাহিদদের সীমান্তযুদ্ধ তাহার সঙ্গে চকিতে বর্ষণ মুখর কালো মেঘের মত হিন্দু-মুসলমান জওয়ানদের সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত বিদ্রোহ কিছুদিন চলিবার পর স্তিমিত এবং বন্ধ হইয়া যায়। মুজাহিদদের ক্ষুব্ধ মনোভাব শান্ত হইতে আরও কিছু দিন সময় লাগে। সকল কিছুর অবসান ঘটে ১৮৭৩ সালে। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত মুজাহিদদের কিছুসংখ্যক ঘরে ফিরিয়া আসে। নেতৃ-স্থানীয় সিপাহীদের বিচারের নামে, দেশের শান্তিরক্ষার নামে জেলে, দ্বীপান্তরে স্থান হয় কিংবা ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়। হতাশায় ও নিরাশায় মুসলমানদের মন ভাঙিয়া পড়ে। ভবিষ্যতে তখন তাহাদের নিকট ছিল কালো আঁধার ঘেরা দুর্যোগপূর্ণ রজনীর মত। নেতৃত্ব দেবার মত তাহাদের সম্মুখে তখন কেহই ছিল না। যে সকল মওলানা ও উচ্চশিক্ষিত মুসলমান তাহাদের জেহাদের পথ অনুসরণে বাধা দেন ও শান্ত করেন তাঁহাদের উপরও তাঁহারা ভরসা রাখিতে পারেন নাই। সেদিনকার মুসলমান সমাজের চিত্র অংকন করিতে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে জাতি একদিন সমগ্র ভারতে শত শত বছর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছে, কর্তৃত্ব করিয়াছে, ভাঙাগড়ার সকল দায়িত্ব লইয়া দেশ শাসন করিয়াছে তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা যে এত অল্পদিনের মধ্যে এতদূর অধঃপতিত হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত এবং তাহা যে সর্বপ্রকারে বৃটিশবিরোধী মনোভাবের জন্যে দায়ী তাহাতেও সন্দেহ

ছিল না। বৃটিশের আচার-ব্যবহার, বৃটিশের পণ্য, এমন কি বৃটিশের ভাষা পর্যন্ত বয়কট এরূপ দুরবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্যে ছিল মূলতঃ দায়ী। সেদিনকার সমগ্র মুসলমান সমাজ কিভাবে নিজেকে রক্ষা করিবে, কিভাবে সমাজের সম্মান রক্ষিত হইবে, জীবন ধারণের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই ছিল মুসলমানদের সমস্যা।

আপোষহীনতা ও তার পরিণাম

একদিকে ইংরেজের দুষমনী অন্যদিকে প্রতিবেশী হিন্দুর সমাজ সংস্কার, পাশ্চাত্য শিক্ষার আভিজাত্য, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও শাসন কার্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি মুসলমানদের মনোবল সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেয়। দীনহীন অবস্থায় সকলের সহানুভূতির অপেক্ষায় তাহারা দিন যাপন করিতে থাকে। সকল বিষয়ে অসহায় অবস্থা যেন তাহাদিগের চরিত্রের সকল গুণাবলী নির্মূল করিয়া দেয়। সে সময় যে কয়জন উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন, যে সকল মওলানা মৌলভী দেশের ও সমাজের জন্য চিন্তা করিতেন তাহাদিগের অনেকেই সাধারণ মানুষের নিকট বৃটিশদরদী বলিয়া মনে হইলেও তাঁহারা সমাজকে এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন দীর্ঘ বিপ্লবের পরও যখন দেশের পরাধীনতার শৃংখল মোচন করা সম্ভবপর হইল না এবং সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সমাজোন্নয়নের ব্যাপারে শাসক শ্রেণীর সহযোগিতা পাইতেছে, পার্থিব সকল ক্ষেত্রে তাহারা উন্নত হইতেছে তখন বর্তমান শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সকল বিষয়ে মোকাবেলা অপেক্ষা সমঝোতার প্রয়োজন। ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা ও অর্থ উপার্জনের জন্য সরকারী চাকুরীতে যোগদান করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানের মনে বৃটিশবিরোধী প্রবণতা গভীরভাবে দীর্ঘদীন যাবত রক্ষিত ও সঞ্চিত ছিল।

এইরূপ মনোভাবের জন্যে মুসলমান সমাজ দরদীদের সমাজোন্নয়নের

চেষ্টা সাধারণভাবে কিরূপ ব্যাহত হইয়াছিল আজও তাহার চিহ্ন মুসলমান সমাজে পরিলক্ষিত হয়। কেবল মাত্র এই আপোষহীন মনোভাবের জন্যে অধিকাংশ মুসলমান ছুতার, ঘরামী, দর্জি ও চাষী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের আর একটি অংশ কোচোয়ান, গাড়োয়ান এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক ও নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কর্মে নিযুক্ত হয়। সংক্ষিপ্তভাবে মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে নিছক প্রাণধারণের জন্যে তাহারা সমাজে সকলের মুখাপেক্ষী ও কৃপার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। নবাব ও বাদশাহর জাতি বলিয়া তাহারা পরিহাসোক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইত একদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নানা প্রকার কুসংস্কার অন্যদিকে রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিপর্যয় মুসলমানদের জন্য যে অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই সঙ্গে মিশ্রিত হয় ইংরেজদের কঠোর শাসন ও দমননীতি। সমাজজীবনে হিন্দুদেরকে অসহযোগ ও ছুঁৎমার্গ মুসলমান জনসাধারণের অস্তিত্বকে আরও অসহনীয় করিয়া তোলে।

হিন্দু নবজাগরণ

এই সময় বাংলায় রেনেসাঁস যুগ বা নবজাগরণের যুগ শুরু হয়। এই যুগকে সাধারণভাবে ভারতে নবজারণের যুগ বলিলে কেবলমাত্র ভুল বলা হইবে না বরং সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহা ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে এইরূপ সংস্কারের যুগেও হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সংস্কারের ধারা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। নবজাগরণের যুগে যাহারা নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ও শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক, লর্ড মেকলে, গ্রাফ প্রভৃতি বিশিষ্ট ইংরেজ শাসকদের নাম করিতে হয়। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ইংরাজ মনীষীদের সঙ্গে ভারতের রাজা রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীদের হিন্দু সমাজ সংস্কার সাধনের

চেষ্টা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, শিশু হত্যা ও সতীদাহ বন্ধকরণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকরণ, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে বিদ্যালয় স্থাপন, হিন্দু কলেজ স্থাপন' লর্ড হামাস কর্তৃক সংস্কৃত কলেজ স্থাপন প্রভৃতি কার্য সাধিত হইয়াছিল।

ধর্মীয় সংস্কার সাধনে রাজা রামমোহন রায় যেমন অগ্রণী হইয়াছিলেন তেমনি দয়ানন্দ সরস্বতী "আর্য্য সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু ধর্ম পুনঃ প্রচারের চেষ্টা করেন। এইরূপ ধর্মান্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল শুদ্ধি ব্যবস্থা অর্থাৎ অহিন্দু ও মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই আন্দোলন পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ইহা ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করে। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হয় ও স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ও বিদেশে বেদ ও উপনিষদের বাণী প্রচার করিতে মনোনিবেশ মরেন। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিতে হয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশের শেষ ভাগে ভারতীয় মুসলমানদের মনে ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ যেমন বিস্তৃত হয় নাই তেমনি তাহাদের সমাজ সংস্কারও সম্ভবপর হয় নাই। যে নবজাগরণের যুগ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইংরাজ শাসক শ্রেণীর সাহায্য পুষ্ট ভারতীয় হিন্দুদের নবজাগরণ বলিতে কোন প্রকার বাধা থাকিতে পারে না।

বৃটিশের শাসননীতি

শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য বৃটিশ সরকার পলিসি হিসাবে চতুরতার সহিত ভারতীয় জনগণকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আচার আচরণে প্রভাবিত হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের উচ্চস্তরের বা সম্ভ্রান্ত উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের অনুগত রাখিবার সকল ব্যবস্থা করা হয়। করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গকে এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় সীমার বাহিরে রাখিয়া তাহাদিগের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। ইহা ব্যতীত সাধারণ

ভাবে হিন্দু, মুসলমানকে স্বার্থরক্ষার অজুহাতে যেমন পৃথক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয় তেমনি উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয়দের শাসন করিবার জন্য ভারতে যথেষ্ট ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হয় ও শাসন ব্যবস্থার সকল বিভাগের উচ্চস্তরের ইংরেজদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে ভারতীয়রা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয় ও তাহাদের অন্তরে বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হইতে থাকে। সেইজন্য হিন্দুদের সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিলেও ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে মুসলমান শাসক শ্রেণীর মত ইংরেজরা ভারতীয় ভাব ও জীবনধারা কোন মতেই গ্রহণ করিতে চাহে নাই, বরং নিজেদের সংস্কৃতি দ্বারা তাহারা ভারতীয়দের প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করে।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৃটিশ

শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় কুটির শিল্পকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করিয়া দেয় ও বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে ভরিয়া যায়। ইহার জন্য সুদক্ষ কারিগর এবং শিল্পীদের মধ্যে অভাব অনটন দেখা দিবার ফলে তাহারাও শাসক-বিরোধী হইয়া ওঠে; কিন্তু তাহাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার কারণে তাহারা সংঘবদ্ধভাবে কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। কলকারখানার মালিকানা, রেল স্টীমারের মালিকানা প্রভৃতি শাসকশ্রেণীর শোষণের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। নীলকুঠি মালিকেরা বৃদ্ধি করে ঘৃণার ভাব কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের শক্তি ও শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পায় না। ইহা ব্যতীত উপরতলার ভারতীয়দের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য লাট কাউন্সিলে আসন দেওয়ার ব্যবস্থা ও আনুগত্যের প্রতীক হিসাবে নানা প্রকারের সাহেব বাহাদুর, নাইট ইত্যাদি খেতাব বিতরণ করিয়া ও নানা প্রকারের প্রলোভন দিয়া শাসন ব্যবস্থা সুগম রাখিবার চেষ্টা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

দেখা যায় ১৮৭১ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরবী, ফার্সীভাষা অধ্যয়ন এবং ধর্ম-চর্চা করিতে সাহায্য করেন; কিন্তু বাস্তবে জীবিকা অর্জনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় না এবং আধুনিক শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা হয় না; অন্ততঃ যাহার দ্বারা সরকারী দপ্তরে চাকুরীর সংস্থান সহজ-তর হইতে পারিত ও মুসলমান ছাত্ররা ঐরূপ পদের জন্য যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিত। এইরূপ মাদ্রাসা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিঃ হাণ্টার তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, "ইহা কেবল-মাত্র মুসলমানদের সরকারী চাকুরী হইতে দূরে সরাইবার ব্যবস্থা।" এই প্রকার বহু বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের ছাত্রগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকে।

মুসলমান সমাজে শিক্ষা আন্দোলন

আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে যে সব মুসলমান মনীষী মুসলমানদের হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিবার জন্য চিন্তা করিতে-ছিলেন তাহাদের অনেকের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "দূরবীণ" নামক এক পার্শী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃটিশ সরকারের মুসলমান বিরোধী মনোভাব ও তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা লিখিত হয়। মহারাণীর ঘোষণা সত্ত্বেও মুসলমানদের সরকারী চাকরীতে গ্রহণ না করিবার অভিযোগ করিয়া লেখা হয় যে, এইরূপ ব্যবহার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতি-শোধমূলক ব্যবহারের পরিচয় দিতেছে। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষাদান সম্পর্কে এই প্রবন্ধে লেখা হয় যে, শাসকশ্রেণী সমগ্র ভারত-বর্ষে হিন্দুদের আধুনিক শিক্ষাদানের সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন ও

করিতেছেন কিন্তু মুসলমানদের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ থাকিবার ফলে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারিতেছে না ইহাও একপ্রকার সরকারের নীতি ভ্রষ্টতার স্বরূপ। এই সময় আধুনিক শিক্ষা দানের জন্য মুসলমান সমাজে আন্দোলন চলিতে থাকে এবং সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন উত্তর প্রদেশের স্যার সৈয়দ আহমদ। তাঁহার চেষ্টায় লর্ড মেয়রের শাসন কালে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম মুর আলিগড় স্কুল উদ্বোধন করেন এবং ইহার অল্প দিন পরে লর্ড লিটন আলিগড় কলেজ স্থাপন করেন এবং ইহাই পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইহার ফলে মুসলমান ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা হইয়াছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের খ্যাতিও সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে হিন্দুদের মনে অবার ঈর্ষা জাগ্রত হয় ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া স্যার সৈয়দ আহমদ ও মুসলিম সমাজের প্রতি নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করে। অনেক ঐতিহাসিক যে কোন কারণেই হউক এই কলেজ সৃষ্টি করিবার জন্য লর্ড লিটনকে দায়ী করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিযুক্ত করিবার কৌশল মাত্র, যেন কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার ব্যবস্থা। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সুগম করিবার জন্য লর্ড মেয়র কর্তৃক ভেদনীতির প্রবর্তন সূচনা করে। এই সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ কিছু নাই; কারণ রাজনৈতিক ঘটনা সমূহের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভবিষ্যতের কোন ঘটনাকে বর্তমান কিংবা অতীতের কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে গ্রহণ করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তাহা বিবেচনার বিষয়। বলা বাহুল্য ঐ সময় ভারতে হিন্দুদের সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপার, সংস্কার, উন্নয়ন ও উৎকর্ষসাধন হইয়াছিল ও হইতেছিল, সরকারী চাকুরীতে হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওকালতী ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারীতে তাঁহারাই প্রভুত্ব করিতেন, এবং বহু পূর্ব

হইতে সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, শুদ্ধি আন্দোলনের ব্যবস্থাগুলি যেন প্রয়োজনের খাতিরে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল আর হিন্দুদের কাছে অছুৎ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মাত্র একটি কলেজকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার সমালোচনা হইলে তাহা যে উদ্দেশ্যমূলক সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করিতে পারে না। সেই জন্যই বলিতে হয়, সে যুগে এইরূপ কলেজ মুসলমানদিগকে হীন অবস্থা হইতে উন্নত করিবার সোপান স্বরূপ।

স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক চিন্তা

এই সম্পর্কে "মুসলিম ইণ্ডিয়ার" লেখক মোহাম্মদ নোমান ঐতিহাসিক মেহেতা ও পট্টবর্ধন, স্যার জন ক্যানিং প্রমুখ লেখকের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ জীবনের প্রথম হইতেই ভারতের হিন্দু মুসলমান জাতি হিসাবে যে পৃথক, সে কথা কোন সময়ই চিন্তা করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছিল ভারতকে মুসলমানরা দারুল হারব্ আখ্যা দিয়া, জেহাদ করিয়া স্বাধীন করিতে পারে না, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে আর কোন সম্প্রদায়ও এক তরফা প্রভুত্ব কিংবা অধিনায়কত্ব করিতে পারে না। এই কারণেই তিনি দারুল হারব্ যুক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "জাতি বলিতে ভারতে হিন্দু মুসলমানকেই বোঝায়। যাহারা ভারতবর্ষে বাস করে, যাহারা একই রাজার রাজত্বে বাস করে, যাহারা একই সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, একই সঙ্গে মন্বন্তরে কষ্ট পায় তাঁহারা যে ধর্মেরই হোক না কেন তাঁহারা হিন্দুস্থানের অধিবাসী এবং আমি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যখনই কিছু বলি তখনই সেইরূপ জাতির কথা চিন্তা করিতে থাকি।"

অসাম্প্রদায়িক স্যার সৈয়দ

স্যার সৈয়দ আহমদের উর্দু ভাষায় লেখা "আসবাবে বাগাওয়াত" যাহা প্রথমে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৩ সালে স্যার অকল্যান্ড বলডিন এবং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জি, এফ, ই, গ্রাহাম যাহা "ভারত বিপ্লবের কারণসমূহ" নামে ইংরাজীতে তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন, তাহাতে লেখক স্যার সৈয়দ আহমদ অতি নির্মমভাবে সরকারের সমালোচনা করেন। যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সামরিক বিচার হইতেছিল এবং দিল্লী, লক্ষ্মৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদেরকে রাস্তায় রাস্তায় ফাঁসি দেওয়া হইতেছিল, মুসলমানদের উপর ব্যভিচার ও অত্যাচার চলিতেছিল, তখন সরকারের বিরুদ্ধে এইরূপ তীব্র সমালোচনামূলক পুস্তক প্রকাশ করিয়া তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে সরকারের শাসন পদ্ধতি ও কর্মধারা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেও ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, অন্যথায় ভারতের রাজনীতির ভবিষ্যৎ আরও দুর্যোগপূর্ণ হইতে পারে তাহা প্রকাশ করিয়া সত্যকার দেশ হিতৈষীর পরিচয় দেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে শ্রীনেহেরু "ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া"তে লিখিয়াছেন, "তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে মুসলমানদের দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের জন্য যেমন ইংরাজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন তেমনি সেই সময় বৃটিশ সাহায্য ব্যতিরেকে বাস্তবে মুসলমানদের উন্নতিও সম্ভবপর ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু অধ্যুষিত সংস্থা বলিয়া তাহার বিরোধিতা করিতেন, তাহাও যথার্থ নহে; এবং তিনি কখনও হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।"

১৮৭৬ সালে বাংলা প্রদেশের স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েট বা ভারত সভা গঠন করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও কোন

কারণে চাকুরী পান নাই। ইহা ছাড়া তদানীন্তন ভারত সচিব ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করেন। ইহাতে অনেকেই মনে করেন এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়গণ চাকুরী গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। এই সকল বিষয়ের প্রতিকার করিবার জন্য সারা উত্তর ভারতে সুরেন্দ্রনাথ জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এই সময় লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের জন্য একটি আইন পাশ করেন। তাহার বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। ভারতীয়গণ ইউরোপীয়দেরকে জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠতর, এইরূপ দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং সমান অধিকার দাবী করে। সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করিবার জন্য সম্মিলিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ পরে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে এক জাতীয় মহাসভা গড়িয়া তোলেন এবং এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যেসব প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। ইংরাজদের বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয় সেই সভার আহবায়ক ও সভাপতি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পর আগ্রায় এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সে স্থানে পুরুষ সিংহ স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরাজ ও ভারতীয়দের বসিবার আসন লইয়া বৈষম্যভাব লক্ষ্য করেন এবং তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান। বৃটিশ সরকার ও শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সাহসিকতার সহিত এইরূপ প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা তখন আর কাহারও ছিল না। হয়ত লর্ড লিটনের মনোনীত কাউন্সিল সদস্যের পক্ষে এরূপ ব্যাবহার অসম্ভব হইতে পারিত কিন্তু দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ্-এর বংশধর স্যার সৈয়দ আহমদের জন্য ইহা খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। সেদিন সারা ভারতের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্যার সৈয়দের সাহস লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। আর

বৃটিশ সরকার বুঝিয়াছিল যে, স্বাধীনচেতা ভারতীয়দের একমাত্র নেতার উপযুক্ত কার্য হইয়াছে। সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে সেদিনও ছিল মুসলমান শক্তি ভারতের সক্রিয় শক্তির উৎস স্বরূপ। স্যার সৈয়দের কার্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের মুখ রক্ষা হয়। ১৮৮৮ সালে এক সভায় তিনি বলেন যে, "হিন্দু ও মুসলমান ভারতের দুই চক্ষু স্বরূপ, সেখানে গো হত্যা লইয়া মন কষাকষি অপেক্ষা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বই বেশী মূল্যবান এবং তাহাই আমার কাম্য।"

অনেকেই মনে করেন যে এরূপ স্বাধীনচেতা ভারতের জাতীয়তাবাদী শ্রেষ্ঠ নেতার কংগ্রেস সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের জন্যে আলিগড় কলেজের মিঃ বেক দায়ী ছিলেন। কিন্তু "ভারতের মুসলিম রাজনীতি"র লেখক বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, ''ইহাও হইতে পারে যে অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার এবং ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ্যতম স্থান অধিকার করিবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য হয়ত বা তদানীন্তন রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে মুসলমানদের সরাইয়া রাখিবার চেষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

এইরূপ চিন্তা ও মত পোষণ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার আরও সুযোগ পাওয়া যাইবে। তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদের কার্যাবলীকে কোন প্রকারেই সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট মনে করিবার হেতু নাই। যাহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি অপরের অন্তরে দেখিবার চেষ্টা করেন মাত্র। এরূপ কল্পনা ও সমালোচনা জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে কিরূপ বিষময় ফলদান করিয়াছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করাই হইবে কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

বৃটিশের নব রাজনীতি

ইংরাজের লক্ষ্য ছিল ভারতের শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং যে কোন প্রকার বাধাবিপত্তি আসিলে কিংবা আসিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহার মূলোচ্ছেদ করা ও তাহার উৎসমূলকে নির্মূল করা। তাহার জন্য কালবিলম্ব করা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে তাহাও তারা জানিত। পূর্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইংরাজরা ভারতীয়দের ইংরাজী ছাঁচে ঢালিতে চাহিয়াছিল। কোন প্রকারেই মুসলমান বাদ-শাহদের মত তাহারা ভারতীয় হইতে চাহে নাই। তাহারা তাহাদের মৌলিক জাতীয় চরিত্রের সংগে কখনও সম্পর্ক শূন্য হয় নাই। শিক্ষা ও শিল্পে যতটুকু পরিবর্তন আনিয়াছিল তাহাও ইংরাজরূপে ইংরেজদের মত কায়দায়। তাহারা যদি কোনক্রমে ভারতীয় ভাবধারায় নিজেদের বিলাইয়া দিয়া রাজ্যশাসন করিতে চাহিত ও ব্যবহারিক জীবনে ভার-তীয় সাজিতে পারিত তাহা হইলে শান্তির সহিত তাহাদের শাসন ব্যবস্থা যে কত দীর্ঘদিন স্থায়ী করিতে পারিত তাহা কে বলিতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসান ও মুজাহিদ বিদ্রোহ শান্ত হইবার পর পরিবর্তিত অবস্থায় কলিকাতায় মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন ও আলীগড় ইংরাজী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার পর ইংরাজ শাসক গোষ্ঠী বোধ হয় মনে করিয়াছিল ভারতে রাজ্য শাসন সহজতর হইতে পারে। কিন্তু যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে বৃটিশের বৈষম্যমূলক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য "ইন্ডিয়ান এসোসি য়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসেন ভারতের অদ্বিতীয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ, যাঁহার প্রতিটি কথা ও ব্যবহার ছিল জাতীয় নেতার মত। অবস্থা বুঝিয়া বৃটিশ শাসকশ্রেণী কালক্ষয় না করিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুইটি

রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা যে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহার জন্য তাহাদের শাসনকার্য বেশ কিছুদিন সফল থাকে। ইহাদের প্রথমটি হইল বাঙালী সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ। দ্বিতীয়টি আলীগড় কলেজ তথা স্যার সৈয়দ আহমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ প্রচারে হিন্দুদের সহযোগিতা। এইভাবে ১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৫ সালের কিছুদিন কাটিয়া যায় এবং বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের কিভাবে বিলাতের সরকারের প্রতি ভারতীয়দের অনুগত করিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। বৃটিশ রাজনীতিবিদরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতীয় নাগরিক কিংবা প্রজাদের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু অভিযোগ থাকা স্বাভাবিক। নিজের দেশে এইরূপ ঘটিলে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে তাহার প্রতিকার করা সহজ কিন্তু উপনিবেশ রাজ্যে ইহার সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে পরিস্থিতি গুরুতর হইতে পারে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের মত রাজ্যে—যেখানে গত একশত বৎসরের অধিককাল শাসন ব্যবস্থা চালু রাখিবার পরও বৃটিশ শাসনবিরোধী মনোভাব শান্ত হয় নাই। তাহারা ইহাও লক্ষ্য করেন যে উদ্ধত মুসলমানদের শীঘ্র বাধ্য করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু একশ্রেণীর হিন্দুকে অনায়াসেই কতকগুলি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বাধ্য করা সম্ভব। এই প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যাইয়া তাঁহারা যে উপায় উদ্ভাবন করেন তাহা বাস্তব রূপ পায় ১৮৮৫ সালের মধ্যভাগে।

১৮৮৫ সালে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ হিউম হঠাৎ ভারতদরদী হইয়া উঠেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু গ্রাজুয়েটদের নিকট লিখিত এক পত্রে তাহাদেরকে ভারতের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে আন্দোলনের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে আহবান জানান। তিনি একথাও জানান যে, এইরূপ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকারের বিরোধিতা করিবার প্রয়োজন হইবে না অথচ ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে।

এইরূপ উদ্দেশ্য ও কর্মসম্পাদনের চেষ্টা নিতান্ত মহৎ কিন্তু এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ হিন্দু গ্রাজুয়েটদের মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ করিবার আহ্বান সম্ভবতঃ মুসলমানদের পরোক্ষ-ভাবে দূরে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাস্বরূপ। দ্বিতীয়ত এইসব গ্রাজুয়েট, যাহারা সরকারী চাকুরী লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে সরকারের বিরোধিতা করিতে হইবে না বলিয়া আশ্বাসদানের মধ্যে এক-দিকে চাকুরী লাভে বঞ্চিত হইবার আশংকা থাকিবে না; অন্যদিকে এই-রূপ সংগঠন সৃষ্টি করিবার মন্ত্রণা দিলে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়াও যে কার্যোদ্ধার সম্ভব ইহা বুঝিতে পারিয়া নিমন্ত্রণ পত্রটি সতর্কতার সহিত রচিত হয়। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, এইরূপ একটি সংগঠন স্থাপিত হইলে তাহা বিলাতের পার্লামেন্টের বিরোধী-দলের মত রাণীর প্রতি অনুগত থাকিয়া সাম্রাজ্য ও দেশের কর্তব্য সম্পাদন করিবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বৃটিশ শাসকদের সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রাপ্ত সংগঠন স্যার সৈয়দের দরবার পরিত্যাগকারী শক্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর হইবে কিনা তাহা প্রকাশ্যভাবে কেহ না বলিলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরূপ গুঞ্জন চলিতে থাকে, তবে এইরূপ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহা সুরেন্দ্রনাথ ও স্যার সৈয়দের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষত্ব প্রাপ্তিতে যে সাহায্য করিবে তাহা বৃটিশ সরকার বুঝিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য ভারতদরদী মিঃ হিউমকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়।

কংগ্রেসের জন্ম

১৮৮৫ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আশীর্বাদে পুষ্ট হইয়া হিউম সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী কয়েকজন শিক্ষিত ভারতীয় কর্তৃক 'কংগ্রেস' সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়; ইহার কিছুদিনের মধ্যেই রাজশক্তি সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের নিকট রাজশক্তি বিরোধী প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান

ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের পরাজয় ঘটে। পরাভূত হয় স্বাধীনচেতা বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব। স্বাধীনতাকামী মনোভাবের কবর-প্রাচীর হইতে যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় সেদিন সে আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল বৃটিশ সরকারের। বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে গাটছড়া স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল এই জাতীয় কংগ্রেস। সেইজন্য ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন ইহাকে বরণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যকে তিনি আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধিদের গভর্নর সাহেব নিজে সম্বর্ধনা করেন। একাধিক অধিবেশনে কংগ্রেসের কার্যকলাপ আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য এই প্রকার নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হয়তো কিছুটা সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু অগণিত জনগণের কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই।

আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার পরও যিনি ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মিলিত করিয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছিলেন, যিনি ইংরাজের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সকল সময় বিরোধিতা করিতেন সেই স্যার সৈয়দ আহমদের কার্যক্রম এখন হইতে ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তিনি মুসলমান ছাত্র ও জনসাধারণকে কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে উপদেশ দেন। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন এইরূপ মনোভাবের জন্য আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেক বিশেষভাবে দায়ী ছিলেন। এইরূপ কথা চিন্তা করিবার কারণ থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু যে বিরাট চরিত্রের মানুষটি ১৮৫৬ সাল হইতে ভারতের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া দেশের সকল উত্থান-পতন ও দুঃখ-দুর্দশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া জাতির মঙ্গল কামনায় অনুক্ষণ নিরত ছিলেন সেই পুরুষসিংহ জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া বৃটিশ সরকারের সহিত সমঝোতা করিতে, চিত্তের দৃঢ়তা

দেখাইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, যাঁহার পাণ্ডিত্য দেশ ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, যাঁহার নিষ্ঠা ও সমাজ সেবা আজিও উপমহাদেশের চিত্তে অমলিন হইয়া আছে, সেই কর্মবীর বেক সাহেবের মত একজন অধ্যক্ষের কথায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সংশয়াপন্ন হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতীয় স্বার্থ বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা ভাবিবার পূর্বে তখনকার ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

স্যার সৈয়দ আহমদের কার্যাবলী বিচার করিতে হইলে তখনকার ভারতের রাজনীতি, হিন্দু মুসলমানের সামাজিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ভারতে বহুদিন হইতে বহুধর্মীয় সম্প্রদায় বাস করিতেছে। সকল মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যখন পৃথিবীর সকল সভ্য জাতি গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের একান্ত অধিকার বলিয়া স্বীকার করিতেছে তখন সম্প্রদায়গত অধিকার অস্বীকার করিবার কারণ কি থাকিতে পারে ? বিশেষ করিয়া ধর্মকেন্দ্রিক ভারতে এই অবস্থা অস্বীকার করিবার অর্থই অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করা। বাংলা প্রদেশে, পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশের মত প্রদেশগুলিতে শুদ্ধি আন্দোলন চলিতেছিল। মালব্যজী তখন কাশিতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকমের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। মালব্যজীর চরিত্রের গোঁড়া হিন্দুয়ানি ভাব কংগ্রেসের উপর প্রতিফলিত হইতেছিল, অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি মারাঠা এবং কেশরী পত্রিকায় দিনের পর দিন, মুসলমানরা যে বহিরাগত, তাহাদিগকে হত্যা করিলেও যে দোষের কিছু নাই, এইরূপ মন্তব্য করিতেছিলেন যাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মাননীয় রানাডে গোখলে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে, "বালগঙ্গাধর তিলক মালব্যজীর মতই, প্রথমে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ তাহার পর মারাঠা এবং তাহার পর ভারতের স্বপ্নদর্শক।"

এইরূপ ব্যক্তিরাও কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। সেদিনকার কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করিবার মনস্থ করিয়া নিজেদের কার্যসূচী রচনা করিতেছিল।

সে সময় যদি কোন দেশ-দরদী দেশের অনুন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষাহীন বিরাট এক অংশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির জন্য তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে বলেন, যোগ্যতা অর্জনের জন্য হিন্দুদিগের মত শিক্ষিত হইতে বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যায় কি হইতে পারে? স্যার সৈয়দ আহমদ সে সময় দেশের সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ভারতের কথা চিন্তা করিয়া মুসলমানগণকে হিন্দুদিগের পার্শ্বে শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইয়া ভাইয়ের মত যোগ্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত হইবার জন্যই মুসলমান যুবকদের রাজনীতি হইতে কিছুদিনের জন্য দূরে সরিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা হইতেই ইহা প্রকাশ পায়। পণ্ডিত নেহেরু 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়াতে' (পৃষ্ঠা ২৯৮) লিখিয়াছেন, "স্যার সৈয়দ আহমদ কোন মতেই হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতি সাধন করিয়া তাহাদেরকে প্রগতিশীল করিতে চাহিয়াছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ বারংবার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম পৃথক হইলেও একই দেশে তাহারা বাস করে এবং তাহারা একই জাতি।"

কংগ্রেস হইতে মুসলমানদের দূরে সরাইয়া রাখিবার আরও একটি কারণ এই হইতে পারে যে, তখনকার দিনে কংগ্রেস ভারতীয়দের উপকারের নামে যে সকল আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেয় তাহার সত্যকার রূপ বিবেচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, সে সব কেবলমাত্র উপরতলার মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী ক্ষেত্রে সুবিধা লাভের জন্যে। ইহা ভারতীয় জনগণের

কোন প্রকার উপকার সাধন করিত না। 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়ায়' শ্রী নেহেরু লিখিয়াছেন, তখনকার দিনে জাতীয় কংগ্রেস রাজনীতির দিক হইতে বৃটিশের নামমাত্র বিরোধিতা করিত এবং যথেষ্ট নরম সুরেই সকল কথা বলিত। মধ্যবিত্তের কথা তখন কেহ চিন্তা করেন নাই। এইরূপ অবস্থাও বিবেচনার বিষয়। যে আলীগড় কলেজকে হিন্দুরা সাম্প্রদায়িকতার জন্মভূমি বলিয়া থাকেন তাহা বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কেবলমাত্র হিন্দুছাত্রদিগের বদলে মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ছাত্রের সমান প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দু শিক্ষকদের শিক্ষকতা কার্যে নিয়োগ ব্যবস্থার আইনগত বাধা ছিল না।

স্যার সৈয়দ বিলাতে থাকাকালীন লর্ড ষ্টেনলি, লর্ড লরেন্স প্রমুখ বহু ইংরেজ সহিত আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কোন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সফলতা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসিতে পারে না, তাহা উপলব্ধি করেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল নেতা এবং সৈনিকগণকে একই প্রকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক শিক্ষায়শিক্ষিত হইয়া যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

মুসলিমদের কংগ্রেসে যোগদান

তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের অপর কোন নেতৃস্থানীয় মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই কিংবা কংগ্রেসের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করেন নাই—তাহা মনে করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বহু মুসলমান তখন কংগ্রেসেও যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদের বিরোধিতাকে যথেষ্ট সমালোচনা করিয়াছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা শিবলি নোমানী ছাড়াও তখনকার ভারতের সর্বজনপরিচিত জনাব বদরুদ্দিন তৈমরজী, অনারেবল হুমায়ুন ঝাঁ, জনাব আলী মুহম্মদ ভিমজী, মাওলানা তোফায়েল

আহমদ ও বহু মওলানা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তৈয়বজী সভাপতিত্ব করেন এবং যথেষ্ট জোরালো ভাষায় সকল প্রকার কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থাকিয়া ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের অনুরোধ জানান এবং এই সভায় মুসলমান সদস্য সভ্য ও দর্শক সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। (ভারতের মুসলিম রাজনীতি) ঐতিহাসিক মেহেতা ও পট্টবর্ধনের লিখিত ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এমন কোন প্রদেশ ছিল না যেখান হইতে সম্মানীয় মুসলমান জননেতাগণ যোগদান করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকল সময় চেষ্টা চলিত। আরও জানা যায় যে, মাওলানা শিবলি নোমানী সকল সময় স্যার সৈয়দ আহমদকে বলিতেন যে, ইংরাজ রাজকর্মচারীরা স্যার সৈয়দের সুনাম ও ক্ষমতা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিকে বাধা সৃষ্টি করিবার কার্যে লাগাইতেছে।

মাওলানা সাহেব সকল সময় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেমন জাতীয়তাবাদীর মত নির্ভীক সমালোচনা করিতেন তেমনি জাতীয় সম্মেলনে মুসলমানদের আত্মদান সম্পর্কেও বহু পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন।

এইভাবে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মন্থর গতিতে হিন্দু ও মুসলমানেরা কংগ্রেসের কার্য চালাইয়া যান। ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারেন, জিহাদী মুসলমানদের একটানা পঞ্চাশ বৎসরের বৃটিশ-বিরোধী যুদ্ধ ও হিন্দু-মুসলমান জওয়ানদের সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষা অদূর ভবিষ্যতে আরও ভীষণ আকারে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন হইতে পারে। এই সব আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরাজ সরকার এক শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানকে তুষ্ট করিয়া রাজভক্ত করিবার সকল সুযোগ লইতে থাকে। কিন্তু কংগ্রেসে অধিক সংখ্যক মুসলমান সদস্য যোগদান করিবার ফলে যেমন বৃটিশ শাসক শ্রেণীর আসল উদ্দেশ্য বানচাল হইয়া যায় তেমনি হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরাও

সুবিধা গ্রহণে বঞ্চিত হয়। এইরূপ মিলিত শক্তি সম্বন্ধে অল্প দিনের মধ্যেই শাসকগোষ্ঠী ঘৃণা পোষণ করিতে থাকে ও কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার সকল চেষ্টা করে। এমনকি লর্ড ডাফরিন যিনি মিঃ হিউমকে এইরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছিলেন তিনিও পাঁচ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অবসর গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেসকে 'মাইক্রোসকোপিক প্রতিষ্ঠান' আখ্যা দিয়া কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংকট

এইসব অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত মন লইয়া ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সংকট পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যখন একদিকে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক লইয়া বৃটিশ সরকার দাবাবোড়ের চাল দিতে আরম্ভ করেন অন্যদিকে অনেকেই তখন চালের ঘুটির মত একে অপরের বিরুদ্ধে নানা প্রকার সত্য-অসত্য অভিযোগের সূত্র অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কিন্তু মুসলমান বাদশাহদের শাসনকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির দীর্ঘসূত্র টানিয়া সেই দিন যাঁহারা সকল বাদ-প্রতিবাদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'ভারতের হিন্দু মুসলমান'-এর লেখক শ্রী অতুলানন্দ চক্রবর্তীর গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়া 'খন্ডিত ভারত'-এর গ্রন্থকার ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, স্যার সাফাত আহমদ খাঁ 'ভারতের হিন্দু মুসলমান' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ "আমাদের জাতীয় কর্মতৎপরতার প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের পরিমাণ, সাধারণতঃ আমরা যাহা অনুমান করিয়া থাকি, বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপেক্ষা, বহুগুণে বেশী ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে এই উভয় সম্প্রদায় তদন্তগত শ্রেণীসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত

মহাকাব্য শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে এই জাতীয় সত্তার যে পরিপূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, এশিয়ার কুত্রাপি অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই পারস্পরিক চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের ফলে অভিজাত শ্রেণী ও জনসাধারণের রুচি ও সংস্কারগত পরিশুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং তাহার প্রভাব আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র জাতির সত্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে। রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য বিদ্যমান ইহা সত্য কথা এবং তাহার গুরুত্ব হ্রাস করিতে আমি অণুমাত্র সচেষ্ট নই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ চিন্তার আবর্তন জীবনব্যাপী অভ্যাস ও আচরণে একটা প্রবল সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে একথা অনস্বীকার্য। এই একাত্মবোধ, সহস্র বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ ইতিহাসের সুখ-দুঃখ, বিচিত্র শিল্পশালায় শৈত্য ও উত্তাপের পর্যায়ক্রমিক প্রয়োগে গড়িয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইহা অক্ষয় ও অবিনশ্বর।

স্যার সাফাতের উক্তি আর একবার উদ্ধৃত করিয়া আমি বলিব যে, "অদূরদর্শী ব্যক্তি সামাজিক ঘটনা মাত্রকেই রাজনৈতিক ঘটনা রূপে দেখিয়া থাকেন এবং জাতীয় দেহের প্রত্যেক ব্যাধির লক্ষণকেই রাজনৈতিক পীড়ার উপসর্গ বলিয়া মনে করেন। ভ্রম সংশোধনের জন্য তাহার কর্তব্য, হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির ইতিহাস গভীরতর মনোযোগের সহিত পাঠ করা এবং আমাদের গৌরবময় অতীতে সেসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা গড়িয়া উঠিয়াছে নিবিড়তরভাবে তাহাদিগকে উপলব্ধি করা।"

স্যার সাফাত ও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের এই বাণী ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ভারতীয় লেখকদের, সাংবাদিকদের ও অগণিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আজিও যদি কেহ ভারতীয় বলিতে কেবল মাত্র হিন্দুস্থানকে মনে করেন এবং মালব্যজীর কথামত মুসলমানদের বহিরাগত আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' অনুযায়ী মুসলমান নিধনই ভারতীয় স্বাদেশিকতা বা স্বাজাত্যবোধ বলিয়া মনে করেন এবং বালগঙ্গাধরের মত অনুযায়ী ভারতে শাসনকারী ও রাষ্ট্রপরিচালক বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই মনে করেন তাহা হইলে বুঝিত হইবে ভারতের দুর্গতি

এখনও শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় নাই। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন যেমন আজিও সফল হয় নাই, বিশ্বসভ্যতা যেমন আজিও বর্ণবৈষম্য দূর করিতে পারে নাই, তেমনি "সবার উপর মানুষ-সত্য" কবির এই সত্য উপলব্ধি ভারতের মাটিতেই ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতে রাজ্য স্থাপন কিংবা পরবর্তীকালে বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ বৃটিশের উপনিবেশ সৃষ্টি করিবার কিংবা অপরাপর জাতির সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের ইতিহাস নূতন এবং একমাত্র ঘটনা নহে। উপনিবেশ স্থাপন ও তাহার শাসনব্যবস্থা সংরক্ষণ কিভাবে করিতে হয়, পৃথিবীর মধ্যে বৃটিশ জাতির মত কেহ বুঝে নাই। এদেশেও যখন তাহারা নিছক ব্যবসা উপলক্ষে আসিয়াছিল তখন হইতেই এই দেশের মানুষের প্রকৃতি, চরিত্রের দুর্বলতা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অক্ষমতা ও অজ্ঞতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল এবং সেই সুযোগে তাহাদিগের শাসন সম্প্রসারিত করিতে পারিয়াছিল। একথাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের লোকদিগের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় রীতিনীতি যে-ভাবে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও সম্মান পুঞ্জীভূত করিয়াছে ও করিতেছে তাহাতে নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করিয়াও কেবলমাত্র ভেদনীতি ও বর্ণবৈষম্যের ইন্ধন যোগাইতে পারিলেই ভবিষ্যতে রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান লাভ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ ভোগ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। সেই ভাবেই তাহারা তাহাদিগের নীতি নির্ধারণ করে।

বৃটিশের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি

ভালভাবেই তাহারা বুঝিয়াছিল যে,ভারতের অধিবাসীদের ধর্মে-কর্মে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই; বরং ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ

করিবার মনোভাব প্রচার করিলেই এবং সরকারের নিকট সকল ধর্ম যে সমান সম্মানীয় এবং কোন ধর্মপ্রচারে কাহারও যে বাধা-বিপত্তির কারণ নাই এইরূপ ব্যবস্থা চালু রাখিতে পারিলেই একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতাবোধ যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইবে তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণকারীদের মধ্যে সম্ভ্রম ও সম্মানের লড়াই চিরস্থায়ী থাকিবে। এ ছাড়া যদি কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে নিজেদের পক্ষে আনিতে পারা যায় তাহা হইলে সকলেই সরকারের মুখাপেক্ষী থাকিবে, কোন সময়েই সরকারের কার্যের সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইবে না। সর্ববিষয়ে সামাজিক জ্ঞান লাভের জন্যই ইংরাজরা ভারতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য অগ্রণী হয়। তখন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা না করিলে সরকারী চাকুরীতে অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত। কিন্তু মনে হয় ইংরাজরা একটি বিষয়ে ভুল করিয়াছিল, তাহা হইল ভারতীয়দের বিলাতে লইয়া যাইয়া শিক্ষা দান করা। এই প্রসঙ্গে আলোচনা সম্ভব হইলে উপযুক্ত স্থানে করা হইবে।

ভারতের শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে হইলে ভেদনীতি যে অমোঘ অস্ত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া ইংরাজরা ভারতকে স্বাধীনতাদানের শেষদিন পর্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে কার্যকরী রাখে এবং তাহারই ফলস্বরূপ ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পরেও উভয় রাষ্ট্রে বৃটিশের সম্মান অটুট থাকে। বৃটিশ শাসকবর্গ ভারতের স্বাধীনতা দানে প্রাণপণে বাধা দিলেও স্বাধীনতাকামী হিন্দু মুসলিম যোদ্ধাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিলেও; কোমলপ্রাণা ও কোমলদেহী নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইলেও বৃটিশের সম্মান উপমহাদেশে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে।

ভারতীয় সমাজে বৃটিশের নানাবিধ অবদান যে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিভাবে অনেকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বে এবং পরে যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছিল তখন লুঙ্গি-পাজামা, ধুতি কোনটাই নিরাপদ ছিল না কিন্তু

প্যাণ্ট-কোট কেবলমাত্র নিরাপদ থাকে নাই বরং দাঙ্গাকারীদের নিকট সম্মানীয় ছিল। এইরূপ পোশাক অনেকের জীবন রক্ষা করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ব্যাপারটি নেহাত ক্ষুদ্র কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ জনচিত্তে বৃটিশের নাম, বৃটিশের আচার-ব্যবহার, বৃটিশের পোশাক পরিচ্ছদ কেন এত বেশী সম্মানীয় ছিল সে বিষয়ে জানিতে হইলে সকলেরই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন বলা বাহুল্য বৃটিশের দুমুখো নীতি রাজনৈতিক নেতৃবর্গের মনে যথেষ্ট ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল ও উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণও নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটিশের মুখাপেক্ষী ছিল। বৃটিশ শাসক শ্রেণী পৃথক পৃথকভাবে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহার জন্যই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লব কখনও অপরাপর দেশের বিপ্লবের মত সীমা বহির্ভূত হয় নাই বরং সকল সময় আপোষ-রফার জন্য একটা দিক উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার অন্যতম কারণ রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কয়েকজন দৃঢ়চেতা জাতীয় নেতা ব্যতীত অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। এইরূপ উক্তি করিলেও অন্তরে তাহাদের ধর্মের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল এবং তাহা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সকল কার্যকলাপের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত। বৃটিশ সরকার এইরূপ অবস্থার যথেষ্ট সুযোগ গ্রহণ করে।

এইরূপ ভেদনীতির আরম্ভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতে হইয়াছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা মারাঠা, নিজাম, কর্নাটকের নবাব, হায়দার আলি ও টিপু সুলতান প্রমুখ যাহাতে একত্র সম্মিলিত হইতে না পারেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং সকল সময় একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করিয়া মিলিত শক্তি সংগঠনে বাধা দিত। ঐতিহাসিক টরেন্স 'এশিয়ার সাম্রাজ্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ভারতের আপন সন্তানগণের সাহায্য ব্যতীত তাহাকে জয় করা কোনক্রমে সম্ভব হইত না। প্রথমে নিজামের বিরুদ্ধে আরকট ও আরকটের বিরুদ্ধে নিজাম ও তাহার পর মুসলমানের বিরুদ্ধে মারাঠা এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে

আফগান এইভাবে মহারাষ্ট্র দরবারে বৃটিশের ষড়যন্ত্রে তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ বাড়িয়া ওঠে।”

‘মারাঠাদিগের ইতিহাস’ পুস্তকে গ্রান্ড ডাফ লিখিয়াছেন, “মারাঠারা যাহাতে হায়দার বা নিজামের সহিত মিলিত হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জাগাইয়া রাখিবার জন্য বোম্বাই গভর্নমেন্ট মিঃ স্নাটনকে পুনরায় প্রেরণ করেন।” “এইভাবে ধর্ম ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া একদিকে মুসলমানদের যেমন হিন্দুর বিরুদ্ধে তেমনি হিন্দুদের মুসলমানের বিরুদ্ধে নির্বিচারে প্রয়োগ করা হইত ও একের সাহায্যে অপরকে পরাজিত ও পদানত করা হইত। সেই কার্য সমাধা হইলে তখন সাহায্যকারীর পক্ষে সর্বনাশ করা হইত। হেস্টিংসের শাসনকালে রোহিলাদের প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণ এই নীতির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।” (টরেন্স)

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় জাতিদরদী জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ সকল বিষয় জানিতে পারিয়াও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নাই।

করদ ও মিত্ররাজ্য

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে তখন ভারত সাম্রাজ্য হইতে আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশ পৃথক হইয়া গিয়াছে এবং ভারতের সীমা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এই নির্ধারিত সীমার মধ্যে কতকগুলি করদ ও মিত্ররাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ভারতের লোকসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ। তাঁহাদের আর্থিক আয় ও সঙ্গতিতে স্বাধীন নৃপতিদের বিলাস-ব্যসনের ব্যয় ছাড়াও উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্যদল রক্ষা করা চলিত এবং সময়ে সময়ে শাসক শ্রেণীকে যথেষ্ট উপঢৌকনাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের অধ্যয়নের জন্য পৃথকভাবে আজমীরে মেয়ো কলেজ স্থাপন করা হয়। জনসাধারণের জীবনধারা হইতে পৃথকভাবে তাহাদের জীবন

গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ অসংখ্য ভারতীয় অপেক্ষা তাহাদের জীবনের মান মর্যাদা ও সম্ভ্রম যে উচ্চতর সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। এরূপ রাজন্যবর্গ সর্বদা বৃটিশ শাসক শ্রেণীর ইঙ্গিতে সকল কর্ম সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন এবং বৃটিশ সরকারকে সকল সময় সকল প্রকার সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। ভারতের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগের অবস্থা যখন এরূপ ছিল, তখন বাকী তিন ভাগের দুই ভাগের অবস্থা একত্রে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে সকলেই বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষণের যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইত। ইহাদের মধ্যে ছিল জমিদার শ্রেণী, চাকুরীজীবী, বহুখয়ের খাঁ ব্যক্তি—যাঁহারা রাজশক্তির অনুগ্রহলাভের জন্য দেশের এবং সমাজের বিরুদ্ধে হীনতম কার্য করিতে দ্বিধা করিতেন না। এইভাবে ভারতে বৃটিশের ভেদনীতি সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমভাবে কার্য করিতে থাকে। মিঃ বেকের কার্যকলাপ সম্পর্কে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "মিঃ বেকের আগমন ঠিক সময়েই হইয়াছিল। যে ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছিল। তাহার বাহন হইয়া আসিয়াছিল স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ, ঠিক সেই সময়ে সেই আদর্শ স্থানে ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করিল যে এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধকে প্রতিহত করিতে হইলে বিরূপভাজন হিন্দু-মুসলমানকে বক্ষের নিকট টানিয়া পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিতে হইবে। মিঃ বেক রীতি সুলভ নিষ্ঠা সহকারে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।"

ঐতিহাসিক মেহেতা পট্টবর্ধন লিখিয়াছেন, "মিঃ বেকের সাধনা হইল স্যার সৈয়দকে জাতীয়তার ক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত করা, বৃটিশ উদারনৈতিক দলের প্রতি তাঁহার যে আনুগত্য, রক্ষণশীলদের অভিমুখে তাহা পরিচালনা করা এবং স্যার সৈয়দের মনে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ রফার আগ্রহ জাগাইয়া তোলা। এ সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"

এই অবস্থা মানিয়া লইলেও দেখা যায় একজন মুসলমান নেতা জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া বৃটিশ সরকারের সহিত আপোষ রফার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুদিগের অবস্থা এমনকি কংগ্রেসের মনোভাব যে কিরূপ ছিল তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

গো-রক্ষা আন্দোলন

এই সময়ে (১৮৮৮ সালে) হিন্দুদের পক্ষ হইতে গো-রক্ষার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং মুসলমানরা ইহার বিরোধিতা করেন। সরকার এ বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য করে না বরং দূর হইতে এই অবস্থার ভবিষ্যৎ গতি লক্ষ্য করিতে থাকে ঠিক যেমন নিরপেক্ষ রাজশক্তি কাহারও ধর্ম এবং সামাজিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। কিন্তু অনেকেই মনে করিতে থাকেন এইরূপ আন্দোলনের ইন্ধন সরকার পক্ষ হইতেই যোগান হইয়াছিল, নতুবা শত শত বৎসর পর এরূপ আন্দোলন করিবার যুক্তি হঠাৎ কোথা হইতে পাইল ? ক্রমেই আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে; কিন্তু মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগদান করিয়া কংগ্রেসকে যে জাতীয়তাবাদী সংগঠন রূপে গঠন করিতে থাকেন তাহারও কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই সময় এক বক্তৃতায় স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন যে, "হিন্দু-মুসলমান ভারতের দুই চক্ষুস্বরূপ, সেখানে গোহত্যা লইয়া মনকষাকষি অপেক্ষা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বই বেশী মূল্যবান এবং তাহাই আমাদের কাম্য।"

(ভারতে মুসলমান রাজনীতি, বি. চৌধুরী)

এইরূপ উক্তি প্রমাণ করে যে, স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদিগকে কিছুদিন কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে বলিলেও কখনও হিন্দু মুসলমানে বিভেদ চাহেন নাই।

ভারতের হিন্দু মুসলমানদের মিলিত শক্তি যাহাতে বৃটিশের সকল ভেদনীতি চূর্ণ করিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন চিন্তা কার্যকরী

করিতে পারে সে বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। যখন সারা ভারতে গোহত্যা নিবারণী আন্দোলন যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, হিন্দুরা মুসলমান বিরোধী হইয়া উঠিতেছে এবং জাতীয় সংগঠনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে তখন মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী নেতারা যাহা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "মৌলভী আবদুল কাদের লুধিয়ানী ইহার বিরুদ্ধে লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, কপুরতলা, অমৃতসর, ছাপরা, গুজরাট, জৌনপুর, ফিরোজপুর, কনৌজ, দিল্লী, মুজফফরপুর, রামপুর, বেরেলি, মুরাদাবাদ, এমনকি মদিনা মনোয়ারা ও বাগদাদ শরীফের ওলেমাদের স্বাক্ষর সম্বলিত ফতোয়া বিলি করিলেন। স্বাক্ষরকারী ওলেমারা ধর্মাচার্যরূপে এই ফতোয়ায় বলেন যে পার্থিব ব্যাপারে হিন্দুদের সহিত সহোযোগিতা, কংগ্রেসের কার্যে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে সমর্থনযোগ্য। একদিকে যখন স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছিলেন তখন অপর দিকে মিঃ তৈয়বজী, আলী আহমদ ভীমজী, রহমাতল্লাসাহানীর নেতৃত্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুসলমানরা ছিলেন কংগ্রেসের স্বপক্ষে।" (খণ্ডিত ভারত)

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন

যখন এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের সহিত সমঝোতা করিবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন তখন বৃটিশের ভেদনীতির আরও একটি চাল হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্থা 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্রেট্রিয়টিক এসোসিয়েসন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। উহাদের উদ্দেশ্য (১) ভারতের সকল সম্প্রদায়—অভিজাত ও রাজন্যবর্গ সে কংগ্রেসের পক্ষভুক্ত নহে তাহা প্রচার করা; (২) কংগ্রেস-বিরোধী হিন্দু-মুসলমানের মতামত পার্লামেন্টকে জানান; (৩) দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সাহায্য করা।

এই সময়ে অযোধ্যায় রাজা শিবপ্রসাদ রাজানুগতদের জন্য একটি পৃথক সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কোন প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা কিংবা পরিচালনা করিবার বিরুদ্ধে বৃটিশের ভেদনীতি যেরূপ কার্যকরী ছিল এই সব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি তাহার প্রমাণ এই সব প্রতিষ্ঠানে স্বভাবতই অধিক সংখ্যক প্রভাবশালী হিন্দু যোগদান করিয়া একদিকে মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী ইচ্ছা পোষণ করিতে সাহায্য করে, অন্যদিকে মুসলমানদেরকে কংগ্রেস সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত করে। তাহার ফলে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাইলেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা মুসলমানদের সাহায্যেই শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে।

হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবী

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের কংগ্রেস হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ দিলেও তাহা যখন মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত করিতে পারে না, তখন ইংরাজের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের এক বিরাট শক্তিশালী অংশ উর্দু ভাষার পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা প্রচলনের দাবী করে এবং দেখা যায় ১৯০০ সালে যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে উক্ত প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলন সরকারী সমর্থন লাভ করিয়াছিল। মুসলমানরা ইহার বিরোধিতা করে। এই ভাষা প্রচলন করিবার আন্দোলন দীর্ঘ দিন চলে; এবং প্রথমে কেবলমাত্র মুসলমানরা ইহার বিরোধিতা করিয়াছিল বটে কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই বিরোধিতা করিতেছে। ইংরাজ শাসন আমলে উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সরকারী দপতর ও আদালতে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তন করিলে মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা বয়কট করে। কিন্তু তাহার পর তাহারা যখন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তখন ইংরাজীর পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা

প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহা যে কেবল মুসলমান সমাজ ও যুবকদের আরও দীর্ঘদিন ভারতের রাজনীতি হইতে সরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার বিরুদ্ধে ছাত্রীর নবাব মহসীন-উল-মুল্‌ক আলীগড়ে এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নবাব সাহেব তখন আলীগড় কলেজ পরিচালনা সমিতির কার্যসচিব। এই সভা অনুষ্ঠিত হইবার পর লেফ্‌টন্যান্ট গভর্ণর স্বয়ং আলীগড় কলেজ পরিদর্শন করিতে যান এবং ট্রাষ্টিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "নবাব সাহেব হয় উর্দ্দু কনফারেন্সের সভাপতি থাকিবেন নতুবা কলেজের কার্যসচিবের কার্য করিবেন, যে কোন একটি পদ বাছিয়া লইতে হইবে।" ট্রাষ্টিগণের চাপে এবং অনুরোধে ইংরাজ বিরাগভাজন নবাব সাহেবকে উর্দু কনফারেন্সের সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ কনফারেন্সকে রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। "খণ্ডিত ভারতে" ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কেবলমাত্র কলেজের কর্মসচিব স্যার সৈয়দ আহমদ নহেন, অধ্যক্ষ মিঃ বেক পর্যন্ত সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, লবণ শুল্ক প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবীর বিরোধিতা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দেখাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু নবাব মহসিন উলমুল্‌কের বেলায় উর্দুসভায় সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়।" ১৯০১ সালে নবাব মহসীন উল্‌মুলক "মহামেডান পলিটিক্যাল অরগেনাইজেশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাহাতে তিনি কর্মচারী রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য ও আদর্শ অক্ষুন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকার এইরূপ সংস্থানের অনুমোদন নাই। ইহার ফলে নবাব সাহেবের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কংগ্রেসে মুসলিম

যখন ভারতে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় ও ক্রমে তাহা প্রসারিত হইতে থাকে তখন তিন দিক হইতে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারত সরকার ও মিঃ বেক নীতি হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছিলেন; কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদের জাতীয়তাবাদবিরোধী মনোভাব বা মুসলমানদের বিরোধিতা বলিয়া গ্রহণ করিলে মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হইবে; কারণ সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু জাতীয়তাবাদী নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তৈয়বজী। ভারতের মুসলিম রাজনীতি পুস্তকে বিনয়েন্দ্ররায় চৌধুরী লিখিয়াছেন,"পরবর্তীকালে এলাহাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনে স্যার সৈয়দ আহমদের বিরোধিতা এবং হিন্দুদের গো-রক্ষা আন্দোলন ও হিন্দী ভাষার আন্দোলন সত্ত্বেও অধিবেশনে সমবেত জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল মুসলমান।

ইহা হইতে বোঝা যায় সাধারণভাবে মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী মনোভাব সকল স্বার্থ ও বাধা-বিপত্তির উর্ধে থাকিয়া যথেষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে মিঃ বেক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি করার জন্য বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জনাব তোফায়েল আহমদ যেমন তেমনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার 'খণ্ডিত ভারতে' এ-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিছু উদ্ধৃত করা হইল।

মিঃ বেক বলেন, "বিগত কয়েক বৎসর হইতে এই দেশে যে দুইটি আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে তাহার একটি হইতেছে জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলন ও অপরটি গো-হত্যা বিরোধী আন্দোলন। ইহার মধ্যে প্রথমটি ইংরাজবিরোধী ও দ্বিতীয়টি মুসলিমবিরোধী।

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজ গভর্ন-মেন্টের হাত হইতে হরণ করিয়া একদল হিন্দুর হাতে হস্তান্তরিত করা। আর গো-হত্যা আন্দোলনের লক্ষ্য হইল ইংরাজ এবং মুসলমান-দের অনশনক্লিষ্ট করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা। ইহার ফলে ইতিমধ্যে আযমগড়, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। মুসলমান এবং ইংরাজরাই হইয়াছেন আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু।"

বিলাতে ডিফেন্স এসোসিয়েশনের প্রচার কার্য চালাইতে গিয়া মিঃ বেক বলেন, "ইঙ্গ-মুসলমান একতা বরং সম্ভবপর কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অসম্ভব ও অবাস্তব ব্যাপার।" তিনি আরও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন যে, "ভারতে পার্লিয়ামেন্টারী প্রথা একেবারে অচল। তাহা সত্ত্বেও যদি সেখানে সেই প্রথা পরিবর্তিত হয় বা করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের চাপে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে।" এইভাবে তিনি কখনও মুসলমান সম্প্রদায়ের পিঠ চাপড়াইলেন কখনও বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যদি সজাগ না থাকেন ও হিন্দুদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করেন তাহার ফল অতিশয় শোচনীয় হইবে।" (খণ্ডিত ভারত)

এই উদ্ধৃতির মধ্যে তখনকার ইতিহাসের স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে, বিশেষ করিয়া সম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মনোভাব সম্পর্কে ও বৃটিশ ভেদ-নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে। ইহার পর স্যার সৈয়দ আহমদ ইন্তিকাল করেন এবং মিঃ বেকেরও মৃত্যু হয়। মিঃ বেকের স্থলাভিষিক্ত হন মিঃ থিওডর মরিসন। তিনি ১৯০১ সালে ইনিস্টি-টিউট গেজেটের একপত্রে লেখেন, "এ দেশে গণতান্ত্রিক প্রথা প্রবর্তিত হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা কাঠ-কাটা ও জল-তোলা শ্রেণীর দুর্গতদের দশায় পরিণত হইবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রয়োজন নাই; কারণ বড়বড় ব্যক্তিরা সরকারী অসোন্তোষের ভয়ে

তাহাতে যোগ দেবেন না, ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইবে। আমার মতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলমান স্বার্থের পরিপোষক না হইয়া প্রতিবন্ধক হইবে।" (খণ্ডিত ভারত)

সাম্প্রদায়িক বালগঙ্গাধর তিলক

একদিকে যখন ইংরাজ শাসকশ্রেণীর পক্ষ হইতে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল তখন দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির পুনর্গঠনকল্পে বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে রায়গড়ে এক বক্তৃতায় বলেন, "আমাদিগকেও শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ঢাল-তলোয়ার লইয়া অসংখ্য মুসলমান বহিরাগতকে হত্যা করিতে হইবে। যদিও এইরূপ যুদ্ধে আমাদেরও কিছু ক্ষতি হইবে, তাহা হইলেও এইরূপ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে।

তিলকের জীবনী রচয়িতা রবার্ট বাইরন "স্টেটসম্যান অব ইন্ডিয়া" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "১৮৯৮ সালে কেশরী পত্রিকায় তিলক গো-হত্যা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের খোলাখুলি এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন এবং বৃটিশ সরকারকে মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধের আইন প্রত্যাহার করিতে বলেন। তিনি গীতা হইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে মহাভারতে আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য বিশেষ। অতএব যে সব পরদেশী (মুসলমান) এই দেশে বাস করিতেছেন তাহাদের এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কিম্বা হত্যা করা দোষের নয়।"

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যাহা ভারত বিভাগের অস্ত্রস্বরূপ বলিয়া পরবর্তীকালে প্রচারিত হইয়াছে তাহার উৎস কোথায় তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ১৮৯৭ সালে যখন বোম্বাই শহরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিউবোনিক প্লেগ সংক্রামকরূপে দেখা দেয় এবং বহু জীবনহানী হয় তখন তিলক কেবলমাত্র হিন্দুদের চিকিৎসার জন্য "হিন্দু প্লেগ হাসপাতাল" স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে

যে, বাংলা প্রদেশেও তখন সাম্প্রদায়িক হাওয়া বহিতেছিল। পাঞ্জাব ও বোম্বাই-এ শুদ্ধি আন্দোলন চলিতেছিল; আর ইহার সাথে 'হিন্দু মেলা', 'শিবাজী উৎসবে'র নামে মুসলমান নিধনের আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যখন ভারতে শাসক গোষ্ঠী অপপ্রচারে ব্যস্ত তখন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন হিন্দু নেতাকে ইহার প্রতিবাদ করিতে শোনা যায় নাই। বরং রেনেসাঁস যুগের স্বপ্নে বিভোর থাকিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু সমাজসেবী ও নেতা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা চিন্তা করিতেছিলেন; অন্য দল সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য গুছাইতেছিলেন; আর জাতীয়তাবাদী দল ও নেতারা দেশের স্বার্থবিরোধী বলিয়া শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে ভারতীয় স্বার্থের নামে বিশেষ করিয়া চাকুরীর ক্ষেত্র পরিস্কার থাকে তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তাহারই সহিত তিলক প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী হিন্দুরা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন তখনও জাতীয়তাবাদী হিন্দু সভ্যরা একটি প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেখা যায় তিলক প্রভৃতি ব্যক্তিরাই পরে কংগ্রেসের মধ্যে আধিপত্য-বিস্তার করেন।

তাহার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। সকল কর্মতৎপরতা প্রায় শেষ হইয়াছে। সেই দিনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাও নির্বাপিত হইয়াছে কিন্তু বর্তমানে একথা স্বীকার করিতে কোন প্রকার বাধা নাই যে তৎকালীন মুসলমানদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহারা তাহাদের বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত করিতে চাহিয়াছিল, রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে তাহাদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইংরাজ যেমন অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তেমনি একশ্রেণীর হিন্দু ধর্মের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমান অস্তিত্ব বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু মুসলমান প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসে যোগদান করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

বাঙালীরা একদিকে যেমন ভারতের বিভিন্নসমস্যা সম্পর্কে ভারতীয়দের রাজনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সঙ্গে নানাভাবে সমঝোতা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, অন্যদিকে ভারতীয় জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিবার সকল চেষ্টাই করিয়া আসিতেছিল। তখন শাসক শ্রেণীর পক্ষ হইতে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ ভারতের রাজনীতে ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় পরিবর্তন দেখা দেয়।

কার্জনের আঘাত ও বাংলার জাগরণ

তদানীন্তন শাসক লর্ড কার্জন উপরোক্ত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাঙালীর রাজনৈতিক জীবনে যে আঘাত হানেন তাহা বাঙালী অসীম ধৈর্যে সহ্য করিয়াছিল। আর তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বাংলার হিন্দু-মুসলমান, বাংলার শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাংলার পুরুষ-নারী বাংলার তরুণ-বৃদ্ধ—একযোগে যে দাবানল জ্বালাইয়া ছিল তাহার তেজষ্ক্রিয়া কেবলমাত্র বাংলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। সারা ভারতের দিকে দিকে রাজনৈতিক দাবী আদায়ের সফলতা সম্পর্কে ত্যাগের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। আর বৃটিশ সরকারকে রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের ছোট-বড় সকল যন্ত্রকে নূতনভাবে কার্যকরী করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

প্রথমেই লর্ড কার্জন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস করেন এবং সরকার পক্ষীয় ব্যক্তিকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কার্যধারাকে অনেকখানি সরকারী কর্তৃত্বের আওতায় আনিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে ভারতীয় জনমনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া লর্ড কার্জন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যুক্ত করিবার জন্য ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমস্ত বাংলা প্রদেশে প্রবল প্রতিবাদ

আন্দোলন দেখা দেয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ইহাকে পাশবিক ব্যবস্থা বলিয়া আখ্যা দেন এবং এই বিভাগের বিরোধিতা করেন। ইহাতে লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, "প্রাচ্যদেশবাসীরা সত্য সম্বন্ধে আদৌ শ্রদ্ধাশীল নহে।" বাংলা নহে, ভারত নহে, সকল প্রাচ্য দেশবাসীর বিরুদ্ধ এইরূপ হীন মন্তব্য করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে ক্ষুব্ধ জনগণ স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা করিতে থাকে। এইরূপ প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি লর্ড কার্জনের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি করে। তিনি তাহার পর ঢাকায় আসিয়া এক প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতাদান কালে মুসলমানদের সম্বোধন করিয়া বলেন যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা তিনি এমন একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করিতে চান যেখানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় থাকিবে। তাঁহার এইরূপ বক্তৃতা ও আলোচনার পর বাংলা প্রদেশের কিছু সংখ্যক মুসলমান বঙ্গ বিভাগের পক্ষে রায় দেন। অনেকে ভবিষৎ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু বেশীর ভাগ মুসলমান বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বিভাগ-বিরোধী হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ প্রথমে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে মত দেন এবং মিঃ গুরুমুখ নেহাল সিং-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে লর্ড কার্জন নবাব সাহেবের সহায়তা লাভের আশায় নবাব সাহেবকে কম সুদে একলক্ষ পাউন্ড ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নবাব সাহেবের ভ্রাতা নবাবজাদা খাজা আতিকুল্লাহ ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে ঘোষণা করেন, "নবাব সাহেব এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বঙ্গ বিভাগের সহায়তা করিলেও পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগ চাহে না।" স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁহার "এ নেশন ইন মেকিং" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত শক্তি বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করে।" স্যার হেনরী কটন বলেন যে, প্রদেশের একত্ব ও অখন্ডত্ববোধকে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে

শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনরূপ হেতু বিদ্যমান ছিল না।" স্টেট্সম্যান বলে, "মুসলমান শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়া পূর্ববঙ্গকে বলশালী করিয়া তোলা এবং দ্রুত বর্ধনশীল হিন্দু সংহতি সংযত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।" "মুসলিম পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া"-এর লেখক বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, "জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে লর্ড কার্জনের ভয় কিম্বা অনুগ্রহ বিপথগামী করিতে পারে নাই। ইহা প্রত্যেকটি বঙ্গবাসীর গর্বের বিষয়।"

রাজনৈতিক আন্দোলন ও বরিশালে পুলিশী অত্যাচার

ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সেদিন সমস্ত বাংলা প্রদেশে যথেষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে থাকে; কিন্তু সরকার অটল থাকে। প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে পর্যবসিত হয় আর সর্বপ্রথমে বরিশালেই শোভাযাত্রা এবং সভা হয়। সেই শোভাযাত্রা এবং সভা পরিচালনা করেন এক বিরাট ব্যক্তিত্বশালী মুসলমান—ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। এইরূপ শোভাযাত্রা এবং সভার উপর পুলিশী হামলা হয় এবং যোগদানকারী অধিকাংশ সদস্যদের যথেষ্ট নিগৃহীত হইতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ইহাই প্রথম পুলিশের আক্রমণ। আন্দোলনকারীরা ইহাতে আদৌ দমেন নাই; বরং ক্রমেই আন্দোলনের রূপ আরও ভয়ংকর ও বিস্তৃত হইতে থাকে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্র কংগ্রেসের কার্যসূচী নূতনভাবে চিন্তা করিবার পথ খুঁজিয়া পায়। মিঃ আবদুর রসুল সম্বন্ধে বিনয়েন্দ্রমোহন ''ভারতে মুসলিম রাজনীতি "পুস্তকে লিখিয়াছেন, "বরিশাল কনফারেন্সের সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুর রসুল আজিও বাঙালী হিন্দু মুসলমানের জাতীয় নেতা।" আর একজন মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন স্বাধীনচেতা একনিষ্ঠ দেশ-সেবক লিয়াকত হোসেন, যিনি নির্ভীকভাবে বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও কারারুদ্ধ হইতে হয়।

মুসলিম আন্দোলনকারীদের উপর বরিশালে পুলিশের হামলা কেবলমাত্র বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মনে বৃটিশবিরোধী মনোভাব বিস্তৃত করিয়াছিল তাহাই নহে বাংলার বাহিরেও ইহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে অনারেবল নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ বাহাদুরের সভাপতিত্বে বরিশালে পুলিশী অত্যাচারের বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারের নিকট পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা এক কড়া প্রস্তাব প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় মুসলমানদের অভাব অভিযোগ প্রতিবিধানকল্পে সিমলায় ভাইসরয়ের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং নবাব সাহেব উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিন সিমলায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বরিশালে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া ডেপুটেশনে যান নাই। সেই দিন বাংলার মুসলমানরাই সর্বভারতীয় জাতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়াছিল, বঙ্গবিরোধী শক্তির প্রেরণা যোগাইয়াছিল, সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অন্তরে; স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মাহুতি দিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। সেদিন ভারতবাসী উপলব্ধি করিয়াছিল একতাবোধের প্রয়োজনীয়তা।

বৃটিশের নতুন কৌশল

এমন সময় ১৯০৫ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস, যিনি পরে পঞ্চম জর্জ রূপে ভারত সম্রাট হইয়াছিলেন, ভারত ভ্রমণে আসেন এবং কিছুদিন এখানে অবস্থান করিবার পর ১৯০৬ সালের প্রথম দিকে বিলাত প্রত্যাবর্তন করেন। তখন বিলাতে লর্ড মর্লে ছিলেন সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া আর দিল্লীতে ছিলেন ভাইসরয় রূপে লর্ড মিন্টো। ১৯০৬ সালের ১১ই মে লর্ড মর্লে লর্ড মিন্টোকে যে পত্র দেন তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে "প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে এবং জানিতে পারিলাম যে ভারতে প্রতিদিন কংগ্রেস

শক্তি সঞ্চয় করিতেছে এবং মুসলমানরাও ইহাতে যথেষ্ট সংখ্যায় যোগদান করিতেছে।"

২৮শে মে তারিখের এই পত্রের উত্তরে ভাইসরয় লেখেন যে "কংগ্রেসের মধ্যে রাজানুগত্য মোটেই নাই। অতি বিলম্বে ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আমাদের শাসন ব্যবস্থায় বিপদ আসিবে।"

৬ই জুন লর্ড মর্লে ভাইসরয়কে জানান, "লরেন্স, চিরোল, মিডনিলো আপনার পত্রে উল্লেখিত মতবাদের অনুকূলে মত দিয়াছেন। বর্তমান পদ্ধতিতে আপনারা ভারত শাসন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের সহিত বোঝাপড়া আপনাদের করিতেই হইবে। মুসলমানরাও যে অচিরে আমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহাদের অতীত ইতিহাস তাহাই সাক্ষ্য দেয়।"

ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা প্রদেশে বিপ্লববাদী দলে কেবলমাত্র হিন্দুদের লওয়া হইত। ইহারা দারুণ মুসলিমবিরোধী ছিল বলিয়া মওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁহার "ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম" পুস্তকে লিখিয়াছেন: "বৃটিশ সরকার তখন মুসলমানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং পুলিশের চাকুরীতে উত্তর প্রদেশ হইতে বাংলায় কিছু সংখ্যক মুসলমান পুলিশ কর্মচারীকে আমদানী করা হইয়াছিল এবং তাহার জন্য বাঙালী বিপ্লববাদীরা বাঙালী মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখিতেন।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ চাকুরী ক্ষেত্রে কিছু চাকুরীয়া যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা হইত না। এইজন্য একদিকে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের কাল্পনিক অবিশ্বাস অন্যদিকে মুসলমানদের মনে হিন্দুদের প্রতি বিরূপ মনোভাব, রাজনীতি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কেহই বিবেচনা করেন না। একটু গভীরভাবে ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের অনেক

সমস্যাই সমাধান হইয়া যাইত। এই বিষয়ে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইতেছে। 'ভারতীয় মুসলমান" পুস্তকে মিঃ হাণ্টার ১৮৭২ সালে লিখিয়াছেন; "বৃটিশ সরকার প্রথমে হিন্দুদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিত। চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদেরই লওয়া হইত।"

"ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া" পুস্তকে শ্রী জওহারলাল নেহরু লিখিয়াছেন, "পলিসি হিসাবে বৃটিশ প্রথমে হিন্দু দরদী এবং মুসলিমবিরোধী ছিল। এমন কি সিপাহী বিদ্রোহে বৃটিশ সরকার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের উপরই ইচ্ছা করিয়া বেশী অত্যাচার করে।"

মুসলিম স্বার্থের সনদ

ইহার পর বৃটিশ শাসকচক্র ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করিতে থাকে এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রথমে হিন্দু তোষণ, মুসলিম নির্যাতন। এবং তাহার পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে হিন্দু অধ্যুষিত আখ্যা দিয়া মুসলিম তোষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বৃটিশবিরোধী সাধারণ মুসলমান ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ বৃটিশ ব্যবস্থাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে না, বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরা, যাহাদের সহিত হিন্দু জনসাধারণের সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট মিল ছিল, ইহারা কংগ্রেসে যোগদান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

লর্ড মর্লে ও লর্ড মিণ্টোর পত্রালাপের মধ্যে দেখা যায় যে ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি যথেষ্ট জরুরী হইয়া পড়ে এবং মুসলমানদেরকে রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া না রাখিতে পারিলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতে পারিত তাহাও প্রকাশ পায়। তাহা বিবেচনা করিয়া সরকার একটি নূতন চাল চালে এবং তাহারই ব্যবস্থা

হিসাবে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ আর্চিবোল্ডকে কাজে লাগানো হয়।

১৯০৬ সালের ১০ই আগস্ট উক্ত মিঃ আর্চিবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য সচিব জনাব মহসীন-উল-মুলককে এক পত্রে জানান "ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল ডানলপ স্মিথ আমাকে জানাইয়াছেন, বড় লাট এক মুসলিম প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত তবে সে সম্বন্ধে যথারীতি আবেদন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা সাপেক্ষে প্রথমতঃ দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। আবার কয়েকজন মুসলমান নেতার (তাঁহারা নির্বাচিত না হইলেও চলিবে) স্বাক্ষর ইহাতে থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হইতেছে এই প্রতিনিধিদলের সদস্য হইবেন কাহারা? প্রদেশ সমূহের প্রতিনিধিরূপেই তাঁহাদের আসা উচিত। তৃতীয় প্রশ্ন হইতেছে, সম্ভাষণের বক্তব্য বিষয় কি হইবে?

"এই বিষয়ে আমার অভিমত এই যে, রাজানুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে এবং ভারতীয়দের পক্ষে রাজ সরকারে উচ্চপদ লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে; কিন্তু নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ফলে সংখ্যা লঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থহানী ঘটিবে এরূপ আশংকা প্রকাশ করা কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও প্রকাশ করিতে হইবে যে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করিবার ফলে অথবা ধর্মগত ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামতের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব অবশ্যই অর্পণ করা হইবে। ভারতের ন্যায় দেশে জমিদারদের মতামতের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা যে প্রয়োজন—এ অভিমত প্রকাশ করা কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

"আমার ব্যক্তিগত অভিমতের কথা বলিতে হইলে, আমি বলিব মনোনয়ন প্রথা সমর্থন করাই মুসলমানদের কর্তব্য। এই কারণে যে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের সময় এখনও আসে নাই। তাহা ছাড়া

নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝিয়া পাওয়া তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারে আমি থাকিব নেপথ্যে এবং যাহা কিছু করণীয় তাহা আপনারাই মুখপাত্ররূপে করিবেন। মুসলমানদের কল্যাণের জন্য আমি কি পরিমাণ ব্যস্ত তাহা আপনারা জানেন এবং সেই আন্তরিক আগ্রহের বশেই—আনন্দে সকল প্রকার সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত। আপনাদের পক্ষ হইতে আমি সম্বর্ধনার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে রাজী আছি। যদি বোম্বাইয়ে তাহা রচিত হয় তাহা হইলেও তাহা আমি দেখিয়া শুনিয়া দিতে পারি; কারণ ভাষাগত সৌষ্ঠবের সহিত আবেদন রচনার কৌশল আমার জানা আছে। কিন্তু নবাব সাহেব একথা স্মরণ রাখিবেন যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ কর্ম ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চান তাহা হইলে সে বিষয়ে আপনাদিগকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে।

লর্ড মিন্টোর ভাষায় বলিতে গেলে মহসীন-উল-মুল্ক তদনুযায়ী মুসলমান প্রতিনিধিদল গঠন কার্য সুকৌশলে সম্পন্ন করিলেন। সম্ভাষণ পত্র রচিত হইল এবং ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান প্রতিনিধি দল বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। (খণ্ডিত ভারত)

লেডি মিন্টো এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্যাপারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা—যাহা বহু বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করিবে। ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ লোককে বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধপন্থী দলের প্রভাব হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। লর্ড মিন্টোর জীবনীলেখক মিঃ বুকান বলেন, "বক্তৃতার ফলে মুসলমানগণের দলভুক্তির দরুণ রাজদ্রোহীদের সংখ্যাবৃদ্ধির পথ যে রুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আসন্ন গোলযোগের সময় ইহা হইতে অশেষ সুবিধা পাওয়া যাইবে।"

ইহাকে তিনি মুসলমান স্বার্থের সনদরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। মৌলভী তোফায়েল আহমদ লিখিয়াছেন, "বিলাতী সংবাদ পত্র

সমূহে ব্যাপারটি যাহাতে বহুলভাবে প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থাও করিয়াছিল। বড় লাটের সহিত প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ হইবার কথা ছিল ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে এবং সেই দিনই মুসলমানদের বিচক্ষণতার প্রশংসামূলক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ "লন্ডন টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হয়, মুসলমানরা ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী কোন দিনই ছিলেন না; কারণ ইংলন্ডের মত একজাতি বলিতে কোন কিছুর অস্তিত্ব ভারতে নাই।, তাছাড়া বহু ধর্মের প্রচলন সেখানে বিদ্যমান ইত্যাদি। অন্যান্য পত্রিকাতেও অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত প্রবন্ধ হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতে এক জাতিত্বের বিরুদ্ধে বিলাতী পত্রিকাসমূহ কিরূপ উৎকট উষ্মা ও অন্তর্দাহ পোষণ করিত; তাহা ভগ্ন ও খণ্ডিত হইতে দেখিলে তাহারা কিরূপ সন্তোষ লাভ করিত এবং ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া তাহাদের একটিকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া চিরস্থায়ী বিভেদ বাধাইয়া রাখিতে পারিলে তাহারা কিরূপ গর্ববোধ করিত।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল এবং বড় লাট ও ভারত সচিবের মধ্যে বহু পত্রবিনিময়ের পর পরিশেষে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমন্ডলী স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। মৌলানা মোহাম্মদ আলী সিমলায় লর্ড মিন্টোর নিকট মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ যে পরিকল্পিত আদিষ্ট ও নির্দেশিত কর্ম বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন; এবং এইরূপ প্রতিনিধিত্বের তিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি বলেন যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বৃটিশ সরকার বিপথগামী করিলেও সাধারণ মুসলমানগণ সরকারের হীন উদ্দেশ্য ও চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রী নেহরু "ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "ইহা সত্ত্বেও বহু মুসলমান জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। বিশেষ করিয়া যে সব মুসলমান জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছিল

বৃটিশ সরকার তাহাদিগকে তোষণ করিতে থাকে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেখা যায় যে, মুসলিম যুবক শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক তৎপরতা অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠে। ভারতে মুসলিম রাজনৈতির লেখক বিনয়েন্দ্ররায় চৌধুরী লিখিয়াছেন, "এইভাবে আমরা বৃটিশ সরকারের মুসলমানদের রাজনীতি হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চক্রান্ত লক্ষ্য করিয়াছি, যাহাতে এক শ্রেণীর মুসলমান নেতার কার্যক্রম কংগ্রেসবিরোধী হইয়া সে বিষয়ে উস্কানী দিতেছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। মৌলানা মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমদ, শিবলী নোমানী প্রভৃতি মৌলানাগণ এইরূপ প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করেন। নবাব সৈয়দ আহমদ বাহাদুর প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য নির্ধারিত হইয়াও বরিশালের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাইয়া লাট বাহাদুরের নিকট যান নাই।

লর্ড মিন্টোর প্রধান কাজ হয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। ১৯০১ সালে নবাব মহসীন-উল-মুল্‌ক এবং নবাব ভিকারু-উল্‌-মুল্‌ক আলীগড়ে মুসলমানগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন কিন্তু সরকারী বাধা-বিপত্তির জন্য তাহা স্থায়ী হয় না।

"মুসলিম ইন্ডিয়া"র লেখক মোহাম্মদ নোমান লিখিয়াছেন যে গভর্নর লেফটেনেন্ট এই সমিতিকে গঠন করিয়া দেন। তখন উত্তর প্রদেশে উর্দুভাষার বদলে হিন্দীভাষার প্রচলন আন্দোলন হইতেছিল এবং নবাবদ্বয় হিন্দীভাষার প্রচলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত সমিতির "আঞ্জুমানে হেমায়েতে উর্দু" সভাপতিকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া বলেন যে, আলিগড় কলেজের কর্মসচীবের পক্ষে কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত নহে। সেদিন উর্দুশিক্ষা বিস্তৃতির জন্য সমিতিকে রাজনৈতিক সমিতি বলিতে ও নবাব মহসিন-উল-মুলককে পদত্যাগ করিতে বলিতে গভর্নর দ্বিধাবোধ করেন নাই।

মুসলিম লীগের সৃষ্টি

কিন্তু ১৯০৬ সালে পরিবর্তিত অবস্থায় যখন হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তি জাতীয় কংগ্রেসে একতাবদ্ধ হইতেছিল, বঙ্গবিভাগ রোধের জন্য আন্দোলন হইতেছিল এবং বৃটিশবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন ঢাকায় মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়। মুসলিম প্রতিনিধিদল গঠনে যে নবাব সাহেব ছিলেন সেই নবাব সাহেব মহসীন-উল-মুলক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য রূপে যে-কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা নিম্নরূপ :

১। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য-ভাববিস্তার করা এবং কখনও কোন প্রকার ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হইলে সেইরূপ অবস্থা বিশ্লেষণ করা ও সুস্থ মনোভাব সৃষ্টি করা।

২। মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা।

৩। অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হইতে মুসলমানদের বিরত রাখা।

দেখা যাইতেছে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ হিউম আবেদন জানান তখনও এই প্রকারের মনোভাব লইয়াছিলেন। এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে যাহার উল্লেখ না করিলে ত্রুটি রহিয়া যাইবে। তাহা হইতেছে দারভাঙ্গার মহারাজ কর্তৃক হিন্দু-মহাসভার প্রতিষ্ঠা। "খণ্ডিত ভারতে" শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "এই সময়ে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ইহা হয়তো ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রাসাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় ছিল কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক হাওয়া যেভাবে বহিতেছিল তাহাতে ইহাই স্বাভাবিক ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেস সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক হিন্দু গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে নিরাশ হইয়া ইংরাজরা যে ছাপ মারা পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক দল সৃষ্টি করিতে ত্রুটি করিবেন না লর্ড মিণ্টোর পত্রালাপের মধ্যে সে ইঙ্গিত ছিল। যাহারাই তখন রাজনীতি লইয়া সময় ক্ষেপণ করেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তখন

রাজনীতি ক্ষেত্রে কয়েকজন নেতা নেতৃত্ব করিলেও জনগণের সমর্থন ও পূর্ণ আস্থা তখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিস্তৃতর হয় নাই। জনগণের মধ্যে তখনও রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ ছিল না। কিছু লোকের সমর্থন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে জনগণের পক্ষ হইতে রাজনৈতিক দাবী আদায়ের কোন লক্ষণ দেখা যাইত না। একমাত্র পরাধীনতার গ্লানি কমবেশী অনেকের অন্তরে মাঝে মাঝে আঘাত দিত ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত এবং তাহারই ফলে কখনও কখনও বিস্ফোরণের মত কোন কোন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ভাব গ্রহণ করিত।

এই সকল বিষয়ে করণীয় কার্য স্থির করিতে সরকার পক্ষ কোন সময়েই সংশয়াপন্ন হয় নাই বরং পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিবার পূর্বেই ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল যে ভারতের অশিক্ষিত জনগণকে নানাভাগে বিভক্ত করিতে হইলে নেতৃস্থানীয় শিক্ষিতগণকে মতবাদ, স্বার্থ ও নীতির নামে বিভক্ত করিলেই কার্যোদ্ধার করা যাইবে। লর্ড বেন্টিংকের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল সামাজিক সংস্কার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা কার্যকরী করিবার জন্য জনগণের সম্মুখে নেতৃবর্গকে বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মানুগত মন যখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিবর্তনের ব্যাপারে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আদেশ-উপদেশ মানিয়া লইতে পারে তখন রাজনীতি সম্পর্কে একান্ত অন্ধ ও অজ্ঞ জনগণ যে নেতৃবর্গের বিরোধিতা করিবে না তাহা সুনিশ্চিত ভাবিয়াই সে সময়কার বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বিভিন্ন স্বার্থনীতির কথা বুঝাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করে আর রাজনীতি ক্ষেত্রে একান্ত অনভিজ্ঞ ভারতীয় জনগণ ভেদবুদ্ধির যুপকাষ্ঠে মাথা গলাইয়া দেয়।

ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৯০৫ এবং ১৯০৬ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন অনেক ভারতীয় পাশ্চমী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে।

রাজনীতি পুস্তকাদি পাঠ করিয়া রাজনীতি শিখেতেছে, ভারতীয় গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া বাহিরের সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেকে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কিম্বা সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা অর্জন করে নাই। ইহা কিছুটা স্বার্থ কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন মনের গতি তাহা ব্যতীত সত্যকার রাজনৈতিক দাবী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও নির্ধারিত হয় নাই। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ বঙ্গবাসীর মনে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদের মতই মনে হইয়াছিল। ইহার জন্য বাংলা প্রদেশের সাধারণ মুসলমান ও মুসলিম প্রধান বঙ্গদেশ রাজনীতির দিক হইতে সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিতে চাহে নাই বরং ইংরাজের বিভেদ সৃষ্টিকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া এইরূপ পরিকল্পনা রদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এইরূপ কর্মের প্রতি-ক্রিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কতখানি বাস্তববাদী ও ভবিষ্যৎ গঠনে প্রয়োজন ছিল তাহাও বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপ্লববাদী হিন্দুদের নিকট তখনও মুসলমানরা ছিল অবিশ্বাস্য। ইহার কারণ স্বরূপ মৌলানা আজাদ লিখিয়াছেন যে ইহার মূলে উত্তর ভারত হইতে পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান গুপ্তচর আমদানী করাই কতকটা দায়ী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের অন্তরই ছিল বেশী দায়ী। সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে যেমন সাধারণ হিন্দুর খাওয়া-দাওয়া চলিত না এবং হিন্দুরা মুসলমানদের অচ্ছুৎ বলিয়া মনে করিত তেমনি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও এই শ্রেণীর মুসল-মানকে নিম্নস্তরের মানুষ বলিয়া ঘৃণার ভাব দেখাইত।

মৌলানা আজাদের ভাষাতেই বলিতে হয়, "আমি এই সময়ে একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদী শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হই এবং তাঁহার মাধ্যমে আরও অনেক বিপ্লবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীঅর-বিন্দ ঘোষের সঙ্গেও আমার দুই-তিনবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং "কর্মযোগ" পত্রিকার

মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। যখন শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন যে, আমিও বিপ্লবী বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিতে চাহি তখন সকলেই আশ্চর্যান্বিত হন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করেন নাই এবং তাঁহাদিগের ভিতরকার কোন গূঢ় তথ্য আমার নিকট প্রকাশ করিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। বিপ্লব সম্পর্কে আমার সহিত তাঁহাদের তর্কবিতর্ক হয় এবং পরে তাঁহারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। আমাকে তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে কয়েকজন মুসলমান অফিসারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা উচিত নহে। মিশর, ইরান ও তুরস্কে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা প্রবর্তনের জন্য মুসলমানরা বিপ্লবাত্মক কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতে মুসলমানরা এইরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে, আমরা যদি তাঁহাদের সঙ্গে একযোগে কার্য করি। আমি একথাও প্রকাশ করি যে, মুসলমান স্বাধীনতা যুদ্ধে যদি উদাসীন থাকে বা বিরোধিতা করে তাহা হইলে স্বাধীনতা লাভ বিঘ্নিত হইবে। প্রথমে বিপ্লবী বন্ধুগণ আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি বুঝিতে চাহেন নাই। তাহার পর যখন অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিলেন এবং কার্য আরম্ভ করিলেন তখন সত্যই দেখিতে পাইলেন যে একদল মুসলিম যুবকর্মী বিপ্লবী দলে যোগদান করিয়াছেন।

"ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া" পুস্তকে শ্রীনেহরু লিখিয়াছেন, "ভারতীয় মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবাদ বেশ গভীরভাবে কার্য করিতে থাকে এবং বহু সংখ্যক মুসলমান নেতৃত্ব দান করেন; কিন্তু তাহা হইলেও বলিতে হয় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে যথেষ্ট হিন্দু প্রাধান্য ছিল; এমন কি হিন্দুস্থানীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করিত।"

পরবর্তীকালে শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতের জাতীয়তাবাদ সকল সময় হিন্দুয়ানী ভাবধারা মুক্ত ছিল না বলিয়া তাহার বহু প্রবন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে বৃটিশ শাসকশ্রেণী যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হয় তখন একদিকে দুইটি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথকভাবে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা সৃষ্টি করিবার পিছনে যতটুকু দেশের লোকের সমর্থন প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের এক বিশেষ অংশ সরকারকে সমর্থন দেয়। সেই জন্য বলিতে হয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষাবঞ্চিত, আর্থিক অভাবক্লিষ্ট সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে উচ্চ শিক্ষিত অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ধনিকশ্রেণী হিন্দুদের দ্বারা হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য ছিল না তেমনি ঐতিহাসিকের নিকটও তাহা কোন প্রকার বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শিক্ষাভিমানী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বৃটিশের সব খেলা ঠিক সময় মত বুঝিতে পারেন নাই কিম্বা বৃটিশের দুমুখো নীতির নিকট নিজ নিজ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নৈতিক পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯৩৬ সালে মৌলবী মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কলিকাতা হইতে "দি মুসলমান" নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির হইতে থাকে। তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা বর্জনের জন্য সকল সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানানো হয় এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা এবং বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনকে জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে গণ-চেতনা বৃদ্ধি করিবার জন্য উদার ও বলিষ্ঠ মত প্রচার করিতে থাকে। জানা যায় ফরিদপুরের এক হাজার জমিদার, তালুকদার, জোতদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি শ্রেণীর ব্যক্তিরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন জানান। মালদহেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভাসমিতি করা হয় এবং সেখানেও এক সভায় প্রায় হাজার খানেক মুসলমান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম যুবকশ্রেণী কেবলমাত্র হিন্দু মুসলিম ঐক্য নহে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী আদায়ের ব্যাপারে কর্মসূচী গ্রহণ

করে; কিন্তু ইংরাজ, পাদ্রী ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়রা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির পথে যথেষ্ট বাধা দান করেন এবং ইংরাজ-ঘেঁষা চাটুকার মোসাহেব ভারতীয়গণ আন্দোলনে ও বিপ্লববাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীগণকে সুকৌশলে ও দক্ষতার সহিত সকল সংবাদ পেঁছাইয়া দিতে সাহায্য করেন। তাহা সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বন্ধের সকল কর্মতৎপরতা চলিতে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গ রোধ করা সম্ভবপর হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতায় মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালের পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কয়টি দল প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করিতে থাকে তাহাদের মধ্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দুমহাসভা প্রধান। মি. হিউম প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের কার্যসূচীর মৃদু সমালোচনা করিয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় প্রথম দশ বৎসর কাটাইয়া দেন। এই সময়ে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, দেশী বুর্জোয়া শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী আর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরাই উপস্থিত থাকিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইত সর্বাগ্রে। "এমনকি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয় সেইরূপ বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সমর্থনও জানায় এই কংগ্রেস।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা : নরহরি কবিরাজ)

দেশের বিশেষ করিয়া বোম্বাই প্রদেশের দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বাংলার কৃষক আন্দোলন, নীলকুঠি শ্রমিকদের আন্দোলন, চা শ্রমিক আন্দোলন, মন্বন্তর, বঙ্গবিভাগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ঘটনার ফলে কংগ্রেসের অংশ বিশেষ বৃটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে যে দেশের স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে তাহা মানিতে চাহেন না। কংগ্রেসের মধ্যেও দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। চরম পন্থীদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা হইলেন লালা রাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল। অপরদিকে দাদা ভাই নওরোজী প্রমুখ অন্যতম কয়েকজন নরমপন্থী নেতা নেতৃত্ব করেন। চরমপন্থী দল ভারতের স্বার্থরক্ষণের জন্য ও ভারতীয় জনগণের দাবী আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদন ব্যতীত সর্বপ্রকার সক্রিয় আন্দোলনের দ্বারা যাহাতে কৃতকার্য হওয়া যায় তাহার জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই সকল নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদীর সমর্থক ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বদরুদ্দীন তৈয়বজী, রহমতুল্লা সিয়ানী, মওলানা শিবলী নোমানী, মৌলভী সোলেমান নাদভী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, আতিক উল্লাহ্ প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলমান নেতারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের মুখ্য প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কংগ্রেসের সহিত একযোগে কার্য করিতে থাকেন এবং যাহাতে চরম এবং নরম পন্থীরা নিজেদের মতবাদের উপর অতিরিক্ত জোর না দিয়া দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য পুনর্মিলিত হইয়া কার্য করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। ইহা ব্যতীত মুসলমান জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকিলেও তাহাদের মনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় থাকিয়া যায়। ইহার কারণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

মুসলিম লীগে তখন যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মহামান্য আগাখান, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্, নবাব ভিখার-উল-মুল্ক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা। যাঁহারা তাঁহাদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেসের মতই বৃটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিনের সেই মুসলিম লীগে ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদকারী মুসলমানদের দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ওহাবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা কিম্বা সিপাহী বিদ্রোহের অংশীদার শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের স্থান সেখানে ছিল না। কৃষক, শ্রমিক, নীল চাষী, ফারাজী ও ফকির আন্দোলনে যোগদানকারী মুসলমানদের মুসলিম লীগ আহ্বান জানায় নাই অর্থাৎ তখনকার মুসলিম লীগের সহিত ভারতীয় মুসলিম জনতার যোগাযোগ ছিল না। তাহারই ফলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মধারা কংগ্রেসের মত প্রশাসনিক ব্যাপারে কিছু কিছু আইন রদ-বদলের চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাদিগকে কংগ্রেসী নরম পন্থীদের মতই বলিতে পারা যাইত, অথচ মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পূর্বে ১৮৬৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ "মহামেডান লিটারারী সোসাইটি" স্থাপন করেন

যাহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়া মুসলমানদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করা; কিন্তু শাসকশ্রেণীর হস্তক্ষেপের ফলেই এই সোসাইটির অকাল মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছুদিন পর সৈয়দ আমীর হোসেনের উদ্যোগে "ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন" নামে আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমির হোসেন ১৮৮০ সালে মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন যাহাতে মুসলমানদের জন্য উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ইংরাজী শিক্ষা না করিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের পরাজয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই সোসাইটিও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই।

"স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক পুস্তকে নরহরি কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, "এইভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে এক আলোড়ন শুরু হল সন্দেহ নেই। তবে এই আলোড়ন এই সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এই কার্যকলাপ হিন্দু প্রধান স্বাদেশিকতার ধারাটির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।"

এই সকল সোসাইটি স্থায়ী না হইবার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ, সাধারণ মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। কারণ তখনও ভারতীয় হিন্দুরা ইংরাজ শাসক শ্রেণীর তুষ্টি সাধনে কোন প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই, আর মুসলমানদের ইংরাজবিরোধী জঙ্গী মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই।

হিন্দু সংগঠন ভারত মহামণ্ডল

কংগ্রেসে হিন্দু জাতীয়তাবাদী বা সংস্কারাচ্ছন্ন সদস্য যথেষ্ট সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর ইংরাজ সরকার যেমন সম্পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন নাই, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী হিন্দুরাও

কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমান সদস্যদের যোগদানের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস হয়তো হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণে অক্ষম হইয়া পড়িবে। সেই জন্য ১৯০০ সালে দিল্লীতে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সভাপতিত্বে এই সব হিন্দুদের এক বিরাট সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারত মহামণ্ডল নামে এক হিন্দু সংগঠন সৃষ্টি করিয়া একদিকে বৃটিশ সরকারে সহিত সহযোগিতা ও অন্যদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এইরূপ সম্মিলন অনুষ্ঠানে পূর্বে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু বেদ ও গীতার বাণী লিখিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীর পথ অতিক্রম করে। বৃটিশ সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাহার পর পাঁচটি বৎসর কাটিয়া যাইবার পর ১৯০৬ সালে লাহোরে বার্ষিক সভায় ভারত মহামণ্ডলের স্থলে হিন্দু মহাসভা স্থাপিত হয় ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিদ্বেষ চলিতে থাকে। মুসলিম লীগ সৃষ্টির যে ইহাও একটি অন্যতম কারণ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইংরাজ সরকার আশা করিয়াছিল, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে পারিলেই ভারতের জাতীয় শক্তি খর্ব করিতে পারা যাইবে। এই চিন্তার অনুসরণে হিন্দু মহাসভার কার্য তালিকা প্রস্তুত হয়। হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য থাকে স্বার্থরক্ষার নামে গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলনসমূহের মত নানা প্রকার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সকল প্রকার মুসলিমবিরোধী কার্যকলাপ পরিচালিত করা।

মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী : নেহরুর মন্তব্য

এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "বর্তমান সময়ে ভারত বিভক্তির যে চিৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, আমার ধারণা তাহার পিছনে নানা কারণ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে নানা ভুল-ভ্রান্তি ইন্ধন যোগাইতেছে। বিশেষ করিয়া বৃটিশ সরকারের ভেদনীতি

অনেকখানি দায়ী। কিন্তু ইহা ব্যতীতও কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান ছিল। মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টির বিলম্ব তাহার মধ্যে অন্যতম। বৃটিশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ব্যতীতও ভারতে সামন্ততান্ত্রিকতার সহিত আধুনিককালের মতবাদ ও সংঘ-সমূহের লড়াই বিদ্যমান ছিল। এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব জাতীয়তাবাদী দলেও যেমন ছিল তেমনি হিন্দু, মুসলমান এবং অপরাপর দলের মধ্যেও ছিল, জাতীয় আন্দোলন সাধারণতঃ জাতীয় কংগ্রেসই করিত; এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কংগ্রেস কতকগুলি পুরাতন ভিত্তির উপর এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধারায় নানা নূতন চিন্তা ও সংস্থা গড়িয়া তোলে এবং নিজদিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল স্তরের মানুষই কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। হিন্দুদের তরফে অনমনীয় সামাজিক বিধান ও সংস্কার এইরূপ প্রগতিকে বাধা দেয় এবং তাহা অপেক্ষাও অপরের মনে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করে। এইরূপ সামাজিক বিধি ও সংস্কার ক্রমেই চাপা পড়িতেছে এবং অতি দ্রুত ইহার অনমনীয় মনোভাব নষ্ট হইতেছে। যাহা হউক যথেষ্ট বাধা দিলেও বৃটিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বন্ধ করিতে পারে নাই। মুসলমানদের তরফে দেখা যায় যে সামন্ত শ্রেণী তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাহাদের নেতৃত্ব জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। হিন্দু মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণ এক পুরুষের সময়ের ব্যবধান এবং তাহার ফলেই রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আরও নানা ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাই ছিল মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের সম্বন্ধে মানসিক ভীতির কারণ।"

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন

ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের রাজনীতি ক্ষেত্রে চক্রান্ত করা বোধ হয় কোন ক্রমেই দূষনীয় নহে। ইহাই বুঝি রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে চক্রান্তকারীর নানামুখী চাল, ভেদবুদ্ধিঃ প্রয়োজনে

শত্রুর সঙ্গে আপোষ ও শান্তি স্থাপন করা আবার সুযোগ বুঝিয়া তাহারই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সকল কিছুই আবশ্যকীয়। স্বার্থ রক্ষার্থে শত্রুকে বন্ধু, বন্ধুকে শত্রু বলিয়া প্রকাশ করাও বুঝি রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মনুষ্যত্ব ও মানবতা আদর্শনিষ্ঠা, নীতি এবং ধর্মের স্থান কোথায়? কিন্তু তবুও মানুষ দেশের, সমাজের, দশের ও সাধারণের উপকার সাধন করিবার জন্য রাজনীতি করে। রাজা বা শাসকমণ্ডলী প্রজা পালনের জন্য ও প্রজার সর্বাঙ্গীন উন্নতির নামে যে শোষণ করে তাহাও রাজনীতি। যখন বঙ্গভঙ্গকারী ধুরন্ধর লর্ড কার্জনের সকল চক্রান্তকে অবহেলা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি বঙ্গ বিভাগ আইন প্রত্যাহার করিবার দাবীকে জোরদার করিতেছিল তখনই ১৯০৯ সালে মোর্লে মিন্টো সংস্কারের নামে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আইন সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। মুসলিম লীগের সভাপতি মহামান্য আগা খান এই আইনকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল এই আইন তাহারই স্বীকৃতি স্বরূপ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া যাঁহারা জানিতেন সেই সকল মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতে থাকেন। তাহার জন্য মিঃ বদরুদ্দীন তৈয়বজী, রহমতউল্লা মিয়ানী, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মওলানা শওকত আলী, মওলানা মুহম্মদ আলী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী বহু মুসলিম নেতার কর্ম প্রশংসনীয়। কেবলমাত্র তাহাই নহে তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া কংগ্রেসী নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এইরূপ পৃথক নির্বাচন আইনের বিরুদ্ধে ১৯১০ সালে এলাহাবাদ কংগ্রেস সভায় কঠোর নিন্দা ও তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, "ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন অঙ্গে এই আইন একটি পূতিগন্ধময় ক্ষতের মত। কিন্তু বৃটিশ সরকার একদিকে স্বার্থান্বেষী হিন্দু-মুসলমানদের নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে ও অন্যদিকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে উত্তেজিত করিতে থাকে।"

বঙ্গভঙ্গ আইন প্রত্যাহার

এইরূপ সময়ে কতকগুলি বিষয় লইয়া মুসলিম লীগ সম্পাদকের সহিত আলীগড় কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষের কলহ শুরু হয় এবং প্রতিদিন কলহের অবস্থা উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করে। উল্লেখ থাকে যে, এই ইংরাজ অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপে সিমলায় বড়লাট বাহাদুরের নিকট মুসলিম প্রতিনিধি দল গঠন ও তাহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইয়াছিল। বর্তমানে মুসলিম লীগ সম্পাদকের সঙ্গে অধ্যক্ষ সাহেবের কলহ হইবার ফলে মুসলিম লীগ কার্যালয় আলীগড় হইতে লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত হয়। ইহার ফলে ইংরাজ অধ্যক্ষটির অনুগ্রহ ও আওতা হইতে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার পক্ষে মুসলিম লীগ অনেকখানি সুযোগ পায়। ১৯১১ সালের মাঝামাঝি ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে তাহার জন্য ভারতের বৃটিশ কৃপাপ্রার্থী মুসলমানরাও ইংরাজ রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে ভারতে বৃটিশ সরকার ভারতের জনশক্তিকে বিভক্ত ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টার ফলে একশ্রেণীর মুসলমানের মনে ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মুহম্মদ নোমানীর লেখা অনুযায়ী, "ইটালী ও তুর্কীর যুদ্ধ, পারশ্যের গণ্ডগোলে ইংরাজদিগের বেআইনী হস্তক্ষেপ এবং শেষ পর্যন্ত বলকান যুদ্ধে তুর্কীর সহিত ইংরাজদের বিরোধিতা প্রকাশ্যভাবে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপ সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে। এমন কি ইংরাজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মুসলমানরাও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বঙ্গভঙ্গ আইন লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহার সহিত তুরস্ক ও পারস্যের ঘটনাসমূহ ভারতীয় মুসলমানদের এমন উত্তেজিত করিয়া তোলে যাহাতে যেকোন সময়ে ভারতে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকার কয়েকজন বৃটিশ-দরদী মুসলমান ব্যতীত আর সকল মুসলমান যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে, জেহাদী যুদ্ধের যোদ্ধাদের বংশধররা ও ইংরাজী ভাষা ও আসবাবপত্র বর্জনকারী মুসলমানরা পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে পারেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর ভারত সম্রাট দিল্লী হইতে এক ঘোষণার দ্বারা বঙ্গভঙ্গ আইন প্রত্যাহার করেন।

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মুসলমানদের নূতন চিন্তা

নূতনভাবে যে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মুসলিম লীগ সদস্যগণ ইংরাজের প্রতি অনেকখানি বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হন। মুসলমানগণও ইংরাজ শাসন সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদিগের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রণয়ন সাময়িকভাবে মুসলমানদিগের সন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে কিন্তু মুসলিম লীগ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও ১৯১১ সালে উক্ত আইন প্রত্যাহার ব্যাপারটিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নিকট বৃটিশ সরকারের পরাজয় স্বীকার বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে। আসলে ইহা ছিল মুসলিম লীগ এবং মিলিত জাতীয়তাবাদী হিন্দু মুসলমান সংগ্রামীদিগের ও কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কৌশল মাত্র।

মুসলমানরা ইংরাজ কর্তৃক তুর্কীর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটিকে অতীতকালে ইসলামের অভ্যুত্থানের পর ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভের জন্য বর্তমানে ইংরাজ কর্তৃক প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ইহাকে ইংরাজদের খৃষ্টধর্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার বলিয়া যেমন মুসলমানরা মনে করিতে থাকেন তেমনি তুর্কীর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন জ্ঞাপনকে ইংরাজরা প্যান ইসলামিক চিন্তাধারার সমর্থক রূপে মনে করেন ও প্রচার করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যথেষ্ট

গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এইরূপ প্রচারের দ্বারা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নূতন ভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে। এ ব্যাপারে ইংরাজরা একেবারে কৃতকার্য হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু ঘটনা বৈচিত্র্য ও রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহ পরবর্তীকালে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে যাহাতে হিন্দুরা এইরূপ প্রচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া অপেক্ষাও যথেষ্ট বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু অন্যদিকে বৃটিশদরদী মুসলমান ও মুসলিম লীগ এবং ইংরাজ সরকারের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। অন্যদিকে আলীগড় হইতে মুসলিম লীগের কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার ফলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষদের কবল হইতে মুসলিম লীগ রাজনীতির মুক্তিলাভ হয়।

নামাজীদের উপর বৃটিশের গুলিবর্ষণ

এইরূপ পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে সরকার শাসন ব্যবস্থা সরল করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য যে আয়োজন করে তাহার মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ আরও তীব্রতর করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। ইহার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলিম লীগকে পুনরায় জাতীয়তাবাদী দল হইতে বিচ্ছিন্ন করা। সেইজন্য সরকার হিন্দু মহাসভার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নানাভাবে ছড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় প্রতিষ্ঠান সংঘ শক্তির উপর আস্থাশীল হয় ও উভয় সংগঠনই কতকগুলি জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একে অপরের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করে এবং ১৯১২ সালে ভারতীয় মুসলমানরা ডাঃ এম. এ. আনসারীর নেতৃত্বে তুরস্কের রেড ক্রিসেন্টের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থ লইয়া কনস্টেন্টিনোপলের ওয়াজিরের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য স্বয়ং তুরস্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তুরস্কের সাহায্যার্থে মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরে আন্দোলন চলিতে ছিল এবং উক্ত প্রকার সকল সাহায্য পাঠাইবার

ব্যবস্থা হইতেছিল তখন শাসক শ্রেণী যথেষ্ট বিব্রত বোধ করে এবং কান্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া কানপুরে একটি নূতন রাস্তা তৈয়ারীর অজুহাতে একটি মসজিদ ভাঙিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। যখন জুম্মার নামাজের সময় মসজিদে নামাজ চলিতেছিল তখন হাজার হাজার নিরস্ত্র মুসলমানের উপর বৃটিশ সরকার গুলি বর্ষণ করে। এইরূপ বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তীব্র-ভাবে প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। মুসলমানদের সহিত বৃটিশের সকল বন্ধুত্বের মুখোশ জনগণের সম্মুখে খসিয়া পড়ে। স্বার্থান্বেষী কয়েকজন ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমান ব্যতীত সমস্ত ভারতের মুসল-মানদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। হিন্দুরা এই সকল ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি যেমন সমবেদনা এবং সহানুভূতি জানায় তেমনি মুসলমানরাও হিন্দুদের সহিত একযোগে কার্য করিবার ব্যবস্থা করিতে থাকে। মওলানা মুহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় দিল্লী হইতে প্রকাশিত ইংরাজী পত্রিকা "কমরেড" ও উর্দু পত্রিকা "হামদর্দ"-এ প্রত্যেহ জাতীয়তাবোধের আবেদন সম্বলিত সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইতে থাকে। "জমিদার" পত্রিকায় মওলানা জাফর আলীও যথেষ্ট সাহসিকতার সহিত দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ পরিবেশন করিতে থাকেন। ইহাতে মুসলমান সমাজে আশাতীত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন চলিতেছিল তখন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বাংলার বিপ্লবীদের সহিত একযোগে কার্য করিতেছিলেন এবং ১৯০৮ সালে তিনি ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও তুরস্কের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য উক্ত দেশসমূহ পরিভ্রমণে যান ও সেখানে বিপ্লবী তুর্কী যুবকদের এবং মোস্তফা কামাল পাশার সহিত মিলিত হন। ভারতবর্ষে তখন যেসব মুসলমান রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন কিংবা ইংরাজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তুর্কী-যুবকরা তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তুরস্ক ও অপরাপর দেশের মুসলমানদের ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করিয়া ও সমালোচনা শুনিয়া মাওলানা আযাদের মনে অত্যাচারী বিদেশী

বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ হইতে আন্দোলন চালাইবার দৃঢ় মানসিকতা গঠিত হয়। ভারতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হন। ১৯১২ সালের জুন মাসে তিনি কলিকাতা হইতে "আল্ হিলাল" নামক একটি সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় এবং ভারতের বাহিরের মুসলমানদের নিকট যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। আল হিলালে'র বলিষ্ঠ ভাষা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তার স্বকীয়তা ও মতের দৃঢ়তা সমস্ত ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী চিন্তার প্রাণ সঞ্চার করে, আলোড়িত করে সকল মুসলমানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে। বৃটিশ সরকার বিপদের সংকেত বুঝিয়া প্রথমে দুই হাজার তাহার পর কয়েক মাসের মধ্যে পত্রিকাটির দশ হাজার টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তুর্কী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধ জোটে যোগদান করে আর ১৯১৫ সালে সরকার "আল হিলাল" প্রেস বাজেয়াপ্ত করে। প্রেস ও পত্রিকার বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার কর্তৃক এইরূপ শাস্তি বিধান ইহাই প্রথম এবং তাহাও একটি মুসলিম সম্পাদক সম্পাদিত ও কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত পত্রিকার বিরুদ্ধে। কয়েক মাসের মধ্যেই মওলানা সাহেব "আল বালাগ" প্রেস প্রতিষ্ঠা ক'রে "আল বালাগ" পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জিন্নাহ্'র লীগে যোগদান

ইতিমধ্যে ডাঃ আনসারী, মওলানা জাফর আলী ও বহু হজ্জযাত্রী তুরস্ক, ইরাক ও মক্কা হইতে ফিরিয়া এবং ঐ সকল স্থানের মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করিয়া ও সংগ্রাম দেখিয়া আসিয়া ভারতে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তখন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস রাজনীতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিকটবর্তী হইয়াছে। ১৯১৩ সালে গোড়া মুসলমান কংগ্রেস নেতা মিঃ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে মুসলিম লীগে

যোগদান করিয়া মুসলিম সাংগঠনিক আইনসমূহকে জাতীয়তাবাদী করিয়া তুলিবার জন্য ও ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্যগণ অনুরোধ করেন। লীগের সহিত তাঁহার মতের মিল না হইলে তিনি লীগ সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিবেন এই শর্তে মি. জিন্নাহ্ লীগে যোগদান করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"এই বৎসরই মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয় ও গণতন্ত্র সংশোধিত হয়। সংশোধনী শর্তগুলির মধ্যে ছিল ভারতীয়গণের চিত্তে জাতীয় ঐক্যবোধ ও জনসেবার বৃত্তি জাগরিত করা ও বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এমন এক স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যাহা ভারতীয় অবস্থার অনুকূল হয় এবং এই ব্যাপারে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা অর্জন করা যায়। এই ভাবেই মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভবিষ্যতের কার্যসূচীও একই সাথে রচিত হইতে লাগিল।" (খণ্ডিত ভারত)

লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার ইব্রাহীম রহমতউল্লাহ্। এই অধিবেশনেই লীগ সদস্যগণের চিন্তা ও ভাষণ সেই সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সর্বোৎকৃষ্ট উচ্চতম পর্যায়ের বলিয়া সকল ঐতিহাসিক ও ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মনে করেন। এই অধিবেশনে সিমলায় মুসলিম প্রতিনিধি-দলের নেতা নবাব ভিখার-উল-মুল্‌ক এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় নির্ভীকভাবে ঘোষণা করেন, "বর্তমানে দেশের যুবকদিগের এইরূপ চিন্তা করা উচিত যে, দেশের জনগণ দ্বারা সম্মানিত হওয়াই প্রকৃত সম্মান, বিদেশী সরকার যে-কোন সম্মান দান করে তাহা দেশের স্বার্থ-বিরোধিতার পুরস্কার স্বরূপ।" এই নির্ভীক ও চিত্ত আন্দোলনকারী সরকার-বিরোধী বক্তৃতা ইতিপূর্বে কোন মহল হইতেই শোনা যায় নাই। ইহাতে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান যুবকদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের যুবকরা বৃটিশ সরকারের কৃপাপ্রার্থী হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে থাকে।

১৯১৩ সাল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সারা ভারতের মুসলিম লীগ নেতৃবর্গ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যে দূরদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, কোন দিনই কোন চক্রীর চক্রান্ত তাহা পূর্ণ করিতে পারিবে না, বিকৃত করিতে সাহসী হইবে না। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং মুসলিমলীগের মতবাদ পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া বৃটিশ বন্ধুভাবাপন্ন তদানীন্তন মুসলিম লীগ সভাপতি মহামান্য আগা খান মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন এবং এই সংগঠনকে যে অর্থ সাহায্য করিতেন তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। লর্ড ব্রাইকা মুসলিম লীগের এইরূপ বিপ্লবী কর্মসূচী লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "ধর্ম ও সম্প্রদায় ভিত্তিক ভেদনীতি যেদিন ভারতবাসীদিগের মধ্যে অকৃতকার্য হইবে সেইদিন বৃটিশ শক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী। লর্ড ব্রাইশের এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কার্যকরী করিতে অক্ষম হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই। কতকটা দানস্বরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্যান ইসলামিক চিন্তাধারা ও বৃটিশ

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ বিশেষভাবে স্মরণীয়। তখন ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় আর ভারতবর্ষে সেই সময় হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কে কতখানি নিজ নিজ সংগঠনকে জাতীয়তাবাদী করিয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে ঘটনার মধ্য দিয়া মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখনকার মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষা বেশ কিছুটা প্রচলিত হইয়াছে, মুসলিম নেতৃবর্গ ও যুবক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, ইংরেজ কেবলমাত্র বিধর্মী বলিয়া তাহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে সে যুক্তি ব্যতীত দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য যে পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ আবশ্যক তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

তখনও তুরস্কের সম্রাটকে ভারতীয় মুসলমানরা শুক্রবারে জুম্মার নামাজের খোত্‌বার বক্তৃতায় খলিফা রূপে উল্লেখ করিতেন। সেই জন্য তুর্কী ও তুর্কী সম্রাট সকল মুসলমানের নিকট শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ছিলেন। সেই তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের হীন ব্যবহার ও অস্ত্রধারণ স্বভাবতই মুসলমানদের প্রাণে ক্ষোভের সঞ্চার করে, সে জন্যেই তুর্কীবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাজনৈতিক বিপর্যয়ে সমবেদনা জানান কিংবা প্রয়োজনে সাহায্যদান ব্যাপারকে যাহারা প্যান ইসলামিক চক্রান্ত বলিয়া মনে করেন ও বর্ণনা করেন তাহাদের সহিত একমত হইবার কোন যুক্তি তাহারা দেখিতে পান না। এশিয়ার বিভিন্ন অংশে

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের রাষ্ট্রও পৃথক তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা, চরিত্র, ভৌগোলিক অবস্থান ও স্বার্থ ভারতবাসী হইতে পৃথক। কিন্তু তাহাদের ধর্মের পীঠস্থান ভারতবর্ষ। সেই কারণে ভারতের প্রতি যদি কোন দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কোন প্রকার দুর্বলতা থাকে এবং সেইরূপ দুর্বলতা হেতু ভারতের বিপদে-আপদে সহানুভূতিশীল হয় তাহা হইলে কোন প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপার কিংবা যুদ্ধ জোট বাঁধিবার প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকে না। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের তুর্কীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন আসলে প্যান ইসলামিক চক্রান্ত নহে, নিছক সমধর্মীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি সমবেদনা। ইহা ব্যতীত খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধর্মীয় কারণও ছিল। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিবিদরা নানা প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং মুসলমানদের হিন্দুদের নিকট ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার কেবল চেষ্টা চালাইতেছিল তাহা নহে; বরং ভারতীয় হিন্দু মনে মুসলমানদের প্যান ইসলামিক ধারণার ভবিষ্যৎ ভীতি সঞ্চার করিবার জন্য এইরূপ প্রচার কার্য চালনা করিতেছিল। এই অবস্থাটি আরও সরলভাবে বুঝিতে পারা যায়, যখন কামাল আতাতুর্ক খিলাফত অস্বীকার করেন। তখন হইতে ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কীর সহিত বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। তাহাদের সহিত তাহারা রাজনৈতিক সম্পর্কও ত্যাগ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় এক শ্রেণীর ভারতীয় লেখক ঐতিহাসিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অজ্ঞতা গোঁড়ামী কিংবা ইচ্ছাপূর্বক উক্ত প্রকার সাহায্যদান ব্যবস্থাকে প্যান ইসলামিক চিন্তাধারার বাহক ও ধারক এবং বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় মুসলমাদের আনুগত্য প্রকাশ বলিয়া অপপ্রচার করিতে থাকেন। তাহার ফলে সাধারণ হিন্দু মনে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই প্রকার চিন্তা ও প্রচার ইংরেজ আমলে বৃটিশ কর্তৃক ভেদনীতি প্রবর্তন ও প্রসারণের জন্য প্রয়োজন ছিল; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এইরূপ চিন্তা ও প্রচার কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও সমকালীন মানস

বর্তমান যুগে যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করা অসম্ভব নহে এবং সেই আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। এমনকি বিচ্ছিন্ন স্থানে সমস্যাগুলিকে এক সঙ্গে দেখিবার ব্যবস্থা সহজতর হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমাজে শিক্ষার পরিব্যাপ্তি এই সকল বিষয়ে বর্তমান যুগে যে সব সুযোগ-সুবিধা দান করিতেছে, যে ভাবে সে সময়ের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে সেই সময়ে এই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কারণ প্রচারযন্ত্র তখনও এত উন্নত মানের হয় নাই। সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা প্রকাশের সহজতর ব্যবস্থা ছিল না, মত বিনিময়ের সুযোগ সুবিধা ছিল না। তাহার পর যখন হইতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, রেলচালু, সংবাদ-পত্র-প্রকাশ এবং সকল প্রকার যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হয়, তখন হইতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। তাহার পূর্বে যে সকল আন্দোলন ও বিদ্রোহ ইত্যাদি হইয়াছিল তাহা জাতীয় যুদ্ধের অংশ বিশেষ নহে বলিলে ভুল হইবে। জেহাদী আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক-বিদ্রোহ ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য একই ছিল। তাহা দেশকে বৃটিশের শাসন ও শোষণ হইতে মুক্ত করা। মুক্তির পর কাহার হস্তে রাজ্য শাসন ন্যস্ত হইবে তাহা তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল না। কারণ তাহারা জানিত দেশের মুক্তি সাধিত হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃত্ব পাইবেন।

অবশ্য বর্তমান যুগে রাষ্ট্র, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা তাহারা বুঝিত না এবং সে যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই সকল মতবাদ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। জাতীয়তাবোধ কিংবা জাতীয়তাবাদের অর্থ কেবলমাত্র বৃটিশ বিতাড়ন কিংবা দেশের মুক্তি সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে।

তাহা রাষ্ট্রের নাগরিকদের চিন্তা ও কার্যে নানা বিবর্তনের মধ্যে সাধিত হয় এবং নানা ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সফলতা লাভ করে। এই সকল বিবেচনা করিলে জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতীয়তাবোধ এবং সংঘ শক্তি ও নাগরিকগণের একমুখী চিন্তাধারাকে জাতীয় সংহতির সোপান স্বরূপ বলা যেতে পারে। আর জাতীয়বোধ বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে সকল মানুষের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকরী করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা বলিয়াই বিবেচিত হয়। এইরূপ চিন্তা তখনকার দিনে ভারতবর্ষের অধিবাসী-দের মধ্যে ছিল এবং ঐ সকল বিদ্রোহ বিপ্লবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। সেই জন্যই সব আন্দোলন ও বিদ্রোহকে জাতীয় যুদ্ধের অংশ বলিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথাও এক নায়কত্বের বিরুদ্ধে কোথাও বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কোথাও বা ধর্ম যাজকদের বিরুদ্ধে এইভাবেই আন্দোলন দানা বাঁধিয়াছে।

যখন মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করিয়াছিল তখন ভারতে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল আর নাগরিকরা পৃথক পৃথক রাজা কিংবা সামন্তের অনুগত ছিল। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র কিংবা নাগরিক অধিকার বলিয়া কিছুই ছিল না। দেশ অপেক্ষা রাজার প্রতি তাহারা ছিল অধিকতর অনুগত। তাহার ফলে রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের পতন ঘটিত। রাজ্যের অধিবাসীরা বিজয়ীকে সম্বর্ধনা জানাইত। ন্যায়-নীতির কথা চিন্তা না করিয়া বিজয়ীকে নানা উপঢৌকন দিত। দীর্ঘ সাতশত বৎসর মোগল এবং পাঠান রাজত্ব কালেও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল বলা যায় না, সকল বাদশাহ ও নবাব গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন তাহাও নহে, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার এবং জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতেই সাধারণ ভারতবাসী কর্তৃক ইংরাজবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। নানা অসুবিধার মধ্যে মুজাহিদরা আসাম সীমান্ত হইতে বোম্বাই ও

পেশোয়ার পর্যন্ত ধর্মের নামে সংগঠন সৃষ্টি করিয়া বৃটিশবিরোধী যুদ্ধ চালায়, পরে ওহাবীরা মক্কা এবং মদীনার সহিত আলোচনা করিয়া একই উদ্দেশ্যে রাজশক্তির বিরোধিতা করে। সেই যুগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা ধর্মান্ধতার জন্য ও কেবলমাত্র বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সাধারণ ব্যাপার ছিল না। ধর্মান্ধতা অনেক সময় অনেক প্রকার অমানুবিক ও কল্পনাতীত ঘটনা ঘটাইতে পারে, এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ যদি কেবলমাত্র ধর্মান্ধতাপ্রসূত হইত তাহা হইলে ইংরাজদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য কিংবা নিছক বিধর্মী বলিয়া মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করিত; কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই। সেই জন্য এই সকল যুদ্ধকে যাহারা কেবলমাত্র ধর্মযুদ্ধ বলিয়া মনে করেন তাহাদের সহিত একমত হওয়া যায় না। তাহার পর কৃষক ও নীলকুঠি শ্রমিকদের জমিদার ও সাহেব মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইলেও পরবর্তীকালে ইহারা জাতীয় যুদ্ধের মনোবল সৃষ্টি করিয়াছিল ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিবার জন্য প্রেরণা যোগাইতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহেও ধর্মের গন্ধ ছিল; কিন্তু তাহাকে যদি আমরা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বলিতে দ্বিধা না করি, তাহা হইলে অপর কোন সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি সাধন না করিয়া হিন্দু কিংবা মুসলমান পৃথকভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন প্রকার যুদ্ধ কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াকে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বলিতে কুণ্ঠাবোধের কারণ কি থাকিতে পারে? পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে তখনকার দিনে অবাধ প্রচারের সুযোগ ও সঠিক নেতৃত্ব থাকিলে বৃটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা যে বিপর্যস্ত হইত না তাহা বলিতে পারি। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল, ইহা সত্য নহে; কারণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ভারতে শিক্ষা, রাজনীতি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন আরম্ভ হইয়াছিল এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও প্রায় দশ বৎসর সরকারের নিকট হইতে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিতে থাকে। তাহার

পর ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সংগঠন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ পায়; কিন্তু কংগ্রেসই এ ক্ষেত্রে একমাত্র দল ছিল না। অমন আরও অনেক গুপ্ত দল-উপদলও সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ইহা ব্যতীত জাতীয়তাবাদ বলিলে কেবল মাত্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ইংরাজ বিতাড়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টাকেই বুঝায় না। ইহা নাগরিকদের এমন এক বোধ শক্তি বা জাতি ধর্ম নির্বিশেষ চরিত্রের অংশ বিশেষ হইয়া উঠে যাহার দ্বারা দেশের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশের ও সমাজের উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়। সত্য বলিতে কি এইরূপ বোধ বৃটিশ আমলে কেন ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরও সকল ভারতীয়দের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদি ভারতীয়রা জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইতেন তাহা হইলে সরকারী বেসরকারী সংগঠন অফিস আদালত দুর্নীতির প্রশ্রয় পাইত না। যাহারা দেশের কথা চিন্তা করেন, দেশের মানুষের স্বার্থ ও অবস্থা উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন, দেশের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য চিন্তা করেন তাহারা কোনক্রমেই বর্ণ বৈষম্যের কথা চিন্তা করিতে পারিতেন না। ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া দেশের শান্তি বিনষ্ট করিতে পারিতেন না। সকল প্রকার দুর্নীতিপরায়ণতাই জাতীয়তাবাদের দুষমণ। সেই জন্য উল্লেখ করিতে হয় যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব ও বৃটিশ সরকারের হস্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাই কেবল মাত্র জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতীয়তা বোধের মানদণ্ড স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতা

তখন তুর্কীর শাসনকর্তা কামাল আতাতুর্ককে মুসলমানরা খলিফা বলিয়া সম্মান করিত। তুর্কী মিত্রশক্তি তথা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জোটে যোগদান করার ফলে স্বাভাবিক কারণে ভারতের মুসলমানরা

বৃটিশ সরকারের সাহায্য করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এমন কি সাধারণ-ভাবে হিন্দু জনসাধারণ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করিতে দ্বিধা করেন। কিন্তু এই সময় এক শ্রেণীর কংগ্রেসী নেতা সরকারের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা"র লেখক নরহরি কবিরাজ লিখিয়াছেন: "এই সময়ে কংগ্রেসের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতারা যুদ্ধের অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তারা বৃটিশের যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আশা ছিল, এই ভাবে বৃটেনকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিলে ইংরেজ অনুগ্রহে হয়ত ভারত স্বায়ত্ত শাসনের পথে অগ্রসর হতে পারবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের আশা ভঙ্গ হতে বিশেষ দেরী হলো না।"

ইংরেজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও মুসলিমদের স্বাধীনতা ঘোষণা

সেই সময় মুসলমানরা প্রকাশ্যে বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকায় এক শ্রেণীর মুসলিম নেতার সরকারের আলাপ আলোচনার ফলে বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের নিকট এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভারতীয় মুসলমানরা যদি সরকারকে সাহায্য করে তাহা হইলে যুদ্ধ শেষে তুর্কী পরাজিত হইলেও সে ক্ষেত্রে তুর্কীর প্রতি কোন প্রকার ঘৃণিত কিংবা অপমানজনক ব্যবহার করিবে না। কংগ্রেসের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া এবং যুদ্ধ শেষে তুর্কীর অসম্মান না ঘটিলে এবং বৃটিশের সংকটজনক অবস্থায় তাহাকে সাহায্য করিলে যদি ভারতের স্বায়ত্ত শাসন ত্বরান্বিত হয় ইত্যাদি চিন্তা করিয়া ইংরেজদেরকে মুসলমানরা সাহায্য দানে সম্মতি দেয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ইংরেজরা ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদানে যেমন আগ্রহ দেখাইতো না তেমনি তুর্কী সম্পর্কেও ভারতীয়রা মুসলমানকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করিতেছে না। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংরেজরা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম সৈনিকদের বিশেষ-

ভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিল। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে মওলানা আজাদের "আলবালাবা প্রেস" ও সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই সময় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতা মজহারউল হক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বোম্বায়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনের সভা আহূত হয় মুসলিম লীগ সভাপতিরূপে মাজহারউল হক সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "আমরা স্বাধীনতা পাইতে চাই; স্বাধীন দেশের মুক্ত আলোয় চোখ মেলিয়া দেখিতে চাই, মুক্ত বাতাসে চাই প্রাণ ধারণ করিতে।"

স্বাধীনতার বাণী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সংগঠনের পক্ষ হইতে এইবার প্রথম উচ্চারিত হইল। এইরূপ বাণী সমস্ত দেশে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার ফলে বৃটিশ সরকার উম্মাদের মত বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান জন নেতাকে গ্রেপ্তার করিতে থাকে। "ভারতে মুসলিম রাজনীতি"র লেখক বিপয়েন্দ্র মোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "লীগ সভাপতির ভাষণ ও ঘোষণা কংগ্রেস সভাপতির ভাষণ অপেক্ষা বহু গুণে শক্তিশালী ছিল। সেই জন্যই মওলানা মুহম্মদ আলী কৌতুক সহকারে বলেন যে, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যখন একজন বাঙালী মওলানা মজহারউল হক তাঁহার মুসলিম শ্রোতৃবর্গকে বজ্রকঠিন স্বরে স্বাধীনতার বাণী শুনাইতেছিলেন তখন আর একজন বাঙালী লর্ডসিংহ কংগ্রেস সদস্যগণকে রাজভক্তির কথা শুনাইয়া সাবধান করিতে ছিলেন। লীগ সভাপতির দৃপ্ত ভাষণে উত্তেজিত হইয়া সরকারকে সাহায্যকারী একদল মুসলমান হঠাৎ প্রতিবাদ জানায় এবং প্রতিবাদকারী মুসলমানগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।"

ইহাতে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন মুসলিম লীগের সরকারবিরোধী মনোভাব অত্যন্ত দৃঢ়ভিত্তিক ছিল। ইংরাজ শাসক শ্রেণীর পক্ষ হইতে একদল ভাড়াটিয়া গুণ্ডা শ্রেণীর মুসলমান যে মুসলিম লীগের সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আনীত হইয়াছিল তাহাও প্রতীয়মান

হয়। ভারতের মুসলিম রাজনীতি'র লেখক বিণয়েন্দ্রমোহন লিখিয়াছেনঃ "মঞ্চের সম্মুখেই বহু বন্দুকধারী পুলিশ অর্ধডজন অফিসার সহ পুলিশ মিঃ ওয়াকার পাহারা দিতে থাকেন। পুলিশ কমিশনার মিঃ এডওয়ার্ডও সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।"

বরিশালের পর রাজনৈতিক সভার উপর পুলিশের হস্তক্ষেপ ইহাই প্রথম। তখনকার দিনে দুইজন ইংরেজ অফিসারের অধীনে বহুসংখ্যক হিংস্র বন্দুকধারী পুলিশের সম্মুখে মুসলিম লীগ সভাপতির ভাষণ যে কত বড় দুঃসাহসের পরিচয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও পুলিশ কর্তৃক নেতৃবর্গকে শাস্তিদানের হুমকি যে কতখানি ভয়াবহ ও গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা বিরোধী ছিল তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না। সভাপতি বাধ্য হইয়া সভা বন্ধ করেন এবং পরবর্তী প্রস্তাব সমূহ তাজমহল হোটেলে আলোচিত ও গৃহীত হয়।

মুসলিম লীগ সভামঞ্চ হইতে ঘোষিত ভারতের স্বাধীনতার বাণী ভারতের প্রতি গৃহকোণে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 'খণ্ডিত ভারতে' ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "ভারতীয়গণচিত্ত প্রবল উত্তেজনায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই সময়ে স্বাধীন ভারতীয় গণতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় তাহা রচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন মুসলমানগণ। মওলানা হোসেন আহমদ নাদভী ও মৌলভী আজিজ গুল নামক দুইজন বিশ্বস্ত সহকর্মী সহ শেখ উল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান মাদানী সাহেব ধৃত ও মাল্টায় অন্তরীণ হইলেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী মওলানা আজাদ ও হসরত মোহানী প্রমুখ সকলেই মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানকারী তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিবার ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিবার অপরাধে অন্তরীণ হইলেন।"

কংগ্রেস ও লীগের চুক্তি

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য কংগ্রেস ও লীগের এক মিলিত কমিটি নিযুক্ত হয় এবং কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার ফলে কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মানিয়া লয়। বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মুসলিম জনসংখ্যা বিবেচনা করিয়া নির্বাচিত মুসলিম সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। পাঞ্জাব প্রদেশে শতকরা পঞ্চাশ জন মুসলমান, উত্তর প্রদেশে শতকরা ত্রিশ, বাংলায় চল্লিশ, বিহারে পঁচিশ, মধ্য প্রদেশে পনের মাদ্রাজ পনের ও বোম্বাইয়ে শতকরা তেত্রিশ জন নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সদস্য সংখ্যার ⅓ অংশ মুসলমান হবে বলে ধার্য করা হয়। ইহাও সাব্যস্ত হয় যে প্রদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় যে কোন পরিষদের কোন বেসরকারী সদস্য যদি উভয় সম্প্রদায়ের যে কোন একটির স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিল আনয়ন করেন এবং উক্ত পরিষদের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ⅔ সংখ্যক সদস্য যদি উক্ত বিলের অথবা তাহার অন্তর্গত কোন ধারা বিশেষের বিরোধিতা করেন তাহা হইলে সেই বিল পরিত্যক্ত হইবে। ইহা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার একটি বিস্তৃত খসড়া রচিত হয় এবং ভারতকে তাহার পরাধীন অবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া সাম্রাজ্যিক পুনর্গঠনের ও স্বায়ত্ত শাসিত উপনিবেশ সমূহের সম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবী করা হয়। লোকমান্য তিলক প্রভৃতি হিন্দু মহাসভাপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবর্গও এই চুক্তি সমর্থন করেন। জাতীয়তাবাদী বহু মুসলিম নেতা তখন তিন বৎসরের জন্য অন্তরীণ ও কারারুদ্ধ ছিলেন। উপরোক্ত চুক্তি লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে খ্যাত।

যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলিতভাবে একযোগে জাতীয়তাবাদী কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল আর অন্যদিকে

বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ভাগ্য অনুকূলে ছিল। তখন ভারতের এক দল হিন্দু মহাসভার সদস্য বৃটিশ সরকারের উসকানীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করে। এইরূপ দাঙ্গা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং দাঙ্গাকারীগণ সবতোভাবে সকলের নিকট ধিকৃত হয়। কিন্তু তখন হইতেই ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। "ভারতের মুসলমান রাজনীতি" পুস্তকে শ্রীবিণয়েন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, "১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তির জন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ মিলন ১৯১৬ সালের পূর্বে সকলের কল্পনাতীত ছিল।"

রাজনৈতিক মত-পার্থক্য দূরীকরণের চেষ্টা

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে ফাটল সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উৎস সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য দূর করিবার জন্য মুসলমানরাই যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে—এবং তাহাদিগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। ইতিমধ্যেই মুসলমান নেতাগণ শাসকশ্রেণীর হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীত হইয়াছেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় মসলিম লীগ ও কংগ্রেসে বার্ষিক সভা আহূত হয়। মুসলিম লীগের নির্ধারিত সভাপতি ছিলেন মওলানা মুহম্মদ আলী; কিন্তু তিনি অন্তরীণ থাকার জন্য মাহমুদাবাদের রাজা সভাপতিত্ব করেন। ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের স্বার্থকেই সর্বোপরি স্থান দেওয়া উচিত। আমরা প্রথমে মুসলমান না ভারতীয় তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ আমরা ভারতীয় এবং মুসলমান। ইহাদের কোনটি মুখ্য ও কোনটি গৌণ তাহা চিন্তা করা নিরর্থক। মুসলিম লীগ দেশের জন্য মুসলমান-দিগকে যতখানি স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজনীতা অনুভব করিতে বলিয়াছে, ততখানি ধর্ম রক্ষার জন্যও বলিয়াছে।" (মেহেতা পট্টবর্ধন)

মণ্টেগুর ভারত পরিদর্শন

এই বৎসর মিঃ মণ্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসেন এবং আগস্ট মাসে ঘোষিত বৃটিশ নীতি অনুযায়ী বড় লাট চেমস ফোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিবৃতি প্রস্তুত করেন এবং তাহাতে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের জন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাহার ফলে তখনকার রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এইরূপ সংস্কারকে প্রতিক্রিয়া-শীল আখ্যায়িত করিয়া থাকেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯১৪ সালে গান্ধীজী আফ্রিকা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং অর্থ উপার্জন অপেক্ষা রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান অধিকতর, বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন, এবং অনতিবিলম্বে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট অবনতির দিকে যাইতেছিল। ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ছিল। শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা গিয়াছিল। শ্রমিকরা যাহা বেতন পাইত তাহা হইতে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া উঠে। কৃষকরা ব্যবহারোপ-যোগী দ্রব্যের দুর্মূল্যতা হেতু অনেক ক্ষেত্রে খাজনা দিতে অক্ষম হইল। তাহার ফলে কোথাওবা ধর্মঘট কোথাওবা খাজনা বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি চলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের মধ্যে একত্রিত হইয়া আন্দোলন করিবার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা দেখা দেয়। গান্ধীজী এমতাবস্থায় উপলব্ধি করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার যে টলস্টয়ী প্রথায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন সেইরূপ প্রথায় উত্তর পশ্চিম বিহারের চম্পারণে নীল চাষীদের আন্দোলন পরিচালনায় সচেষ্ট হন। গান্ধীজী নীল চাষীদের লইয়া সত্যাগ্রহ

আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহার পর গুজরাটে কৃষক আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আরম্ভ হয় এবং উভয় ক্ষেত্রে সরকার সত্যাগ্রহী-দিগের নিকট নতি স্বীকার করে। এই বিষয়ে "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা" পুস্তকে নরহরি কবিরাজ লিখিয়াছেন :

"গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলন গ্রহণ করে সত্য কিন্তু তাই বলে কংগ্রেসের লক্ষ্য বা বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার সুর পরিবর্তিত হইল না। যুদ্ধ শেষে কংগ্রেসের নেতা বৃটিশরাজকে অভি-নন্দন জানাইলেন যুদ্ধ জয়ের জন্য এবং এই যুদ্ধটিকে তাহারা মুক্তি বা স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই ঘোষণা করিলেন। ইহার পূর্বে মুসলিম লীগ সভাপতি ১৯১৫ সালে লীগের বার্ষিক সভায় "ভারতের স্বাধীনতা চাহি" ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসী নেতৃবর্গের মধ্যে বেশ কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত এই সময়ের মধ্যে ভারতে বেশ কিছু সংখ্যক শিল্প সৃষ্টি হইবার ফলে শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে বিশেষ যোগ দিতেন না বরং বিরোধিতা করিতেন। এবং এই সকল পুঁজিবাদীদের মধ্যে হিন্দু পুঁজিবাদীর সংখ্যাই ছিল বেশীর ভাগ; বাকী ইংরাজ।"

"ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া" পুস্তকে শ্রীনেহেরু লিখিয়াছেন, "সরকারী নীতি অনুযায়ী পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত হইবার ফলে দেশের ঐক্যবোধ ব্যাহত হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল নূতন পুঁজিবাদী ভারতবাসীর জীবনমান নিম্নমুখী ক'রে ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিভ্রান্ত করে। কংগ্রেসে সংগঠনের মধ্যে চরম নরম পন্থীদল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় কোন দল অপর দলকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নাই এবং সেই জন্য যুদ্ধে বৃটিশ সরকার ভারতীয় সাহায্য পায় ও প্রয়োজন বোধে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনও হয়।"

সপ্তম অধ্যায়

খিলাফত আন্দোলন

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ভারতীয় হিন্দু কর্তৃক শুদ্ধি আন্দোলন, গো-রক্ষা আন্দোলন উর্দু ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষার প্রচলন, জাতীয়তাবাদী সংগঠন, কংগ্রেস গঠন হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মহা-মণ্ডল গঠন ও পরে হিন্দু-মহাসভা স্থাপন ছাড়াও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক অভিযান পরিচালনা মুসলমানদের সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী প্রাপ্তিতে বাধা দান, স্থানে স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি কার্য তখন ঘটিতেছিল। এক দিকে এই সব বিরোধিতার মোকাবেলা, অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া মুসলিম লীগ ১৯০৫ সালে গঠিত হইয়াছিল। ইহাতে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা কর্তৃত্ব করা সত্বেও মুসলমান জনসাধারণের চাপে জাতীয় কংগ্রেস অপেক্ষা ইহা অধিকতর জনদরদী ও জনস্বার্থ রক্ষাকারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। এমন কি ১৯০৫ সালে সরকার কর্তৃক মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করিবার সিদ্ধান্তেও মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কোন প্রকার পরিবর্তিত হয় না। বরং ১৯১৫ সালে মুসলিম লীগে সভাপতি ঘোষণা করেন, "আমরা স্বাধীনতা পাইতে চাই, স্বাধীন দেশের মুক্ত আলো চোখ মেলিয়া দেখিতে চাই। মুক্ত বাতাসে প্রাণ ধারণ করিতে চাই।"

১৯১৮ সালে ইউরোপীয় রণাঙ্গণে আগ্নেয় অস্ত্রের সংগ্রাম বন্ধ হইলেও রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় তখনও শান্তি ফিরিয়া আসে নাই। নানা প্রকার সমস্যা, বিশেষ করিয়া প্রশাসনিক ব্যাপারে নানা জটিল সমস্যার সমাধান তখনও হয় নাই। যুদ্ধে তুর্কী এবং জার্মানী পরাজিত হয়। তুর্কীর পরাজয়ের ফলে ইউরোপে নানা প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের বহু অংশ ইংরাজরা

ভাগ করিয়া লয় এবং তুর্কীর মর্যাদাহানিকর নানা শর্তযুক্ত সন্ধিপত্রে তুর্কীকে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। সেই কারণে ভারতীয় মুসলমান-দের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট আন্দোলন চলিতে থাকে তাহাই হইবে বর্তমানের আলোচ্য বিষয়। এই আন্দোলনই খিলাফত আন্দোলন নামে অভিহিত হয়।

যুদ্ধ চলা কালে বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের আশ্বাস দিয়া-ছিল যে, যুদ্ধশেষে যদি তুরস্ক পরাজিত হয় তাহা হইলে তুরস্কের প্রতি অবিচার কিংবা অসম্মানজনক ব্যবহার করা হইবে না। তা ছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিম অধ্যুষিত স্থানগুলির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। কিন্তু সে শর্ত উপেক্ষা করিয়া বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত ও পুনর্গঠন করা হয়। এরূপ ব্যবস্থাকে ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় মুসলমান কর্তৃক যুদ্ধ সাহায্য দানের ব্যাপারে কতকগুলি শর্ত ছিল। সেই সব শর্ত যখন রক্ষিত হইল না তখন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাহাই আন্দোলনে রূপ লইয়াছিল। সমস্ত দেশে মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশবিরোধী মনোভাব নূতন করিয়া তীব্রতর আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি চলিতে থাকে মসাজেদে মসজিদে পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা হইতে থাকে। কানপুরে জুম্মা মসজিদে নামাজের পর যখন এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল তখন নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর সরকার গুলি চালায়। তাহার ফলে বহু মুসলমান নিহত হন। ইহাতে সারা দেশে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে। আন্দোলন এত তীব্র হইয়া উঠে যে বৃটিশ সরকার যথেষ্ট শঙ্কিত হয়। "খণ্ডিত ভারত"-এ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "বৃটিশের তুরস্ক-বিরোধী নীতির ফলে এমন কি মি. মন্টেগু পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বড় লাট লর্ড রিডিং তার যোগে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, ইংরাজরা যেন কনস্টান্টিনোপল পরিত্যাগ করে;

পবিত্র স্থান সমূহের উপর খলিফার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত থ্রেস ও স্মার্ণা প্রত্যার্পণ করা হয়।"

জমিয়ত উল উলেমা ই-হিন্দ

এই আন্দোলনে কংগ্রেসও সহযোগিতা করে। মহাত্মা গান্ধীও নেতৃবৃন্দের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান। আন্দোলনের তীব্রতা এমন হইয়াছিল যাহার ফলে অনেক সময় মনে হইত নূতন সৃষ্ট খিলাফত কমিটির পক্ষ-পুটে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিলীন করিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারীর অভিভাষণ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই অভিভাষণে তেজোদীপ্ত ভাষায় সভাপতি ভারতীয় মুসলমানদের সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বায়ত্ত শাসন চালু করিবার ও বৃটিশ বিতাড়নের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই আন্দোলন এক নূতন পথের সন্ধান দেয় আর ভারতীয় মুসলমানরা হয় তাহার পথপ্রদর্শক। ভারতীয় মনোভাব স্বভাবতই উত্তরোত্তর বৃটিশবিরোধী হইতে থাকে। সমগ্র ব্যাপারটির তত্ত্বাবধান ও সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল প্রদেশ এবং শহরে ইহার শাখা স্থাপিত হয়। এই বৎসরই মওলানা মাহমুদুল হাসান শেখ উল হিন্দের নেতৃত্বে "জমিয়ত উল উলেমা-ই-হিন্দ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার জেহাদের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাই জমিয়তের উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য, প্রসারিত করিবার জন্য দেশের সর্বত্র বেসরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে কংগ্রেসও অনুরূপ বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সেই মাদ্রাসা সমূহের মধ্যে দেওবন্দ, দিল্লী কানপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসাগুলি বর্তমানেও চালু রহিয়াছে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও অসহযোগ আন্দোলন

পরবর্তী বৎসরে অমৃতসরে জাতীয়তাবাদী সকল দল কংগ্রেস, লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ একত্রে মিলিত হয় এবং পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা করে। শেখ উল-হিন্দ মওলানা মুহম্মদ হাসান—যিনি জমিয়ত-উল-উলেমার নেতৃত্ব করিতেছিলেন—পূর্বেও বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সরকার কর্তৃক বন্দী ও নির্যাতিত হন। তিনি অবিলম্বে বৃটিশ সরকারের সহিত সর্ব-প্রকারের অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। "ভারতে মুসলিম রাজনীতি"র লেখক বিনয়েন্দ্র মোহন লিখিয়াছেন, "নিশ্চিতভাবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সাল ভারতে নূতনভাবে মুসলিম নব জাগরণের সময়, তাহারাই ১৯২০ সালে কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন করিতে পথ দেখাইয়াছিলেন।"

উল্লেখ থাকে দুই বৎসর পূর্বে খিলাফত আন্দোলনকারীরাই সর্বপ্রথম বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব করে। এই সময় খিলাফত কমিটির পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দলকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয়, সরকারকে খিলাফত সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব প্রকাশ করা এবং যাহাতে কোন প্রকারে খলিফার অমর্যাদা না হয়, তাহা জানানই ছিল এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও ভারতীয় মুসলমানদের মনো-ভাব সমভাবে উপেক্ষা করে। আর তারই ফলে দেশব্যাপী আন্দো-লন তীব্রতর হইতে থাকে। মওলানা মুহম্মদ আলী, শওকত আলী, আজমল খান, মৌলভী আবুল বারী, গান্ধী, মওলানা আজাদ, মওলভী আবুল কাসেম, মুহাম্মদ ইয়াসিন, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ জননেতাগণ আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলন

খিলাফত ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করিয়া সরকার ১৯১৯ সালে "রাওলাট আইন" নামে কতকগুলি দখল মূলক আইন পাশ করে। কংগ্রেস এই আইনের বিরোধিতা করিবে স্থির করে। খিলাফত কমিটি ও জমিয়ত উল উলেমা-ই-হিন্দ এইরূপ আন্দোলনের সহিত সহযোগিতা করে। এই আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব করিবেন স্থির হয় এবং হিন্দু-মুসলমান এক যোগে অংশ গ্রহণ করে ও সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে। পাঞ্জাবের প্রতিবাদ সভার উপর বৃটিশ সেনাবাহিনী বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিয়া বহু হিন্দু-মুসলমান নিহত করিয়া তাহাদিগের বর্বরতার আর একদফা ইতিহাস সৃষ্টি করে ইহাই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড রূপে ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্বে কানপুর মসজিদে মুসলমান নামাজীদের উপর গুলি চালনা করা হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের 'রাওলাট আইন' বিরোধী আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৯২০ সালে ব্যারিস্টার মজহার উল হক প্যাটনায় সাদাকত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃটিশ আদালতের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। "খণ্ডিত ভারতে" ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এমন কি পাঞ্জাব, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়া যায়। ইংরেজ সরকার কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হইবার ফলে যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাহা বহুদিন পরে জনসাধারণের গোচরে আসে। বিশেষ করিয়া লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে গঠিত সরকারী তদন্ত কমিটি যখন এই ব্যাপারে তদন্তরত তখনই জনসাধারণ তাহা অবগত হইবার সুযোগ পায়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি গঠিত হইল। উভয় কমিটির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর দেশব্যাপী ক্রোধ ও ঘৃণা উগ্রতর আকারে

উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। ইহার সহিত খেলাফত সমস্যা সংক্রান্ত উষ্মা মিলিত হইবার ফলে একদিকে কংগ্রেস ও অপর দিকে মুসলিম প্রতিষ্ঠান সমূহ একত্রিত হইয়া যুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল। অহিংস অসহযোগ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া অচিরে মিলিত কর্মপন্থা রচিত হইল। জামিয়ত উল উলেমা এই নীতির সমর্থন ও ২২৫ জন প্রসিদ্ধ ওলেমা স্বাক্ষরিত এক ফতোয়া জারী করিলেন। তাহার ফলে বহু উলেমা ধৃত ও কারাগারে বন্দী হইলেন। উত্তেজনা এরূপ উগ্র হইয়া উঠিল যে বহু সংখ্যক মুসলমান হিজরত করিয়া অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বরণ করিলেন। "১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজী অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় প্রস্তাব করেন। চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায় বিরোধিতা করেন। মওলানা আযাদ, মুহম্মদ আলী, শওকত আলী এই আন্দোলনের সমর্থন জানান এবং এই আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজীর সহিত তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পর্যটন করেন। এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বার্ষিকঅধিবেশন হয়।

হিজরত ও মুহাজিরদের ব্যর্থতা

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে খিলাফত আন্দোলন এত উগ্র হয় যে, বহু সংখ্যক মুসলমান হিজরত করিয়া অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা বরণ করিয়াছিলেন। "যখন বিধর্মী অত্যাচারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র জেহাদ সম্ভবপর নয় কিন্তু শান্তি রক্ষাকল্পে সশস্ত্র জেহাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে তখন দেশত্যাগ করিয়া মুসলমানগণের অন্য মুসলিম রাষ্ট্রে চলিয়া যাওয়াকেই হিজরত বলে।"

ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইংরাজ কবলিত হইবার পর হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা কিরূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পূর্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আলোচ্য সময়ে কংগ্রেসের সহিত এক যোগে ভারতে যে খিলাফত আন্দোলন চলিতে থাকে তাহা অসহযোগ এবং অহিংস আন্দোলন হইলেও ভারতের বৃটিশ শাসন-মুক্ত হওয়া সম্পর্কে মুসলমান জনসাধারণের এক অংশের মনে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দেয় সেই কারণে তাহাদের মধ্যে অনেকেই আফগান রাজ্যে যাইয়া বসবাস করা স্থির করে। যুবকদের মধ্যে অনেকেই তুরস্কে যাইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া দেশত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিয়া অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন, অনেকে রাশিয়ায় ও তুরস্কে যাইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রতি-শোধ লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হন না।

সেদিন ছিল ১৯২০ সালের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীর এক জনসভায় মওলানা আতাউল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট মওলানাগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে ইংরাজের বিরুদ্ধে যখন সশস্ত্র যুদ্ধ সম্ভবপর নহে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে তথা খলিফার বিরুদ্ধে ইংরেজের হীন চক্রান্ত এবং হীন কর্মপন্থার জবাব সম্ভবপর নহে তখন ইংরাজের রাজত্বে বাস করা অপেক্ষা হিজরত করাই সংগত। ইহার পূর্বেই আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ হিজরতকারীদের আফগানিস্তানে বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া হিজরতকারীরা অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। উপরোক্ত উত্তেজনাপূর্ণ সভা হইতে জনৈক ভূপাল নিবাসী রফিক আহমদ এবং তদীয় ভ্রাতা কবির আহমদ দিল্লী হইতে আফগানি-স্তানের পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। এবং কাবুলে তাহাদিগের সঙ্গে আরও একশত আটাত্তর জন হিজরতকারী যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তাহারা সকলে দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বত ও আমুদরিয়া অতিক্রম করিয়া তাসখন্দে পৌঁছান, সেখান হইতে একদল তুরস্কে আনোয়ার পাশার সহিত যোগদান করেন আর একদল তাসখন্দে ১৯২১ সালের প্রথম

দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। কেহ কেহ বলেন ১৯২০ সালের অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাসে এই পার্টি গঠিত হয়। যাহাই হউক না কেন এই সময় মিঃ এম. এন. রায় ও আরও কয়েক জন ভারতীয় এই সকল ভারতীয় মুসলমানদের সহিত তাসখন্দে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্য করেন। সেদিন যে ইংরাজবিরোধী ইচ্ছা ও প্রেরণা মুসলমান যুবকদের ভারতের বাহিরে কেবলমাত্র ধর্ম-প্রীতির জন্য লইয়া গিয়া জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা নহে বরং ইংরাজ-শক্তিকে ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে চরম আঘাত হানিয়া ভারত ত্যাগে বাধ্য করিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। একথাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়া থাকে যে, একদল মুসলমান যুবক তুর্কী আনাতোলীয়া যাইয়া তুর্কী সৈনিকদের নিকট রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে মস্কোতে যে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাতে যাঁহারা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভারতীয় ছাত্র হিসাবে শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন।

ইহার পূর্বে সে সব মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্তানে হিজরত করিয়াছিলেন তাহারা কাবুলে অস্থায়ীভাবে ভারত গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের মধ্যে মুহম্মদ আলী ও জাকেরিয়া ছিলেন অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহাদের একজনকে প্যারিস দখলের পর জার্মান সৈন্যগণ গুলি করিয়া হত্যা করে আর একজন নিখোঁজ থাকেন।

অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেশত্যাগীদের আরবী ভাষায় মুহাজীর বলা হয়। ভারতের এই মুহাজীররা তাসখন্দের 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামক গৃহে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। মুহম্মদ সফীক ছিলেন তাহার প্রথম সম্পাদক। তাহাদিগের ভারত প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহারা যখন পীড়িত অবস্থায় ভারতের মাটিতে ফিরিয়া আসেন তখন বৃটিশ সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনটি ষড়-

ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করে। এই মামলাগুলি মিরাট, পেশোয়ার এবং কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা বলিয়া পরিচিত। মামলাগুলি দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে থাকে এবং প্রত্যেক আসামীকে কম বেশী ছয়/সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। (অংশ বিশেষ কমরেড মুজফ্ফর আহমদের প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন পুস্তক হইতে গৃহীত।)

বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্যে হিন্দুমুসলমানগণের যে ঐক্য দেখা যায় তাহা শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, আর ১৯২১ সালে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করিতে দেখিতে পাই।"

"খণ্ডিত ভারতে" ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রাসাদ লিখিয়াছেন, "১৯২১ সাল এক অতিশয় কর্মব্যস্ততা ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূত-পূর্ব পারস্পরিক সহযোগিতার বৎসর। এই বৎসরই স্বরাজ অর্জন হয় এবং পাঞ্জাবের ও খিলাফতের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতি-বিধানের জন্য সম্মিলিত কর্মপন্থা রচিত হয়। আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ-আন্দোলনের পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বেই সকল সম্প্রদায়ের সহস্র নরনারী কারারুদ্ধ হইলেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী; শওকত আলী, হোসেন আহমদ মাদানী, মওলানা আযাদ চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখ কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবর্গ বৎসরের শেষের দিকে কারাগারে বন্দী হইলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইল। আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধের আন্দোলনের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হইল এই অধিবেশনে।"

সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব

আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বেই "চৌরি চৌরায়" এক ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়; সেইজন্য কার্যসূচী বাতিল করিতে

হয়। গান্ধীজী ও মাওলানা আবাদ ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দোলনও থামিয়া যায়। যখনই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপে নেতৃত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছে তখনই যে-কোন প্রকারে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা গিয়াছে। ইহার জন্য বৃটিশ সরকার নিশ্চয় দায়ী, কিন্তু ভারতবাসীরাও কম দায়ী নহে। এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে আহ্মেদাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা হসরত মোহনী। ইনি আমেদাবাদে মুসলিম লীগ সভাপতির আসন হইতে সর্বপ্রথম ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব করেন। তিনি বলিয়াছিলেন স্বরাজ অর্থে বিদেশী শাসকের সম্পূর্ণ শাসনমুক্ত ভারতের কথা। সে-দিন গান্ধীজী এই প্রস্তাবে কেবল মাত্র বাধা দিয়াছিলেন তাহাই নহে, উপহাসও করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রস্তাবকে সেই দিন গান্ধীজী 'তলহীন সমুদ্রে'র সহিত তুলনা করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস তার ভারতীয় সংগ্রামে লিখিয়াছেন, "হাসরাত মোহানীর এইরূপ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সকল শ্রোতার মনে গভীর আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।"

"ভারতে মুসলিম রাজনীতি"র লেখক বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "এই সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কেবল মাত্র হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহাই নহে, সাধারণ শত্রু বিদেশী শাসক ইংরাজদের হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যই সংঘবদ্ধ যুদ্ধ করিয়াছে। গান্ধীজী ইহার দীর্ঘ নয় বৎসর পর ১৯২৯ সালে হসরত মোহানীর "সীমাহীন অতল দমুদ্র" স্বরূপ স্বাধীন ভারতের কথা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন। এইরূপ বহু-ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলিম লীগ কংগ্রেস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং কংগ্রেসের কর্মসূচীকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রগামী হইয়াছে। একথা বোঝা উচিত যে মুসলমানগণ যখন কোন সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন হিন্দুদিগের অপেক্ষা সেখানে অধিকতর শক্তির স্বাক্ষর রাখে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল

ব্যক্তির অভাব ছিল না। পূর্বেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে মুসলিম লীগ কর্তৃক স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরে লীগের স্থায়ী সভাপতি মহামান্য আগা খাঁ পদত্যাগ করেন।”

কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের চাপে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী বা স্বরাজ আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। আন্দোলনের ধারা কিছু কিছু ব্যাহত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের জন্য নতুনভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। এই বৎসরে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খাঁ।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

খিলাফত আন্দোলন চলাকালে দেখা যাইতেছে যে সর্বশ্রেণীর মুসলমান প্রতিটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে এবং সর্বভারতীয় দলরূপে কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিম লীগ, জমিয়ত-উল-উলেমা হিন্দ ও খিলাফত কমিটি একযোগে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতেছেন। বলা বাহুল্য কংগ্রেসের মধ্যেও নেতৃস্থানীয় মুসলিম সদস্য কম ছিলেন না। তাহারা সকলেই দলে দলে সরকারের শাস্তি গ্রহণ করিতেছিলেন। বাংলা প্রদেশেও তখন মৌলভী ফজলুল হক, জনাব আবুল কাসেম, জনাব মুহাম্মদ ইয়াসিন, মৌঃ মজিবর রহমান, ব্যারিস্টার রসুল, মওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। যখন এইরূপ অবস্থা চলিতেছিল এবং সমস্ত দেশে আন্দোলনের অগ্নিশিখা ব্যাপ্তি লাভ করিতেছিল তখন হঠাৎ দুইটি ঘটনা ঘটিয়া যায়। প্রথমটি ভারতে দমনমূলক আইনের সাহায্যে নেতৃবর্গকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা, অন্যটি ভারতের বাহিরে তুরস্কে, তুর্কী সম্রাট কর্তৃক খিলাফত পদত্যাগ। ফলে আন্দোলন কয়েক দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। আর বৃটিশ শাসক শ্রেণীর সাহায্যে পুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভারতের মিলিত শক্তির উৎস কেন্দ্রে

আঘাত হানিবার জন্যমাথা তুলিয়া উঠে। ১৯০৬ সালে হিন্দু মহা সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও মুসলিম লীগ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়; কিন্তু হিন্দু মহা সভাকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ক্ষেত্রে সংগঠন রূপে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে দেখা যায় না বরং গো কোরবানী সম্বন্ধে নানা প্রকার চাঞ্চল্যকর ও শান্তি বিনষ্টকারী সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটাইতে ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই সময় মালাকর জেলায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। অভিযোগে প্রকাশ পায় যে হিন্দুরা মনে করে মুসলমানরা বলপূর্বক হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করিতেছিল আর মুসলমানরা বলে যে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় হিন্দুরা সরকারের সহিত মিলিত হইয়া আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করে। যখন এইরূপ দাঙ্গা চলিতে থাকে তখন মওলানা মুহম্মদ আলী মালাবার যাওয়া স্থির করেন কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। "খণ্ডিত ভারতে" ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "১৯২১ সালে সম্পর্ক যখন মধুরতম, ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে মুসলমানগণ বহুস্থানে স্বেচ্ছায় গো কোরবানী বন্ধ করিয়াছেন এবং খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে হিন্দু মুসলমান ঐক্য যখন প্রতিষ্ঠিত প্রায়, ঠিক সেই সময়ে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহা আপাত প্রতীয়মান ঐকতান মঞ্চে অনৈক্যের একটা সূক্ষ্ম সুর ধ্বনিয়া তুলিল।"

মালাবার দাঙ্গা ব্যতীত এক সময় জাতীয়তাবাদী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, যিনি অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং মুসলমানদের অনুরোধে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে অভিভাষণ দেন, "তিনি তখন মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি শুদ্ধি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।" (খণ্ডিত ভারত)

জাতীয়তাবাদী একজন নেতার পক্ষে শুদ্ধি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে দেখিয়া মুসলমানরা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের

কার্যের তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বহু নেতা-কেই এইরূপ ভূমিকায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত দেখিয়া মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "হিন্দুরাও যদি অপর ধর্মের লোককে তাহাদের স্বধর্মে আনয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহাতে অহিন্দু-দের আপত্তি করিবার কিছুই কারণ থাকিতে পারে না।" এই অবস্থায় একদল মুসলমান "তবলীগ ও তানজিল" আন্দোলন আরম্ভ করেন। যদিও এই সমিতির লক্ষ্য ছিল ইসলাম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ দূর করা ও ইসলামের নীতি সমূহের সত্য ব্যাখ্যা করা এবং এই আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করা কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা মনে করেন যে ইহাতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। সেইজন্য উক্ত সমিতির কর্ম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ হয় না বা কেহ এইরূপ আন্দোলন বন্ধ করিবার পক্ষেও কোন কথা বলেন না।

১৯২২ সালের শেষের দিকে মুলতানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ইহাতে জাতীয়তাবাদী দল সমূহ বিব্রত বোধ করিতে থাকে, কিন্তু নেতৃবর্গ তখন কারাগারে। সরকার ভিতরে ভিতরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানী দেওয়ার ফলে হাঙ্গামা দীর্ঘ দিন চলে। ইহার পূর্বে ১৯২৭ সালে বিহারের সাহাবাদ অঞ্চলে এবং ১৯১৮ সালে যুক্ত প্রদেশের কাটারপুর অঞ্চলে দাঙ্গা হয়। সকল স্থানেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং এই সকল দাঙ্গার পিছনে হিন্দু মহাভারত কর্মতৎপরতা ছিল যেমন, তেমনি ছিল বৃটিশ সরকারের ভেদনীতির কার্যকরী শক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দু মুসলিম মিলনের চেষ্টা ও ব্যর্থতা

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, খিলাফত কমিটি, জমিয়াত-উল-উলেমা-ই হিন্দ যখন একযোগে পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিল, তখন সরকার পক্ষ হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করা হয় যে, মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতেছে তাহা ভবিষ্যতে হিন্দু স্বার্থের পরিপন্থী এমন কি হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত হানিতে পারে। একথাও প্রচার করিতে দ্বিধাবোধ করে না যে, রাজনৈতিক দলসমূহে মুসলমান নেতৃবর্গের আধিপত্য ও মুসলিম লীগ কর্তৃক সর্বপ্রথম স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ এবং স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন অতীতের যেহাদী আন্দোলনের মতই সাম্প্রদায়িক। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে রচিত লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট যে হিন্দু স্বার্থবিরোধী তাহাও হিন্দু মহাসভা সংগঠনের মধ্য দিয়া প্রচার চলিতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের বিপরীত প্রচার কার্য চালান হয়। "চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য এবং মুসলমানদের জন্য কর্ম সংস্থানের অভাব।" ইহাই ছিল প্রচারের প্রধান বিষয়। গান্ধীজী প্রমুখ হিন্দু নেতৃবর্গের প্রভাব মুসলিম রাজনৈতিক দলের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে তাহার ফলে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। শুদ্ধি আন্দোলন ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদিগের ইহার প্রতি সমর্থন এবং উর্দু ভাষার পরিবর্তে উত্তর প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের চেষ্টা, গো-কোরবানী বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় হইয়াও মুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্য চলিতে থাকে। এইসব কার্যের হাতিয়ার স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্য হইতে দালাল শ্রেণীর কিছু লোক বাছিয়া লওয়া হয়। তাহা ব্যতীত দেশীয় করদ

রাজন্যবর্গ, চাকুরীজীবী হিন্দু-মুসলমান এবং জমিদার শ্রেণীকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়। তাহার ফলে সমস্ত দেশব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে থাকে। যদি সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বিগত ত্রিশ বৎসরের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ইতিহাস পাঠ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংকটতম মুহূর্তে আবির্ভূত হইবার কৌশল তাহাদের যেন আয়ত্ত। বৃটিশ হস্ত হইতে ভারতীয় হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবী যখনই জোরাল ও জরুরী আকারে দেখা দিয়াছে এবং ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ ও কর্মপন্থায় ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তখনই তাহাদের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হইবার ফলে হোমরুল আন্দোলন বলশালী হইয়া উঠে। ঠিক ইহারই অব্যবহিত পরে ১৯১৭ সালের শেষের দিকে সাহাবাদ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। পরবর্তী বৎসর ১৯১৮ সালেও যুক্ত প্রদেশের কাঠারপুর এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯২২ সালের ভিতর খিলাফত আন্দোলন ও পাঞ্জাবে অত্যাচারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় কয়েক বৎসর পর্যন্ত তা ব্যাপ্ত থাকে।" (খণ্ডিত ভারত)

চিত্তরঞ্জনের প্যাক্ট

নেতৃবর্গ জেলে আটক থাকিবার ফলে দেশের নানা স্থানে ইতস্ততঃ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের জন্য ১৯২৩ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠান সম্ভব নয় না। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু দাস যদিও কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন কিন্তু কারারুদ্ধ থাকিবার জন্য মাওলানা মুহম্মদ আলী কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দাসের চরিত্র, রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী ও নিরপেক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে মতবাদ একজন যোগ্যতম আদর্শ নেতার উপযুক্ত ছিল। তিনি কেবলমাত্র মুখে সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যের প্রয়োজন, এই কথা বলিয়া কিংবা সভা-সমিতিতে ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, যাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজনীতি এবং জীবন-ধারায় উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষিত হয় ও জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পায় সেইজন্য তিনি সকল সময় চেষ্টা করিতেন। তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে একটি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করেন। ইহার উদ্দেশ্যই ছিল ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মিলন সাধন করা এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের সুষ্ঠু সমাধান করা। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কোকনদে অনুষ্ঠিত পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে সেই খসড়া কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হইবে। দুঃখের বিষয় কংগ্রেস এই খসড়া অনুমোদন করে নাই। চিত্তরঞ্জন দাস খসড়ার অংশ বিশেষ কলিকাতা করপোরেশনের চাকুরী সংস্থান ব্যাপারে কার্যকরী করেন। তাহাতে অভূতপূর্ব সাফল্য পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলা প্রদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টের নমুনা আশাতীত ফল লাভ করে। সুখের বিষয় তখন পর্যন্ত বাংলা প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেয় নাই। কিন্তু অচিরেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা অতি মাত্রায় হইতে থাকে, সংস্কারাচ্ছন্নতা ও ধর্মান্ধতার সুযোগ সরকার ও সরকার পক্ষীয় দালালশ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হইয়া উঠে; এমন কি জাতীয়তাবাদী দলভুক্ত ব্যক্তিগণের এক অংশকে তাহারা চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য বৃটিশ রাজশক্তিকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যে প্রয়োজন ছিল তাতে কোন মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উভয়

সম্প্রদায়ের সদস্যদের জীবিকা অর্জনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন থাকিবারও কোন হেতু নেই। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো যুদ্ধে প্রথম দিকে সাহায্য করিতে দ্বিধা করিলেও যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয় যুদ্ধে যোগদান করে, এমনকি যে মুসলমানরা খলিফার প্রতি অসম্মান দেখাইবার জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল তাহারাও কেবলমাত্র সৈনিকরূপে বহু রণাঙ্গনে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, এমনকি তুর্কীর বিরুদ্ধেও তাহাদের অস্তরীণে বাধ্য করা হইয়াছে। ভারতীয় পুলিশরাও কেবলমাত্র জীবিকার অবলম্বন চাকুরীর খাতিরেই ভারতীয় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের অত্যাচার এবং আন্দোলন ধ্বংস করিতে সচেষ্ট ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা তখন যথেষ্ট অবনতির দিকে। সরকারী কেন, যে কোন প্রকারের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা অতি আবশ্যকীয় ছিল, কিন্তু সেসম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্যতীত সহৃদয়তার সহিত স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং সেজন্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজনকে আর কেহ এত বেশী উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই তিনি কলিকাতা করপোরেশনে মুসলমানদের চাকুরীর হার বৃদ্ধি করেন আর তাহারই সাথে সাথে বাংলার মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদান করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দাপটে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সমস্ত স্বপ্ন চুরমার হইয়া যায়। সহানুভূতির পরিবর্তে মুসলমানরা আখ্যা পায় সম্প্রদায়িকরূপে আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ হইয়া উঠে জাতীয়তাবাদী। ইহাই বাস্তব।

চিত্তরঞ্জনের সংগে অন্যান্য হিন্দু নেতার মতবিরোধ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গয়ায় অনুষ্ঠিত পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তখন কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। শ্রীযুক্ত

দাস, মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ ব্যক্তি স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন এবং তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার চাহেন। এই সময় মওলানা আজাদ কারামুক্ত হন এবং কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙালীর নেতৃত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সংখ্যক অবাঙালী নেতৃবর্গ প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও বাঙালীর চিন্তাধারার মধ্যেও যে বিশেষত্ব আছে এবং তাহা পূর্ণ নেতৃত্ব করিবার উপযোগী সে সম্বন্ধে যেন কিছুটা ঈর্ষা কিংবা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। বাঙালী নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যে ব্যক্তিত্ব ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন তাহা হইতে গান্ধীজী ও তাঁহার অনুগামীদের মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা দেয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে ১৯২০ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, অবশ্য পরে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহা হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্বাধীনতা কখনই হঠাৎ খসিতে পারে না। তাহার জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং একটি নির্ধারিত কর্মসূচী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করিতে হইবে। এইরূপ কর্মপন্থার প্রথম স্তর হইতেছে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে অধিকার লাভ। ইহা ভারতীয়দের বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণে শিক্ষা দান করিতে পারিবে। যদিও কংগ্রেস তাহার জীবিতকালে এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মতি দেয় নাই কিন্তু দেখা যায় দশ বৎসর পর অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর ১৯৩৫ সালে এই মত মানিয়া লয়। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স সম্পর্কেও তাঁহার সহিত মতপার্থক্য দেখা দেয়। বাংলা প্রদেশে যেভাবে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাও সর্বভারতীয় জাতীয় নেতাদের মনঃপূত হয় নাই বরং তাহারা এইরূপ সমাধান ব্যবস্থাকে মুসলিম তোষণ ও হিন্দু স্বার্থরক্ষার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন।

মতিলাল নেহেরুর প্রস্তাব

১৯২৪ সালে বোম্বাইয়ে যে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন আহূত হয়, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ রাজা আলী, ডঃ বেসান্ত,

মতিলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল এবং আরও অনেকে। আর একবার মুসলিম লীগ সভামঞ্চে বিদ্যুৎবহ্নি দেখা দেয়। ঐ সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য পার্টির নেতারূপে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। উল্লেখ থাকে কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার লইয়া কংগ্রেস সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত কংগ্রেসের মতবিরোধ হইলে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। মতিলাল নেহরু জাতীয় পরিষদে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এইরূপ সরকার গঠন করিবার পূর্বে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার প্রথমে এইরূপ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং প্রকাশ করে যে, ভারতীয়গণকে কোন প্রকারেই জাতি বলা যায় না, সেই কারণেই দেশের শাসন ব্যবস্থা তাহার জনগণের হস্তে অর্পণ করিবার প্রশ্ন উঠে না।

১৯২৪ সালের লীগ অধিবেশনে এইরূপ মন্তব্যের বিরোধিতা করিয়া মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ নিতান্ত তীব্র, স্পষ্ট ও জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, "বৃটিশ সরকার ভারতীয়গণকে তাহাদের সুবিধামত ও প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবহার করিতে পারে না, সে অধিকার সরকারের নাই। যদি ভারতীয়গণ একটি জাতি না হইবে তাহা হইলে লীগ অফ নেশনসে কিভাবে তাহারা জাতিরূপে সদস্য পদ পাইল। বৃটিশ সরকারের খেয়াল-খুশীমত ভারতীয়দের এইরূপ জাতিত্বের সংজ্ঞাদান অন্যায়।" একদিকে মিঃ জিন্নাহ্‌র ভাষণে জাতিরূপে ভারতীয়দের পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে অবস্থান সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ, পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে লীগ অফ নেশনসে ও সকল আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ ও কর্তব্য পালনে যুক্ত থাকিবার ব্যবস্থা অন্যদিকে মতিলাল নেহরু কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভারতে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার স্থাপন করিবার জন্য সরকার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে

গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের আবেদন, ভারতীয় কর্তৃক স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপনের প্রস্তুতি হিসাবে শাসক শ্রেণীর মনে আশংকা বৃদ্ধি করে। মুসলিম লীগ কর্তৃক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার যে দাবী কয়েক বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল তাহা যেন বাস্তবে রূপায়িত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া সরকার মনে করে। কিন্তু এই সময়ে গান্ধীজী কর্তৃক হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যায় ও পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া সুলভ হতাশার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতি বাংলার কংগ্রেস কর্মীদিগের এক বিরাট অংশের যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদনে ব্যর্থ ও বিফল হইবার ফলে জাতীয়তাবাদী মহলে নানা তর্ক ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে ও বেশ কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি চলিতে থাকে।

নবম অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেষ্টা ও ব্যর্থতা

ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মতবাদ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও দাঙ্গা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কলংকময় অধ্যায়। ইহা প্রকৃতপক্ষে ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কিংবা ধর্মের নামে কতকগুলি কুসংস্কার ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে সংঘটিত হয় কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথা এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে অনেকখানি দায়ী। সেই জন্যই ভিন্নধর্মী মুসলমানদের সহিত মনোমালিন্য অস্বাভাবিক নহে। এই বিশ্বাস অনেকাংশে সত্য হইতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে হিন্দু এবং মুসলিম জনসাধারণ কখনই ধর্মীয় মতপার্থক্যের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যে সংঘর্ষ তাহার মূল কারণ বাস্তব জীবনের স্বার্থবুদ্ধির শক্তিমত্তা।

ভারতের মত রাষ্ট্রে ধর্মমতভিত্তিক সম্প্রদায়কে যেমন অস্বীকার করা চলে না তেমনি তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ও উন্নয়নের অংশরূপে গ্রহণ করিলে এইরূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত না। এই দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ দায়ী। কারণ ভারতের জনগণ সকল সময় নেতৃত্বের উপর আস্থাশীল। উভয় সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া এইরূপ সংকটের মীমাংসা করিবার চেষ্টা যে করেন নাই তাহাও নহে এবং এইরূপ সমস্যার সমাধানের জন্য জাতীয়তাবাদী দল সমূহ যে একেবারে উদাসীন ছিল তাহাও নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছে এবং সেই দাঙ্গা ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হইলেও বস্তুতঃ কতকগুলি কুসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে। ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে

এবং ভারতের সংঘশক্তির উপর নিদারুণ আঘাত হানে ও উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের ধনিক শ্রেণী, বৃহৎ ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পপতি কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বৃটিশ রাজশক্তিও ইহার ফলে ভারতে দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিবার সুযোগ পায়। অভিমান ও জিদের বশবর্তী হইয়া নেতারা সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত থাকাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন। গান্ধীজী এইরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিবার জন্য কয়েকবার অনশন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিকট দ্বিতীয় কোন পন্থা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু অপর কোন নেতাকে সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। সাধারণভাবে কেহ কেহ সংবাদপত্র মারফত দাঙ্গার বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া-ছেন। কিন্তু দাঙ্গার আসল কারণ ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া দাঙ্গাকারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার চেষ্টা হয় নাই।

এই সকল ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে আর তাহার জন্য সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে মতবাদ কিংবা জনমত সৃষ্টি করিতে নেতৃবর্গ দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন কিংবা ভয় পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নতুবা যাহাদের রাজনীতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই, যাহারা দীর্ঘদিন পরাধীনতার শৃংখলে শৃংখলিত; স্বাধীনতা যাহাদের নিকট স্বপ্ন স্বরূপ এইরূপ কোটি কোটি দিনমজুর, কৃষকগণকে বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নেতারা প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইহা ভাবিতে দ্বিধা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর যাহারা সম্মুখে অহিংসবাদী নিরস্ত্র জনতাকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে ও আত্মদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া সরকারকে বিধ্বস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, বৃটিশ-

বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করিতে ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে উন্মাদ করিয়াছিলেন, যাহাদের প্রেরণায় দেশের ডাকে যে যুবশক্তি হাসি মুখে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যদি ভারতের নেতৃবর্গ দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য, সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার জন্য ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ বুঝাইয়া দিতেন, সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে যদি মানবদরদী করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে যে তাহারা উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু সংখ্যক উদারপন্থী নেতা ও শান্তিকামী শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মানুষ এই সকল জঘন্য কর্মের প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করিলেও বাহ্যত তাঁহারা নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম হয়ত ব্যক্তিগতভাবে শুভবুদ্ধির পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু পকৃতপক্ষে ইহাতে একদিকে দুষ্কৃতিকারীদের কর্ম অব্যাহত থাকে অন্যদিকে বাধাদানকারী শক্তি প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে অক্ষম হয় ও দুর্বলতা অনুভব করে, ফলে পরোক্ষভাবে দাঙ্গাকারীদের নৈতিক সমর্থন লাভ হয় ও দাঙ্গা চলিতে থাকে। পত্র-পত্রিকাগুলিও ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রচার করিয়া কুসংস্কার ও দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব ও জনমত সৃষ্টি করা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক পক্ষের দাঙ্গাকারীদের সমর্থন জানায়, এমনকি অনেক সময় দাঙ্গার উস্কানী দিতে দ্বিধাবোধ করে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ যে জাতীয়তাবাদের অংশ তাহাও তাঁহারা নানাভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন।

দাঙ্গা বন্ধকরণে বৃটিশ সরকারের টালবাহানা

এই সকল ব্যতীত বৃটিশ সরকার শাসন ব্যবস্থার নৈতিক মর্যাদা রক্ষার জন্যও এইরূপ দাঙ্গা বন্ধ করিতে অনেক সময় নানা প্রকার টালবাহনা করিয়াছে। তাহারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করিবার কিংবা বন্ধ করিবার জন্য একদিকে এইরূপ সংঘর্ষের ইন্ধন

যোগাইয়াছে অন্যদিকে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশদলকে কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা ঔদাসীন্য দেখাইয়া দাঙ্গার তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণকে বিধ্বস্ত করিয়া ভারতের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখিবার প্রধান অস্ত্রস্বরূপ যে এই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরাজের বাণী পেশ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি।

জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতা

যে জনগণ এইরূপ দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করিয়াছে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহারাই। তাহাদের কি যৎসামান্য বুদ্ধি ছিল না যাহা দ্বারা বুঝিতে পারিত যে, মসজিদের সম্মুখে নামাজের সময় বাজনা বন্ধ করিলে হিন্দু ধর্ম রসাতলে যাইবে না কিংবা উন্মুক্ত স্থানে গরু কোরবানী না করিলে ইসলামের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। শ্রীপদ্ম সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলমোহর কোনক্রমেই মুসলমানদের ঈমান বা বিশ্বাসকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। উত্তর প্রদেশে উর্দু ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষার প্রবর্তন ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করা যাইত। একদিকে সমাজ ও নেতৃবর্গের মধ্যে এইরূপ বিভ্রান্তি অন্যদিকে বৃটিশ চক্রান্তে মিলিত হইয়া সমস্ত বিষয়টিকে একটি মিশ্র রূপ দেয়া হয় এবং তাহারই ফলে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবাদী একতা বিনষ্ট করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

বর্তমানে অনেকেই গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন ও প্রার্থনা সভায় স্বাধীন ভারত অর্থে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনাকে অতীত দিনের জেহাদী, ওহাবী ও খিলাফত আন্দোলনের মতই মনে করিতেছেন

অর্থাৎ এইসকল আন্দোলনের মধ্যে মুসলমানী ও হিন্দুয়ানীর গন্ধ ছিল। তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, দেশের জনশক্তিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছিল। অবশ্য একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনা গৃহ কিংবা ধর্মীয় সভা ও আলোচনার মাধ্যমে রাজনীতির প্রচার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় মতের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিতে থাকে; কিন্তু ইহার দ্বারাও যে রাজনীতি ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সম্পর্কে সমঝোতা অসম্ভব তাহা চিন্তা করিবার কারণ নাই। কোন ধর্মমত কোন সময়ের জন্যই সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় না। যাহা কিছু অভিযোগের কারণ হইতে পারে তাহা হইতেছে উদারতা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ত্রুটি-বিচ্যুতি। হিন্দু-মুসলমানের ভারতবর্ষে দেশ শাসন সম্পর্কে যৌথ দায়িত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু উপরোক্তভাবে একদিকে ধর্মীয় পটভূমিকায় রাজনীতির প্রচার অন্যদিকে বৃটিশ শাসক শ্রেণী কর্তৃক দুইটি বৃহত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য নানা প্রকার অপপ্রচার ও জনসাধারণের শিক্ষার অভাব ইত্যাদির মিলিত ফল বিদ্বেষ। যাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাঝে মাঝে নিছক সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারচ্ছন্ন মনে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উৎসাহ দেয়।

নজরুল ইসলাম

যখন সারা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ঝড় বহিতেছিল সেই সময় বাংলার সাহিত্য ও কাব্যক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়। কবিতা ও গানের মাধ্যমে জনমনে যে আদর্শ ও দেশের জন্য যে আত্মত্যাগ বোধ জাগরিত হইতে পারে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়া উঠেন বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দেশাত্মবোধক গান, বৃটিশবিরোধী কবিতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে

বিপ্লবী অভিযান তাহার সকল প্রকার লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। বাংলার আকাশে-বাতাসে সেই বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হইতে থাকে। কবি নজরুলের লেখা গান, কবিতা ও কাব্য সেদিন বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মনে অপূর্ব মিলনের স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল আর তাহারই সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ব্যবস্থা বাঙালীর মনে জাতীয়তাবাদী আদর্শ রূপায়িত করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা প্রদেশে এইরূপ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন প্রয়াস ও তাহার বাস্তবায়ন অবশিষ্ট ভারতীয়গণ গ্রহণ করে নাই। নজরুল ইসলামের "ধূমকেতু" পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতার আহ্বান এবং বৃটিশবিরোধী জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশের জন্য কবিকে কারাবরণ করিতে হয়। কারাগারে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি চল্লিশ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। এ সময় সর্বভারতীয় নেতারা হিন্দু-মুসলমানের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন সংখ্যা বণ্টনের হার লইয়া দর কষাকষি করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

দাঙ্গার তীব্রতা ও মিলনের চেষ্টা

ইহার পরই ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৬ পর্যন্ত নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি অব্যাহত রাখিবার সকল চেষ্টা বিফল হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কোহাটে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে তাহার বীভৎসতা এতই ভয়াবহ ছিল যে, গান্ধীজী উভয় সম্প্রদায়ের চৈতন্য উদয়ের জন্য দিল্লীতে একুশ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য দিল্লীতে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত একটি মিলন সভার বৈঠক হয়। এই বৎসর নভেম্বর মাসে বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সকল দলের এক সভা হয়। সেই সম্মেলনে যে কমিটি গঠিত হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ

লাভ এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করা। এই সমিতেকে ১৯২৫ সালে ৩১ শে মার্চের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করিতে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, দিল্লী কন্ফারেন্সে "সকল ব্যক্তির ধর্মীয় মত অনুসরণ করা, প্রচার করা ও অনুষ্ঠান পর্বাদি সম্পর্কে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা এবং ধর্মীয় স্থান-সমূহের পবিত্রতা রক্ষা, গো-বধ, মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান সম্পর্কে কতকগুলি খসড়া আইন রচনা করা হয়।" (পট্টভিসিতারা-মিয়া : কংগ্রেসের ইতিহাস)

কিন্তু দেখা যায় যে, এইরূপ সৎ উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব কোনক্রমেই কার্যকরী হয় নাই। "বোম্বাইয়ে সংগঠিত সমিতি মার্চ মাস পর্যন্ত কোন প্রকার আপোষমূলক ও অনুসরণযোগ্য পথের ইঙ্গিত দিতে পারে না এবং ভবিষ্যতের জন্য ইহার বৈঠক স্থগিত রাখে।"

১৯২৬ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি ভয়াবহ বৎসর। এই বৎসরে ভারতের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন ভারতের আইনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সিমলাতে একটি ঐক্য কনফারেন্স আহ্বান করেন। "কিন্তু সেখানেও গো-হত্যা এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান বন্ধ করা সম্পর্কে সদস্যগণ একমত হইতে পারেন না।" (মোহাম্মদ নোমান, মুসলিম ইন্ডিয়া)

এ বিষয়ে বিনয়েন্দ্র মোহনচৌধুরী "ভারতে মুসলিম রাজনীতি" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া সকল সময় দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হইয়াছে। একটি ধর্মীয় অপরটি রাজনৈতিক। বাস্তবে যদিও কখনও দুইটিকে পৃথকভাবে দেখা গিয়াছে, কখনও বা কোন একটি বিষয়ের প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দিয়াছে। ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, ধর্মীয় বলিয়া যে বস্তুটি গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা কোন ক্রমেই ধর্মীয় নহে। কারণ নিতান্ত সাধারণ মানুষও ইহা বুঝিতে পারে যে, উম্মুক্ত স্থানে গো-হত্যা ও নামাজের সময়,

মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধের ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। অবশ্য এ কথাও বিশ্বাস করিতে হইবে যে বিভিন্ন সময় উভয় সম্প্রদায় যথেষ্ট ধৈর্য দেখাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের ধর্মের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। যখনই উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ঐকান্তিকভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছেন তখনই উভয় সম্প্রদায় যথেষ্ট নিকটবর্তী হইয়াছে।"

লেখকের গ্রন্থের এই অংশটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। কারণ লেখক উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষার্থে সময় বিশেষে ঐকান্তিক চেষ্টার অভাব যে ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। পুনরায় স্থানবিশেষে তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পরধর্মমত সম্পর্কে সহিষ্ণুতা কখন কখন সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। এইভাবেই মুসলমানগণ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা করিবার জন্য সাদর সম্ভাষণ জানান। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ঐক্য সম্মিলনে ডাঃ আনসারী ঘোষণা করেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিল্লীতে সাতশত গো-কোরবানীর স্থলে মাত্র তিন-চারটি হইয়াছিল।"

দাঙ্গার রাজনীতি

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যদি নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষা করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করা সম্ভব হইত। বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যাহা এইরূপ সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিতে পারিত তাহা অবশ্যই যে সম্প্রদায়ের উপর শাসনভার অর্পিত হউক তাহাদের উপর নির্ভর করিত এবং সেইজন্য বৃটিশ সরকার সকল সময় মুসলমানদের মনে শাসন বিভাগে হিন্দুদের প্রাধান্য সম্পর্কে সন্দেহের খোরাক যোগাইয়া আসিয়াছে এবং

অপরদিকেও ঠিক এইভাবে ইন্ধন যোগাইতে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু সকল সময় তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল সে কথা মনে করিলে ভুল হইবে। কখনও স্বার্থবাদী দল, কখন সরকার, কখনও বা অন্য কোন দল প্রয়োজনবোধে জনসাধারণের মনোভাবকে কাজে লাগাইয়াছে। কিন্তু শেষের দিকে একথা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়াছিল যে, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ব্যতীত এইরূপ ধর্মীয় সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে কংগ্রেস লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও ১৯১৯/২০ সালের খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমানের যে মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল তাহাই এই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।"

'খণ্ডিত ভারতে' ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন যে, "গান্ধীজী ১৯২৪ সালে মুক্তি লাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের প্রকট অবস্থা এবং তাহার জন্য ধন ও প্রাণের ব্যাপক হানী লক্ষ্য করিয়া পূর্ব অভ্যাস মত ২১ দিন ব্যাপী অনশন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন দ্রুত অবনতিশীল সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের প্রতি হিন্দু এবং মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আত্ম-ঘাতী ভ্রাতৃবিরোধ হইতে উভয়কে নিরস্ত করিতে। কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে অবিলম্বে সকল সম্প্র-দায়ের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহূত হইল। সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হয় এই অর্থে যে, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করিয়া দিয়া কয়েকটি ন্যায় ও নীতিসম্মত প্রস্তাব ইহাতে গৃহীত হইল এবং সে অবস্থার উদ্ভব হইবার ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে তাহা আয়ত্ত করিবার পক্ষে কর্মপন্থা রচিত হইল। আশা করা হইল ইহার দ্বারা অবস্থার অনেক-খানি উপশম হইবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি যদি যথারীতি প্রচারিত হইত এবং আন্তরিকতা সহকারে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইত তাহা হইলে অবস্থা যে অনেক পরিমাণে আয়ত্তাধীনে আসিত তাহাতে

সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার দায়িত্ব কোন একটি সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবে না।"

এই স্থানেও দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য নেতৃবর্গের আন্তরিকতার অভাব ছিল। এমন কি গৃহীত প্রস্তাব-সমূহ প্রচারিত হয় নাই এবং সকল সময় কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইত। স্থান বিশেষে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "আসল ব্যাপারটি হইতেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মূলে ধর্মান্ধতা আপাতদৃষ্টিতে কারণরূপে বিদ্যমান রহিলেও তাহার প্রকৃত কারণ ছিল রাজনৈতিক। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব একবার সংঘটিত হইলে তাহার ফলে পারস্পরিক ক্ষোভ ও সংশয় সৃষ্টি হয় এবং তাহাই পরবর্তী সংঘর্ষের হেতু হইয়া উঠে। আবহাওয়া এইরূপ বিষাক্ত হইয়া উঠে যে, অতিশয় সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা অথবা ঘটনার সত্যিকার হেতু সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া আপোষ-ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না।"

সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন সংঘর্ষ বন্ধ করিবার উপায় সম্পর্কে এই মত প্রকাশ করেন তখন নিতান্ত সহজ-ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে-কোন কারণেই হউক জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ দাঙ্গা বন্ধ করিতে অসহায় বোধ করিয়াছিলেন। পাছে দাঙ্গাকারী-গণ এইরূপ স্থানীয় অথচ সর্বভারতীয় নেতৃবর্গকে ভুল বুঝে, এইরূপ আশংকা করিয়া অন্যত্র লিখিয়াছেন, "দাঙ্গার ফলে যে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হয় তখন তাহা এমনই ভয়াবহ যে সে অবস্থায় আপোষরফার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে অনেক সময় তাহার মর্ম ভুলভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাও হইবার সম্ভাবনা থাকে।"

কংগ্রেসী চিন্তা ও মুসলমানদের সন্দেহ

হয়ত পাছে দাঙ্গাকারীরা জাতীয়তাবাদী নেতাদিগের প্রস্তাব ভুলভাবে গ্রহণ করে, সেই জন্যই বোধ হয় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক অশান্তি বন্ধ করিবার

জন্য জনমত সৃষ্টি করা অপেক্ষা এইরূপ সমস্যাকে পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করাই শ্রেয় মনে করিয়াছে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত কংগ্রেসের একজন অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নেতা অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কেবল যে দাঙ্গাকারী পক্ষদ্বয়ই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হয় তাহাই নহে এমন কি মামলায় সাক্ষীরা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া উভয় পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং আপন আপন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিভূ ও পৃষ্ঠপোষকরূপে পুরোভাগে অগ্রসর হইয়া আসে। তথাপি বেসরকারী পক্ষ হইতে আপোষরফার চেষ্টা হইলে অথবা মামলা প্রত্যাহার করাইবার প্রয়াস হইলে দুর্বৃত্তদিগকে রক্ষা করিবার কৌশলরূপে তাহা নিন্দিত হইয়া থাকে, অথচ ব্যাপারটা এই যে, যে সকল দুর্বৃত্ত পশ্চাতে রহিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উস্কাইয়া দিবার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয় দাঙ্গার আঘাত এবং পুলিশ আদালতের বিড়ম্বনা হইতে অক্ষত দেহে অব্যাহতি লাভ করিবার কৌশলে তাহারা সিদ্ধহস্ত। সহজ, সরল অশিক্ষিত জনসাধারণ আসামী রূপে এই সকল মামলায় জড়াইয়া পড়ে। সাময়িক উত্তেজনার বশে তাহারা যাহা করে উত্তেজনা প্রশমিত হইয়া গেলে তাহারা অচিরে তাহার জন্য দুঃখিত হয়। এই সমস্ত লোককে রক্ষা করিবার চেষ্টা নৈতিক অথবা অন্য কোন দিক দিয়া অন্যায় নহে, বিশেষ করিয়া তাহার দ্বারা সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি যদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। তথাপি দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ইহা হিন্দুদের আত্মরক্ষার অপকৌশল মাত্র।"

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতাদের অনেকে মুসলমানদের চোখে যথেষ্ট সন্দেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই জন্য দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় নেতারা যথেষ্ট সংকোচ বোধ করিতেন এবং কোন প্রকার বলিষ্ঠ পন্থা গ্রহণ করিলে অপর সম্পদায়ের নিকট বিরাগভাজন হওয়ার মতই নিজ সম্প্রদায়ের নিকটও সন্দেহভাজন হইবার আশংকা করিতেন। সেই জন্য নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের ব্যাপারে ঔদাসীন্য যথেষ্ট দুঃখের বিষয়।

দশম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রতি অনাস্থা

দেখা যাইতেছে যখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ ও খিলাফত কমিটি একযোগে বৃটিশ বিরোধী সকল আন্দোলন পরিচালনা করিতেছে তখনই ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিরাট সংকটজনক পরিস্থিতির সূচনা করে। রাজনৈতিক দলসমূহও এইরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে অসমর্থ হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিবার ফলে কারারুদ্ধ হন এবং কারামুক্তির পর মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য শুদ্ধি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার মত আরও অনেক জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার নিকট নতি স্বীকার করেন। তাহার জন্য ইহারা জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানের নিকট সমালোচনার পাত্র হন।

উল্লেখ থাকে, প্রায় এক বৎসর পূর্বে মুসলমানরা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জাতীয়তাবাদী কার্য-কলাপে সন্তুষ্ট হইয়া এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা লক্ষ্য করিয়া দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মুসলিম-বিরোধী কার্য-কলাপে এক শ্রেণীর মুসলমান ক্ষোভ প্রকাশ করে। 'খণ্ডিত ভারতে' ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "জাতীয়তাবাদী ও মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবর্তিত শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উত্থিত হইল। আন্দোলনের সময়োপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় হউক কিন্তু খৃষ্টান অথবা মুসলমানগণ ইহার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ যে কিরূপে করিতে পারে তাহা বুঝা দুষ্কর।"

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, 'তাহারাও অপরকে ধর্মান্তরিত করে,' এই কথা বলিতে চাহিয়া মনের আগোচরে তিনিও জাতীয়তাবাদী ও মুসলমানদের সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়াছেন। এই জন্যই হিন্দু-মুসলমান সনসাধারণের এক অংশ উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের উপরও আস্থা হারাইয়াছিল। মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মওলানা মুহম্মদ আলী, শওকত আলী, ডাঃ কিচলু, ডাঃ আনসারী, মওলানা আজাদ, মিঃ শেরওয়ানী ও ফজলুল হক প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের চেষ্টায় উচ্চ পর্যায়ের কোন মুসলিম নেতা তখনও এইরূপ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সহিত জড়িত হন নাই। যে কারণে মুসলমান জনসাধারণের এক অংশ এইরূপ নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের হিন্দুঘেষা বলিয়া আখ্যা দিত। সামাজিক ও চাকুরী জীবনে হিন্দুদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যকর অবস্থার প্রতিকার করিতে অক্ষম ও অসহায় বলিয়াও তাঁহাদের সমালোচন করা হইত। কিন্তু তাহা সত্বেও কোন এক অজানা ও অদৃশ্য পথ হইতে সাম্প্রদায়িক উস্কানী আসিয়া উভয় সাম্প্রদায়ের জীবনে শান্তি বিনষ্ট করিত, বিদ্বেষ-বহ্নি সমস্ত দেশময় হিংসার ভাব জাগাইয়া তুলিত। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের গোহাটি অধিবেশনের প্রাক্কালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন। সারা দেশে বিদ্বেষ ও বিভীষিকার ভাব ফুটিয়া উঠে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মগত মতবিরোধ মীমাংসা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯২০ সালে মণ্টেগু, চেমস ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও খিলাফত কমিটি উক্ত সংস্কার আইন বর্জন করে এবং ঐ বৎসর কোন প্রকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নাই। ১৯২২ সালে আইন

অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির নেতাদিগের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে ফলে বর্জন সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হয়। ১৯২৩ সালে কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মীরা নির্বাচন দ্বন্দ্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরিষদের বহু মুসলমান সদস্য কংগ্রেস-সভ্য না হইয়াও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল।

"কেবলমাত্র স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হইবার জন্য নহে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টির কর্তৃত্ব ও কেন্দ্রীয় পরিষদের রাজস্ব বিল সম্পর্কে আলোচনায় সরকারবিরোধী কার্যক্রমকে দৃঢ়তর করিবার এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে গৌহাটি কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার অধিকার ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দদের লইয়া একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৭ সালের প্রথমেই দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ প্রশাসনিক ব্যাপারে কয়েকটি আইনের রদবদল করিতে মনস্থ করেন এবং হিন্দু নেতৃবর্গ লক্ষ্ণৌ প্যাকটের শর্ত অনুযায়ী কিংবা অনুরূপ কোন শর্ত সাপেক্ষে মুসলমানদের জন্য পরিষদে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং যৌথ নির্বাচন নীতি যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন। এই বৎসর ২০শে মার্চ মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম নেতৃবর্গ দিল্লীতে মিলিত হন ও সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাহাতে কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত মানিয়া লওয়া হয়।" (খণ্ডিত ভারতঃ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ)

দিল্লী প্রস্তাব

মুসলিম লীগ কর্তৃক যৌথ নির্বাচন প্রথা মানিয়া লইবার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসার পথ প্রশস্ত হয়। মুসলিম নেতৃবর্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১। সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গণ্য করিতে হইবে।

২। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের মত সম মর্যাদা দান করিতে হইবে।

৩। পাঞ্জাব এবং বাংলার মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা তাহাদিগের মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে স্থির করিতে হইবে।

৪। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্যদিগের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে না।

এ বিষয়ে "মুসলিম রাজনীতি" পুস্তকে বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় যে, দিল্লী প্রস্তাব তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাপেক্ষা উত্তম সমাধান ছিল এবং তাহার জন্য মিঃ জিন্নাহ্ যথেষ্ট সুখ্যাতি পাইবার অধিকারী।"

এই বৎসর মে মাসে এবং অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের পর পর দুইটি অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগের প্রস্তাবগুলি স্বীকৃত হয়। "কংগ্রেসের ইতিহাস" পুস্তকে পট্টভি সীতারামাইয়া লিখিয়াছেন, "নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পরিষদে সকল সংখ্যালঘু, এমন কি পাঞ্জাবে শিখগণের জন্যও আসন সংরক্ষণের অনুকূলে এই প্রস্তাব মানিয়া লয়।" কংগ্রেস আর একটি প্রস্তাব দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দেয় যে অপরাপর সংস্থা কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত দলসমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারিবে, এবং অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় স্বরাজ শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করিয়া কংগ্রেসের আলোচনা এবং অনুমোদনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে অপরাপর সংস্থার নেতৃবর্গ ও প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে। এই সপ্তাহে মুসলিম লীগের কলিকাতা অধিবেশনে লীগ কমিটিও তাহার কাউন্সিলের একটি সাব কমিটি গঠন করিবার অধিকার দান করে। উক্ত সাব কমিটির কার্য হইল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভারতীয়

শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করা এবং কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাবিত জাতীয় কনভেনশনে অংশ গ্রহণ করা। একথাও উল্লেখ করা হইল যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ কংগ্রেস মানিয়া লইলে মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পরিহার করিতে প্রস্তুত। 'ভারতে মুসলিম রাজনীতি' পুস্তকে বিপয়েন্দ্র-মোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মতবিরোধ মীমাংসার এমন কি গো-হত্যার জন্য ও মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণের জন্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডঃ আনসারী ও মিঃ জিন্নাহ্ যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহাদের নায়কত্বে সমস্ত বিষয়টির সমাধানের ব্যবস্থা প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়।"

সায়মন কমিশন বর্জন

এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তাঁহারা কলিকাতায় গৃহীত যৌথ নির্বাচন প্রথার বিরোধিতা করেন এবং মিয়া মোঃ সফির সভা-পতিত্বে লাহোরে এক অধিবেশনের আহ্বান করেন। ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ 'খণ্ডিত ভারতে' লিখিয়াছেন, "মৌলভী মোঃ ইয়াকুবের সভা-পতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। মিঃ এম. এ. জিন্নাহ্ ছিলেন এই অধিবেশনের নায়ক ও পরিচালক। ইতিমধ্যে ভারতীয় সদস্য বর্জিত সাইমন কমিশনের নাম ঘোষিত হয়। কংগ্রেস এবং মিঃ জিন্নাহ্ প্রভাবান্বিত মুসলিম লীগ এইরূপ ভারতীয়বর্জিত কমিশন বয়কট করেন। ......সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সদস্য বর্জিত কমিশন গঠনের প্রস্তাব ভারতীয়গণের নিকট অত্যন্ত অবহেলা ও অপমানজনক বলিয়াই বোধ হইল। ফলে কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল কেবলমাত্র কংগ্রেস কর্তৃক নহে কংগ্রেস বহির্ভূত বহু মুসলমান প্রতিষ্ঠান ও খেলাফত কমিটির দ্বারা।" (খণ্ডিত ভারত)

এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার আর

একবার ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ বিষ ছড়াইবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং মিঃ জিন্নাহ্ বিরোধী পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সাথেও আলাপ-আলোচনা চালায়।" "খণ্ডিত ভারতে" ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে মতদ্বৈধতার মূল্য লর্ড বার্কেনহেড সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই ভারত সচিবরূপে তিনি নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, এই বিরোধিতা যতই গভীরতর হইবে এবং যতই অধিকতর জনসংখ্যা দ্বারা গৃহীত হইবে, ততই ব্যাপকতর স্বার্থ ইহার দ্বারা ব্যাহত হইবে এবং ততই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে এই বিরোধিতা নিষ্পত্তি কেবলমাত্র আমাদের মধ্যস্থতার দ্বারাই সম্ভব।"

ভারতীয়গণ কর্তৃক সাইমন কমিশন বর্জিত হইলে তিনি পুনরায় লর্ড আরউইনের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বর্জন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিবার পক্ষে আমরা সকল সময় নির্ভর করিয়াছি বর্জনবিরোধী মনোভাব সম্পন্ন অনুন্নত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপর, এমনকি পরিদর্শন কালের মধ্যেও প্রতিরোধ গাত্রে আর কোথাও ফাটল সৃষ্টি করিতে পারা যায় কি না তাহা বিচারের ভার আপনার এবং সাইমনের উপর ন্যস্ত রহিল। কমিশন মুসলমানদিগের দ্বারা প্রভাবিত হইলে এমন রিপোর্ট পেশ করিবে যাহা হিন্দু স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপজ্জনক। এই আশংকা হিন্দু জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—তাহাতে যেমন মুসলমানগণের সমর্থন লাভের পক্ষে সুবিধা হইবে; তেমনি মিঃ জিন্নাহ্‌কে শুষ্ক এবং শূন্যে রাখা সম্ভব হইবে।"

এইরূপ নির্দিষ্ট নীতি কার্যকরী করিবার জন্য সরকার পক্ষে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। স্বার্থান্বেষী হিন্দু-মুসলমানের দল সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকে। আর পাঞ্জাবে জিন্নাহ্-বিরোধী মুসলিম লীগ স্যার মহাম্মদ সফির নেতৃত্বে ও সরকারের সহযোগিতায় লালিত-পালিত হইতে থাকে। হিন্দু জমিদার অনুন্নত

শ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণ, দেশীয় ও করদ রাজ্যসমূহ ও সরকারী চাকুরিয়াগণ জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা সরকারী নেক নজরে সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হয়। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও মিঃ জিন্নাহ্ প্রবর্তিত মুসলিম লীগ খিলাফত কমিটি, জমিয়ত-উল-উলেমায়ে হিন্দ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী দলসমূহ একযোগে কার্য করিতে থাকে। ডঃ আনসারীর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য সকল দলের মিলিত সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালের ১লা জুলাইয়ের পূর্বে খসড়া প্রণয়ন করিতে বলা হয়।

মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একসঙ্গে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া এইবার সর্বপ্রথম সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে বিরত থাকে এবং তাহার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। "মুসলিম ইণ্ডিয়া"র লেখক মোহাম্মদ নোমানের মত অনুযায়ী "মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান করিতে বিরত থাকিবার প্রস্তাব যথেষ্ট বিবাদ সৃষ্টি করে।"

হঠাৎ এই মত পরিবর্তন করিবার কারণ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন যে, "মুসলিম লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবার ফলে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের এক অংশ যথেষ্ট উল্লসিত হইয়া উঠে এবং ইহাদিগের মনোভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহা লক্ষ্য করিয়া মিঃ জিন্নার দলীয় মুসলিম লীগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন এবং ইহার ফলেই মুসলিম লীগ মত পরিবর্তন করে।"

হিন্দু নেতাদের প্রতি মুসলিমদের সন্দেহ

ইহা ১৯২৮ সালের ঘটনা। ইহার পূর্বে কয়েক বৎসর হইতে নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তাহার প্রতিক্রিয়া বহু মুসলমানের মনে জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃবর্গের কার্যকলাপ সমন্ধে সন্দেহের কারণ হয়। কিন্তু তথাপি মিঃ জিন্নাহ্ পরিচালিত মুসলিম লীগ রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহিত কার্য করিতে থাকায় সরকার পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাহ্ এবং তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে স্যার মহাম্মদ সফির নেতৃত্বে নূতন এক প্রকার মুসলিম লীগ গঠিত হয়। তাহারা হিন্দুমহাসভাপন্থী জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতাদের যেরূপ সমালোচনা করিত তেমনি কংগ্রেসী মুসলমান এমন কি মিঃ জিন্না এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের কার্যকলাপও পছন্দ করিত না এবং সকল সময় সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ইহাদিগকে হিন্দুদ্বেষা বা হিন্দুয়ানীর উৎসাহ দাতা বলিয়া বর্ণনা করিত।

জিন্নাহ্‌র হতাশা

এইরূপ নূতন দল যখন মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে তখন হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা অপেক্ষা সাধারণভাবে মুসলিমবিরোধী সমালোচনা ও মুসলিম লীগের ধ্বংস চাহিয়া উল্লাস প্রদর্শন করেন। এইরূপ অবস্থা মুসলিম লীগকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে আর সেই জন্যই মিং জিন্নাহ্ সর্বদলীয় সম্মেলন হইতে দূরে থাকিয়া প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার সুযোগ খোঁজেন। "ভারতে মুসলিম রাজনীতি"র লেখক শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যায় যে, মিঃ জিন্নাহ্—যিনি অন্যতম জাতীয়তাবাদী হিসাবে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ কংগ্রেসের সহিত মিলিতভাবে পরিচালিত করেন, যিনি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধানের জন্য দিল্লী

প্রস্তাব উদ্ভাবন করেন, তিনি ক্রমেই এ্যাংলোমুসলিম মিলন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্ব স্থাপন লক্ষ্য করিয়া যথেষ্ট অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের ভবিষ্যৎ ও ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক হইতে পারে এইরূপ আশংকা করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে হতাশা ও নিরাশার মধ্যে মিঃ জিন্নাহ্‌ ১৯২৮ সালের ৫ই মে ইংল্যান্ড গমন করেন।"

আতংকিত মুসলিম

অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের এক অংশ ক্রমেই মুসলিমবিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছেন ও তাহার ফল স্বরূপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যতীত আরও বহু প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে চিন্তা করিয়া হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদীগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে আসন সংরক্ষণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বন্যার গতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যায় কংগ্রেসের মধ্যে যেমন হিন্দুমহাসভাপন্থী কিংবা হিন্দু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণকারী সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছিল তেমনি ইহাদের গতি লক্ষ্য করিয়া মুসলিম লীগেও কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি যোগদান করিতে থাকে। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশে এবং সেই স্থান হইতে মূল মুসলিম লীগের প্রতি আক্রমণ চলিতে থাকে এবং তাহারা মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা পছন্দ করেন না। শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী পুনরায় লিখিয়াছেন, "পূর্বেই হিন্দু নেতৃবর্গ লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট কিংবা অনুরূপ কোন প্যাক্ট অনুযায়ী পরিষদে মুসলিম আসন সংরক্ষিত রাখিয়া যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু করিতে চাহেন এবং ১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ দিল্লীতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে এবং নায়কত্বে সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতে এমন এক অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল

যাহার ফলে শ্রীনেহেরুর ভাষায় 'আতঙ্কিত' মুসলমানগণ যুক্ত নির্বাচন মানিয়া লইতে ও সংখ্যালঘুদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ হইতে বাধ্য হইয়াছিল।"

তাহার পর যখন মিঃ জিন্নাহ্ পাঞ্জাবের বিরোধী মুসলিম লীগ দলের সহিত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন মুসলমানদিগের এবং মুসলিম লীগের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া মুসলিম সংহতি বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কি রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয় সাধন করিতে পারে, এইরূপ চিন্তা করিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু কংগ্রেসী নেতৃবর্গের উল্লাস ও কার্যকলাপ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গের মনে আঘাত দেয়। বলা বাহুল্য এইরূপ অবস্থা কোনক্রমেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণে সাহায্য করিতে পারিবে না মনে করিয়া মুসলিম লীগ সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দান করে নাই।

নেহরু কমিটির রিপোর্ট

ইহার পর নেহরু কমিটি সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটি নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ, সিন্ধু প্রদেশকে পৃথককরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের সরকার গঠন সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করে; প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যার হার অনুযায়ী আসন সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীয় পরিষদে এক চতুর্থাংশ মুসলমান আসন নির্দিষ্ট করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব মুসলিম লীগ কর্তৃক বিবেচিত হইবার জন্য মাহমুদাবাদের রাজার সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক বৈঠক বসে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মাহমুদাবাদের রাজা তখনকার দিনে একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সাইমন কমিশন বর্জন ও শোভাযাত্রা ও আন্দোলনে যোগদান করার জন্য তাঁহার গৃহ কয়েক দিন যাবত পুলিশ কর্তৃক বেষ্টিত ছিল। ভাগ্যের পরিহাস

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জাতীয়তাবাদী মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক কমিশন বর্জিত হইলেও ভারতের শ্রেণী নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই কমিশন বর্জন করে নাই। 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া' পুস্তকে শ্রীজওহরলাল নেহরু এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন, তখনও ভারতীয় মুসলমানগণ অনুন্নত শ্রেণীর মত কিংবা পুরাতন আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনোভাব দ্বারা পরিচালিত এক সম্প্রদায় বিশেষ। তাহাদিগের মধ্যে তখনও শিল্প এবং বর্তমান যুগের প্রগতিবাদ স্থান পায় নাই।"

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ কমিশনকে বর্জন করিলেও হিন্দু, শিল্পপতি, অনুন্নত শ্রেণী, জমিদার এবং রাজন্যবর্গ বর্জন করেন নাই। সেই জন্য কমিশন মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ কিছু অভিমত প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়।

হিন্দুর ছুঁৎমার্গ

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার সমাজের যে চিত্র সাধারণতঃ সকলের দৃষ্টিগোচর হইত তাহারই অংশবিশেষ বর্ণনা করিতে হইলে উল্লেখ করিতে হয় যে, চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানরা কোথাও জনসংখ্যার উপযুক্ত হারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় মুসলমানরা তখনও অনুন্নত এক বিশেষ শ্রেণী, সমাজে সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের নিকট অচ্ছুত ও অস্পৃশ্য। বলা বাহুল্য তখনও উপমহাদেশের সামাজিক অবস্থা এমনি ছিল: হিন্দু মিষ্টির দোকানে কোন মুসলমান খাবার লইলে দোকানী উপর হইতে খাবারটি পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া দিত। কোন দোকানে বসিয়া খাবার লইবার উপায় ছিলনা। পানি চাহিলে গেলাস পাওয়া যাইত না, পাছে মুসলমানের ছোঁয়া পানির ছিটাটা গায়ে লাগিয়া যায়—সেই জন্য দূর হইতে উঁচু করিয়া হাতে পানি ঢালিয়া দিত। শহরে সরবতের দোকানের দৃশ্য আরও করুণ ছিল। কয়েকটি ময়লা গ্লাস দোকানের এক পাশে কিংবা নীচে রক্ষিত হইত,

গ্লাসটিকে পানার্থীর পরিষ্কার করিয়া লইতে হইত। পরিষ্কার করিবার জন্য পানি নিয়ম মত উঁচু করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইত। দোকানদার অপর গ্লাসে শরবত তৈয়ার করিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিত। পান শেষে পানার্থী পুনরায় পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিত। এইক্ষেত্রেও দোকানের মধ্যে প্রবেশ নিষেধ ছিল। মূল অবশ্য হিন্দুদের মত সমান হারেই দিতে হইত। গ্রামে গোসলের ঘাটও পৃথক ছিল। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুর গায়ে গায় লাগিয়া গেলে যথেষ্ট তিরস্কৃত হইতে হইত। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ও ঘৃণার ভাব দেখা যাইত। অশিক্ষিতের কথা বলিতে চাহি না, শিক্ষিত হিন্দুরাও ঠিকমত মুসলমানদের নাম উচ্চারণ করিতে ও লিখিতে পারিতেন না। এই সব কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরেও যথেষ্ট বিদ্বেষভাব দেখা যাইত। অবশ্য একশ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাবেরও অভাব ছিল না। মুহররম উপলক্ষে অনেক স্থানে হিন্দু মুসলমানের মিলিত শোভাযাত্রা বাহির হইত। মুসলমানদের পীর সাহেবদের দরগাহ হিন্দুরা সিন্নি দিতেন। অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী বহু নেতা জেলখানার মধ্যেও সংস্কার ও ছুৎমার্গের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। বহু বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক বেঞ্চেরও যেমন ব্যবস্থা ছিল আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রকে শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু শিক্ষক এবং ভদ্রলোক যথেষ্ট সাহায্যও করিতেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে হিন্দুরা যে কারণেই হউক যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন তাহা কেবল যেমুসল মানদের উপরই প্রযোজ্য তাহা নহে। বর্ণ হিন্দু এবং নিম্নবর্ণেরহিন্দুদের মধ্যেও এইরূপ মনোভাব দেখা দিত। সেই জন্যই মনে রুটির স্বার্থ যেন বহুক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক স্বার্থকে নিরপেক্ষ থাকিতে দেয় নাই।

কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা

এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে ১৯২৮ সালের ২৫শে অক্টোবর মিঃ জিন্নাহ্ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। বিলাতে দীর্ঘ পাঁচমাস

অতিবাহিত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া লক্ষ্য করেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে নানা প্রকার মতের উদ্ভব হইয়াছে। অধিকাংশ মুসলমান ভবিষ্যতে মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণ-ব্যাপারে কংগ্রেসের মতিগতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দীহান হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবনতি রোধ করিবার উপায় হিসাবে পরিষদে আসন সংরক্ষণ ও পূর্বে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত যুক্ত নির্বাচন অপেক্ষা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পছন্দ করিতেছে এবং নেহরু রিপোর্টে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্য সংখ্যা এক চতুর্থাংশের পরিবর্তে শ্রী আয়েঙ্গার কর্তৃক নির্দিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সদস্য সংখ্যা সংরক্ষণ চাহিতেছে। কলিকাতায় আহূত সর্বদলীয় সম্মেলনে মিঃ জিন্নাহ্ বহু সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু গৃহীত না হইবার ফলে সভা পরিত্যাক্ত হয়। মুসলিম সদস্যগণ মনে করেন যে কংগ্রেস ক্রমেই হিন্দু মহাসভাপন্থীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে।

জিন্নাহ্ ও সফির সমঝোতা

১৯২৯ সালের মে মাসে কলিকাতায় মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায় লীগের মধ্যে মিঃ সফির দল নেহরু রিপোর্টের বিরোধী। মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মিঃ শেরওয়ানীর দল ছিলেন নেহরু রিপোর্টের পূর্ণ সমর্থক। ইহার পর মহামান্য আগা খানের সভাপতিত্বে দিল্লীতে যে মুসলিম দল মিলিত হয় তাহারাও নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। দেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন মিঃ সফির দল লীগের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং মিঃ জিন্নাহ্ কিংবা অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সূত্রগুলি যথাযথভাবে বিবেচিত হয় না। অথচ মুসলিম লীগের মধ্যে এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে প্রথমতঃ লীগের মধ্যে মতবিরোধ

বৃদ্ধি পায় অন্য দিকে কংগ্রেসের সহিত একজোট হইয়া কার্য করাও সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া মিঃ জিন্নাহ্ মিঃ সফির দলের সহিত সমঝোতার ব্যবস্থা করেন এবং কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ রফা হয়। উভয় পক্ষ কর্তৃক আলোচিত শর্তগুলি কংগ্রেসের সহিত আলোচনার জন্য মিঃ জিন্নাহ্‌র উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। ভারতের ভাবী শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা হইবে এমন এক যুক্তরাষ্ট্র যাহাতে রেসিডুয়ারী ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হস্তে ন্যস্ত রহিবে।

২। প্রদেশসমূহে সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রবর্তন।

৩। প্রাদেশিক আইন সভাসমূহে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এইরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যে, তাহার ফলে কোন প্রদেশে কোন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘু অথবা সমসংখ্যক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারিবে না।

৪। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার ⅓ অংশের কম হইবে না।

৫। সাম্প্রদায়িক দলগুলি পৃথক নির্বাচনের দ্বারাই তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে কিন্তু যে, কোন দল যে-কোন সময়ে যৌথ নির্বাচনের অনুকূলে যাহাতে প্রয়োজন মত পৃথক নির্বাচন পরিহার করিতে পারে তাহার পথ উম্মুক্ত রাখিতে হইবে।

৬। পাঞ্জাব, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোন প্রাদেশিক আসন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারিবে না।

৭। সকল সম্প্রদায়কে ধর্মবিশ্বাস, পূজা-অর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান, প্রচার ও সাহচর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে।

৮। কোন বিল, প্রস্তাব বা তাহার অংশবিশেষ কোন আইন পরিষদে অথবা কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হইতে

পারিবে না, যদি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ¾ অংশ সদস্য তাহাদিগের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের হানীকর কার্য হিসাবে তাহার বিরোধিতা করে।

৯। সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে পৃথক করিতে হইবে।

১০। অন্যান্য প্রদেশের মত বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে।

১১। যোগ্যতার বিচার সাপেক্ষে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের যথাযোগ্য অংশ ধার্য করিতে হইবে।

১২। মুসলিম কৃষ্টি, শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত বিধান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সাহায্যের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পাইবার অধিকার রক্ষার জন্য যথাযোগ্য রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

১৩। কেন্দ্র অথবা প্রদেশে এমন কোন মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারিবে না, যাহাতে মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যা মোট মন্ত্রী সংখ্যার অন্ততঃ ⅓ অংশ নয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত চৌদ্দ দফার মধ্যেও দেখা যাইতেছে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারে পরিষদে শাসন নির্দিষ্ট করিবার উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইলে পঞ্চম শর্ত অনুযায়ী যৌথ নির্বাচনে বিশেষ আপত্তির কারণ ছিল না। যথেষ্ট নিরপেক্ষভাবে শর্তগুলি বিবেচনা করা উচিত ছিল। তাহা হইলে মনে হয় কংগ্রেস কর্তৃক আপোষ রফা করা যাইত। অবশ্য পরবর্তীকালে এইরূপ শর্ত মানিয়া লইতে বিশেষ আপত্তি হয় নাই। নেহরু রিপোর্টেও এগুলির মধ্যে অনেকগুলি মানিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল, সরকার সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্তগুলি দ্বারা বাকীগুলি প্রায় মানিয়া লইতে বাধ্য করে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপমহাদেশে যে হিন্দু-মুসলমান শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করিয়াছে, সকল দুঃখ-সুখের ভাগ লইয়াছে তাহারা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল

মুক্ত হইয়া জনগণ পরিচালিত গণতন্ত্র সৃষ্টির আশা করিয়াছিল তখন সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন উত্থাপনের কারণ যে গভীর দুঃখের ও মর্মান্তিক তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কেবল ইতিহাসের সাধারণ ঘটনা মাত্রের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। তখনকার দিনের সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনেকখানি অনুমান ও অপরাপর সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল হইলেও সাধারণতঃ হিন্দু-মুসলমান জনমনে যে চিরস্থায়ী বেদনার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা বাস্তব সত্য। কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত শর্তগুলি প্রত্যাখ্যাত হইবার পর মওলানা আজাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। কেবল মাত্র মিঃ জিন্নাহ্ মুসলিম লীগে থাকিয়া যান এবং এই সময় হইতে মুসলিম লীগ স্বাধীনভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনা করে। জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ বেশীর ভাগ কংগ্রেসে, কেহ বা জমিয়ত-উল-উলেমায়ে হিন্দ্, অহরর, মোমেন দলে বিভক্ত হইয়া কংগ্রেসের সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে একযোগে কার্য করিতে থাকেন। মওলানা আজাদ সৃষ্টি করেন জাতীয়তাবাদী দল।

একাদশ অধ্যায়

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাহ্ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য চৌদ্দ দফা শর্ত উত্থিত হইবার পর সমস্ত দেশে মুসলিম লীগ ও মি. জিন্নাহ্ বিরোধী সমালোচনা চলিতে থাকে। দেশের সংবাদ-পত্র সমূহ নানা প্রকার অলীক গল্পের অবতারণা করিতে থাকে। সকলের মুখে শুনা যাইতে থাকে যে জিন্নাহ্ বিলাতে অবস্থানকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার তাহাকে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছিল তাহারই পূর্ণ চিত্র এই চৌদ্দ দফার মধ্যে প্রতিভাত হই-তেছে। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র দেশে প্রত্যাবর্ত-নের পূর্ব হইতেই নেহ্‌রু রিপোর্ট বিরোধী ঘটনা সমূহ ঘটিতেছিল তাহাও লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু এত দীর্ঘ দিন যে ব্যক্তি এবং যে সংগঠন কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে সমা-লোচনা যেন সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে সময় বিশেষে কংগ্রেস অপেক্ষা মুসলিম লীগ পূর্বে যথেষ্ট দৃঢ় মনো-ভাবের ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছে। বৃটিশের হস্ত হইতে ভারতের সম্পূর্ণ মুক্তি সাধন ও স্বাধীনতা লাভ যে একমাত্র লক্ষ্যবস্তু তাহাও সর্বপ্রথম মুসলিম লীগ সম্মেলনেই ধ্বনিত হইয়াছে। নেতাদের এক গুঁয়েমী, জিদ, দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থের মর্যাদাবোধ যেমন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি নেতৃবর্গের সংস্কার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে উভয়কে বিপথগামী করে ১৯২৯ সালের শুরু হইতে। একদিকে মুসলিম লীগ কর্তৃক নেহ্‌রু রিপোর্টের প্রত্যাখ্যান অন্য দিকে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফার বিরোধিতা উভয়

সংগঠনকে কিরূপভাবে বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হয় তাহাকে কার্যকরী করিতে কংগ্রেসই প্রথম সাহায্য করে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ জমিয়েত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ প্রভৃতি সংগঠনসমূহের এক মিলিত অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে বলা হয় যে ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার নেহরু রিপোর্টভুক্ত দাবীসমূহ স্বীকার না করিয়া লইলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবীর পরিবর্তে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিবে। প্রথম অবস্থায় কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সকল কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল; তাহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর আন্দোলনের ভয় দেখাইয়া তাহারা কার্যোদ্ধার করিতে চাহে—এখন এতটুকু মাত্র প্রভেদ দেখা যাইতেছে। ইহার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা মীমাংসা করিয়া কর্তব্য স্থির করা উচিত ছিল তাহা যেন ভুলিয়া সে গুলিই তাহাদের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য বৃটিশ সরকারের দ্বারে উপস্থিত হয়। ভারতের জনস্বার্থ রক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতিকে মুসলিম লীগ কোনক্রমেই উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে নাই। মুসলিম লীগ মহল হইতে প্রচার চলিতে থাকে যে হিন্দুস্বার্থ সংরক্ষণের নামে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য; নতুবা নূতন করিয়া লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে যেমন প্রথম নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তেমনি কেন্দ্রীয় পরিষদের একের তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময় এই দুইটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া কলহ উপস্থিত হয় এবং যেহেতু কংগ্রেস যৌথ নির্বাচন চায় তাই মিঃ জিন্নাহ্ সে ব্যবস্থাকেও স্থান দিবার মত শর্ত চৌদ্দ দফার অন্তর্ভুক্ত করেন। কংগ্রেসকে বৃটিশ সরকারের দ্বারস্থ হইতে দেখিয়া ১৯২৯ সালের ২৯ শে অক্টোবর তদানীন্তন বড় লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন যে, সাইমন কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের সমস্ত দল ও গোষ্ঠীকে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে। এই কথাও ঘোষণা করা হয় যে ১৯১৭ সালের ঘোষণা

বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান করা, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে না পারায় কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা হইতে বিরত থাকে, নেহরু রিপোর্টও বাতিল করে এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলনসহ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। প্রায় এক বৎসর যাবত আন্দোলন চলিতে থাকে। এই আন্দোলনে মুসলিম লীগের বাহিরে সকল মুসলমান অংশ গ্রহণ করে। মুসলিম-লীগও উহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করে না বরং পরোক্ষভাবে নৈতিক সমর্থন জানায়। কারণ সাধারণ মুসলমানরা যে-কোন প্রকারে বৃটিশদের উচ্ছেদ চাহিতেছিল।

গান্ধীর কূটনৈতিক চাল

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর বিলাতে প্রথম রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের বৈঠক বসে। ইহাতে বৃটিশ ভারত রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের প্রতিনিধি, অপরাপর হিন্দু প্রতিনিধি সহ মুসলিম লীগে যোগদান করে। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করে না। বৈঠকে ভারতের নানা প্রকার সমস্যা ও ভবিষ্যতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। নেহরু রিপোর্ট ও মুসলিম লীগ শর্ত লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বাটোয়ারা সম্পর্কে ও নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব সমূহ বিবেচিত ও আলোচিত হইলেও প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা হয় না। এই বৈঠকে স্থির করা হয় যে, যে সকল প্রতিনিধি বৈঠকে যোগদান করে নাই তাহাদিগকেও সংগে লইতে হইবে। সেই ভাবে বড় লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করেন। তাহারই ফল স্বরূপ খাজনা বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ডঃ আনসারী কিন্তু দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য কেবল মাত্র মহাত্মা

গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মনোনীত হন। মিঃ গান্ধী বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত গমনের পূর্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলিমগণ এবং মুসলিম লীগ সদস্যদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি কূটনৈতিক চাল চালেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, উভয় দলের মুসলমানরা একমত হইয়া নির্বাচন প্রথা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেরূপ দাবী করিবে তাহাই কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইবে।

শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উভয় দলের মুসলমানরা কেন সকলেই সংগঠন নির্বিশেষে ভারত যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য সেক্ষেত্রে কোন প্রকার মতবিরোধ আসে নাই। যাহা কিছু ছিল তাহা কেবলমাত্র নির্বাচন ব্যপারে এবং আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে, ইহার পূর্বেই জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বলিতে যাহা বোঝা যায় অর্থাৎ কংগ্রেস, জমিয়ত উল উলেমা-ই-হিন্দ, খিলাফত কমিটি, অহরর, মোমিন প্রভৃতি দলের মুসলমান সদস্যরা নেহুরু রিপোর্টের সমর্থক রূপে কোন প্রকারে পৃথক নির্বাচনে মত দিবেন না তাহা মহাত্মাজীর নিশ্চয়ই জানা ছিল এবং তাহাদিগের চাপে যদি মুসলিম লীগ যৌথ নির্বাচনে মত দেন এই আশাতেই এইরূপ প্রস্তাব করেন যে একমত হইয়া যেরূপ দাবী উত্থাপিত হইবে তাহাই কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইবে। নতুবা কংগ্রেসকে মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলিয়া কেহ দায়ী করিতে পারিবে না। "খণ্ডিত ভারতে" রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কেবল নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্ন লইয়া। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যৌথ নির্বাচন প্রথার পক্ষপাতী এবং মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন পৃথক নির্বাচন প্রথার সমর্থক।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে স্যার আলী ইমামের সভাপতিত্বে জাতীয়বাদী মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশন আহূত হইল লক্ষ্ণৌয়ে। এই সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন যে রাজনৈতিক

মতবাদের দিক হইতে যদিও একদা তিনি সেই দলেরই সভ্য ছিলেন, পৃথক নির্বাচনের প্রতি যাহাদের পক্ষপাতিত্ব অতিশয় প্রবল এবং যদিও সেই মতের সমর্থকরূপে ও প্রতিনিধি মন্ডলের অন্যতম সদস্যরূপে একদা লর্ড মিণ্টোর তিনি সাক্ষাৎ প্রার্থী হন; তথাপি গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিবার পর তিনি এই সিদ্ধান্তেই আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যে,পৃথক নির্বাচন প্রথা যে শুধু ভারতের জাতীয়তাবাদ কর্তৃক অস্বীকৃত তাহা নহে, পরন্তু মুসলমান স্বার্থেরও সবিশেষ পরিপন্থী।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত রূপে প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার সহিত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা সন্নিবদ্ধ থাকিবে; কৃষ্টি, ভাষা ব্যক্তিগত বিধান প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করিতে হইবে; ভারতের শাসনতন্ত্রের কাঠামো হইবে যুক্তরাষ্ট্রিক; যোগদানকারী ইউনিটগুলির হাতে রেসিডুয়ারী ক্ষমতা অপর্ণ করিতে হইবে; সরকারী চাকুরীর যথাযোগ্য অংশ হইতে যাহাতে কোন সম্প্রদায় বঞ্চিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্যাবলিক সার্ভিস কমিশন নিম্নতম যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নির্বাচন করিবেন; সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও একই শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রদেশ সমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা এই যে, প্রাপ্ত বয়স্ক মাত্রেরই সর্বজন ভোটাধিকার যৌথ প্রথা মোট জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ ভাগের কম লোক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের এবং প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত আসনের জন্য তাহাদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনের মধ্যে মীমাংসা বিধানের জন্য চেষ্টা হয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। আপোষ রফার বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিমলাতে উভয় দলের একটি মিলিত সম্মেলনের অধিবেশন হয় ১৯৩১ সালের ২২শে জুন। ঐ সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিবৃতি প্রচার করিয়া কংগ্রেস সভাপতি ডঃ এম.

এ আনসারী বলিলেন, "সিমলায় আসিয়া আমাদের মনে হইল এখানকার আবহাওয়া আপোষরফার পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। আমাদের সে আশংকা অচিরে রূঢ় সত্যে পরিণত হইল। সিমলার শোচনীয় পরিবেশ ও প্রভাব ইতোমধ্যেই সর্বসাধারণের বিদিত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একতা বিধানের জন্য যাহারা যত্নবান সিমলার প্রভাব ও পরিবেশ তাহাদের তুলনায় অতিশয় বলশালী। তাই উভয় পক্ষের মিলনের অনুকূল শর্ত সন্ধানের সকল চেষ্টা তাহাতে আহত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।"

উল্লিখিত অংশে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বদলীয় মুসলমান বলিতে নিশ্চয়ই মুসলিম লীগের ভিন্ন ভিন্ন উপদলের কথাই বলিয়াছেন। কারণ ইহার পূর্বে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসী মুসলমান, উলেমা ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে একযোগে কার্য করিতেছিলেন। এইরূপ উদ্ধৃতি পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আর যদি সর্বদলীয় মুসলমান বলিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও তাহাদের সংগঠনসমূহের উল্লেখ করিতে চাহেন, তাহা হইলে নির্বাচন সম্বন্ধে মুসলমান শূন্য কংগ্রেস নিশ্চয়ই যৌথ নির্বাচন সম্বন্ধে দৃঢ়তা দেখাইয়া গোঁড়ামী করিয়াছে বলিতে হইবে। "ভারতের মুসলিম রাজনীতি" পুস্তকে বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ সকল সময় প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন মুসলমানদের বিরোধিতা করিতেন।"

নির্বাচন সম্পর্কে সুভাষের মনোভাব

সুভাষচন্দ্র বোস তাঁহার "ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলস ফর ফ্রিডম" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "মহাত্মাজী একবার আমাকে বলেন, তৃতীয় পক্ষ ভারত ত্যাগ করিলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষে বন্ধু হিসাবে বাস করিবে এবং কাজ করিতে পারিবে।" এইরূপ ধরিয়া লইয়া

গান্ধী সুভাষ বসুকে জিজ্ঞাসা করেন, "পৃথকনির্বাচন সম্পর্কে তাহার কি কোন প্রকার বিরূপ মনোভাব আছে ?" উত্তরে সুভাষ বলেন, "পৃথক নির্বাচন জাতীয়তাবাদের মৌলিক চিন্তাধারার বিরোধী এমন কি এরূপ পৃথক নির্বাচন ধারা মানিয়া লইয়া স্বরাজও তিনি পছন্দ করেন না।"

এরূপ কথোপকথন যখন চলিতেছিল, তখন কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান মহাত্মাজীর সংগে দেখা করিতে যান। তাঁহাদিগের মধ্যে ডঃ আনসারী ও মিঃ শেরওয়ানী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকেও এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে জবাবে তাঁহারা বলেন যে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, যাঁহারা পৃথক নির্বাচন দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের দাবী রক্ষার্থে যদি মহাত্মাজীর সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পৃথক নির্বাচন মানিয়া লন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদিগের, এমন কি মহাত্মাজীরও, বিরুদ্ধাচারণ করিবেন এবং বাধা দিবেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, এইরূপ পৃথক নির্বাচন কেবলমাত্র সমগ্র দেশের জন্য ক্ষতিকারক নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য খারাপ।

গান্ধীর স্বরূপ

তাহার জন্য মহাত্মাজী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একাই দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এই সম্পর্কে "ভারতের মুসলিম রাজনীতি" পুস্তকে বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর প্রথম রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান নিতান্ত দুঃখের বিষয়। অনেকেই সেই সময়ে এইরূপ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্যের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমগণ এবং বৃটিশ সরকার যথেষ্ট আনন্দিত হয়।"

"কংগ্রেসের ইতিহাস" পুস্তকে পট্টভি সিতারামাইয়া লিখিয়াছেন, "ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে লর্ড আরউইন ডঃ আনসারীকে বৈঠকে যোগদান

করিতে আহ্বান জানান নাই। ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন এই প্রসঙ্গে যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন যে ডঃ আনসারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে মুসলমানদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। ইহা নিশ্চিত যে ডঃ আনসারীর মত অপ্রতিদ্বন্দ্বী-নেতার উপস্থিতি, যাহার সমর্থক যথেষ্ট সংখ্যক ছিল এবং যাহার জাতীয়তাবাদী-চিন্তাধারা, স্পষ্টবাদিতা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধী মনোভাব সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদিগের এবং বৃটিশ সরকারের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিত।"

ডঃ আনসারী তখন কংগ্রেস সভাপতি। এরূপ দৃঢ়চেতা স্পষ্টভাষী মুসলমান কংগ্রেস সভাপতিকে বাদ দিয়া একা গান্ধীজীর যোগদান পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ কর্তৃক কংগ্রেসকে হিন্দু প্রভাবান্বিত হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন ও মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন এইরূপ আখ্যা দিবার কারণ। এই বৈঠকেই তাহার সূত্রপাত হয়। গোল টেবিল বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কমিটির মধ্যে "মাইনরিটিজ কমিটি" নামে এক কমিটি গঠিত হয় এবং সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় সংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের আলোচনা হয়; কিন্তু ইহাতে বৈঠক কোনরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারে না। বৈঠক ব্যর্থ হয়। এই অবস্থার অন্তরালে সমস্ত ভারতেই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। নেহরু রিপোর্টে প্রকাশিত দাবী সমূহ আদায় করিবার জন্য যেমন কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভর করিতে থাকে তেমনি মুসলিম লীগও তাহার বিরোধিতা করিতে থাকে এবং সরকারকে জানায় যে নেহরু রিপোর্ট মানিয়া লইলে ভারতে মুসলমানদের অবস্থা কংগ্রেস তথা হিন্দুদের নিকট কৃপার পাত্রে পরিগণিত হইবে। স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনই অবস্থার বিপাকে বৃটিশের দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে। সাইমন কমিশনের উদ্দেশ্য সফল হইল, যাহারা কমিশন বর্জন করিয়াছিল তাহারাই পরোক্ষভাবে কমিশনের উদ্দেশ্যকে কৃতকার্য করিল। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার ফলে শাসক

শ্রেণীর নিকট উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের দৃঢ়তা এমন উলঙ্গ-ভাবে ধরা পড়িল, যাহাতে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত থাকিলেও হিন্দু বলিয়া মনে হইল।

শাসক শ্রেণীর চাল

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া শাসক শ্রেণী উভয় সম্প্রদায়ের নিকট অভিনব ভাবে একটি নূতন চাল দিবার সুযোগ পাইলেন। ভারতে তখন নেতারা নিজ নিজ সাংগঠনিক নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য বজায় রাখিতে এবং প্রচার করিতে ব্যস্ত থাকিলেও পরিবর্তিত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া পুনরায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। সমাধানও প্রায় হইয়া আসিয়াছিল। ঠিক এমনি সময় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত ঘোষিত হওয়ার ফলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে যে বৈঠক চলিতেছিল তাহা ভাঙিয়া যায়। এই সভায় সংখ্যালঘু বলিতে যে সব প্রদেশে হিন্দু এবং শিখরা সংখ্যালঘু তাহাদের নিরাপত্তা, স্বার্থ সংরক্ষণ শাসন পরিষদে সংখ্যা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলিতে প্রায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চলিয়াছিল; কিন্তু সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাটোয়ারা আইন সকল কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করিল।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা

ভারতে ইংরাজের শাসন কালে শাসক শ্রেণীর কর্মতৎপরতায় হউক কিংবা ভারতীয়গণের রাজনীতি ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার অভাবের জন্যই হউক সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে ভাবে এতদিন লালিত পালিত হইতেছিল এবং যাহার প্রতিক্রিয়ার স্ফুরণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে দৃষ্টি গোচর

হইতেছিল, তখন হইতে বৃহত্তর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যাপারে তাহা নূতন নূতন ফল দান আরম্ভ করিল। সকল ভারতীয়ের নিকট এইরূপ অবস্থা যে কতখানি অসহনীয় ও মর্মান্তিক তাহা অনুমান সাপেক্ষ। অতি অল্প দিনের মধ্যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল সরকার এবং মুসলিম লীগ রাজনীতির নিকট অন্ততঃ দুইবার বিপর্যস্ত হইল, আর তাহার প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন পথের ইঙ্গিত করিতে লাগিল। প্রথমে ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সরকার কর্তৃক নেহরু রিপোর্টে উল্লিখিত কংগ্রেস সভাপতি ডঃ আনসারী ও অন্যজাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের বাদ দিয়া গান্ধীজী একাই প্রতিনিধিরূপে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা করিবার সুযোগ। ইহার পূর্বে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কয়েকবার কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান কর্তৃক সরকারবিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যায় সম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষিত হইবার পর ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গুঞ্জন উঠিলেও কোন প্রকার সক্রিয় আন্দোলন হয় নাই। বরং ভিতরে ভিতরে একদল কংগ্রেসী সদস্য এইরূপ ঘোষণাকে কার্যকরী করিয়া ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন।

কংগ্রেসও সংগঠনের পক্ষ হইতে কয়েকটি শর্তের সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানাইয়া কর্তব্য সম্পাদন করে। বাস্তবে এই বাটোয়ারা প্রস্তাব ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে। সরকারী চাকুরী এবং পরিষদে পৃথক নির্বাচনসহ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সাধারণ মুসলমানের মধ্যে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয়। ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। এক দিকে মুসলমান শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। অন্য দিকে পরিষদে মুসলমান সদস্যদের প্রতিপত্তি তৎকালীন মুসলিম সমাজের কতগুলি ব্যাপারে আশু উপকার সাধন করিতেছিল। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংখ্যাও কংগ্রেসের ভিতরে বাহিরে যথেষ্ট

বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং কংগ্রেসের মধ্যে তাহারা বহু দায়িত্বপূর্ণ বিশিষ্ট স্থানসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মেহেতা পট্টবর্ধনের নিম্নলিখিত বক্তব্য হইতে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ ঘোষণা কিভাবে ভারতীয়গণের চিন্তাধারা ও স্বাধীনতাবুদ্ধিকে দুর্বল করিয়াছিল; বৃটিশের ভেদনীতি কি ভাবে দেশের সকল সংহতি বিনষ্ট করিয়াছিল। "এই ঘোষণা বাণীর স্বাভাবিক পরিণতিরূপে ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইল। এই পরিকল্পনার পরিধি ইচ্ছা করিয়াই বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রাদেশিক আইন সভা সমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইল। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারের সহিত দেশীয় রাজন্যবর্গের সমস্যা জড়িত। কাজেই তাহা বিশদ আলোচনা সাপেক্ষে আপাততঃ স্থগিত রহিল। আশা করা হইল প্রতিনিধি প্রেরণের মূল নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে একবার যখন ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইয়াছে তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে সম্প্রদায়সমূহ নিজেরাই একটা সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। নতুন ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইবার পূর্বেই গভর্ণমেন্ট যদি বুঝিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে অপর কোন একটি অনুকল্প ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সিদ্ধান্তের স্থলে সেই অনুকল্প পরিকল্পনাটাই যাহাতে গৃহীত হয় তজ্জন্য পার্লামেন্টের নিকট সুপারিশ করিবেন। সিদ্ধান্তের দ্বারা মুসলমান ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায় পৃথক নির্বাচনের সাহায্যে প্রতি-নিধি প্রেরণের অধিকার লাভ করেন। মারাঠাগণের জন্য বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে। অনুন্নত শ্রেণী সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হয়, তাহাদের জন্য নির্ধারিত আসন তাহাদের নিজস্ব নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। ভারতের খৃষ্টান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

দের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংরক্ষিত থাকে। শ্রমিক সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন কয়েকটি শ্রমিক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরিপূরণীয়। শিল্প ও ব্যবসায় খনি এবং চা বাগানের মালিকদের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি পূর্ণ করিবে চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। জমিদারদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি জমিদার নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারাই পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতের বিশাল জনসমষ্টিকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিবার যে নীতি মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারে গৃহীত হয়, তাহা ব্যাপকতায় ও বিস্তৃতিতে মন্টেগু চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কারকেও অতিক্রম করিয়াছে।

১৯১৯ সালে নির্বাচকমণ্ডলী দশভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; এক্ষণে তাহা সতেরটি আসন অংশে খণ্ডিত। মহিলা ও ভারতীয় খৃষ্টানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হয়। তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র আসন ছাড়িয়া দিবার ফলে হিন্দু সংহতি দুর্বল হইয়া পড়ে। ধর্ম, বৃত্তি ও চাকুরী ভেদে বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। খণ্ডকে খণ্ডিত করিবার সর্ববিধ সম্ভাব্য উপায় অবলম্বনে কোন প্রকার ত্রুটি হয় নাই। স্থানান্তরে লিখিয়াছেন, পাঞ্জাবে শিখদের ওয়েটেজ দিবার জন্য হিন্দুদের প্রাপ্য আসনের অংশ ছাড়িয়া দিতে হইল। অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বৃটিশ, ভারত ও রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের প্রাপ্ত সুখ-সুবিধার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রথমোক্ত পক্ষের প্রাপ্ত অংশ অপহরণ করিয়া শেষোক্ত পক্ষের অঞ্চলে মুক্ত হস্তে ঢালিয়া দিয়াছেন। রাজন্যবর্গ শাসিত ভারতের অধিবাসী সংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা তেইশ ভাগ অথচ যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন পরিষদে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ত্রিশ এবং উচ্চ পরিষদে চল্লিশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার কেবলমাত্র দেশীয় রাজন্যবর্গের, দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের নহে।

এইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন পরিষদে রাজন্যবর্গের মনোনীত সদস্যগণের জন্য শতকরা ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত করা হইল। এক হস্তে প্রদত্ত দানে ও অপর হস্তে অপহরণ করিবার ইচ্ছা হইতে সূক্ষ্মতর কৌশল বোধ করি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।"

নেতাদের ঔদাসীন্য

উল্লিখিত অবস্থা হইতে বোঝা যায় যে বৃটিশ সরকার তাহাদের ভেদ-নীতির সাহায্যে ভারতের ভিভিন্ন সম্প্রদায় সমাজ ও গোষ্ঠীকে কিভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইরূপ ঘৃণিত পরিকল্পনা ও ঘোষণার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের যেরূপ সংঘবদ্ধ বিরোধিতা করা উচিত ছিল, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের সংহতি রক্ষার জন্য সেরূপ আন্দোলন ও স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। অবশ্য গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রায়োপবেশন করেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি এবং উক্তি হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অন্তরালে হিন্দু সংহতি রক্ষার চিন্তাও কিছু কিছু কংগ্রেসী নেতার মনে উদিত হয়। নতুবা ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার বাস্তব চিত্র উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সংহতি নষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতেন না। মুসলিম লীগ সংগঠনের পক্ষে এইরূপ বাটোয়ারা প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন সমূহকে সঙ্গে লইয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কংগ্রেসরই কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেইরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা, যাহারা যৌথ নির্বাচনের পক্ষপাতী অথচ মুসলিম স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন নহে—তাহারাও এইরূপ সরকারী ঘোষণা সম্বন্ধে কংগ্রেসকে উত্যক্ত করেন নাই বা যৌথভাবে কোন সক্রিয় আন্দোলন হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এক শ্রেণীর ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদ ধ্বনিত হইলেও বৃহত্তর অংশ মনে মনে সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিতেছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার কারণ

ঐ সময়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে যতটুকু বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহার জন্য এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব ও কর্মসূচী যে বহু পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। নতুবা এক সময়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মুসলিম লীগের চৌদ্দ দফা সম্বন্ধে শ্বেতপত্র দিবেন বলা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের সহিত আপোষরফা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি দীর্ঘদিন অনশন করিলেও শেষ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্তসমূহ পরোক্ষ-ভাবে মানিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

অনেকেই মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ভারতের মুসলিম লীগ মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের ও মুসলিম রাজনীতিকে এক বিশেষ শক্তির অধিকারী করে এবং তাহার পর হইতে মুসলমানরা নানা-ভাবে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সক্রিয় বিরোধিতা করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায় হিসাবে বৃটিশ আমলের প্রথম হইতে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের মধ্যে হিন্দুমুসলমানের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য উভয় সম্প্রদায় অনুভব করিতে থাকে। মুসলমান রাজত্বকালে কারও কারও মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উদ্ভব হইলেও হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের ও সংঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার প্রথম কারণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রবর্তন ও একই বাদশাহের অধীনে উভয় সম্প্রদায়ের নাগরিকগণের প্রজারূপে অবস্থান। দ্বিতীয়তঃ ইহারি সঙ্গে বাদশাহের স্বার্থ দেশ ও জন স্বার্থের সহিত জড়িত ছিল। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিভাগে হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আধিপত্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তিও বজায় থাকিবার ফলে রাজতন্ত্র ও শাসনকর্তার প্রতি বিরূপ মনোভাবের অভাব।

বৃটিশ আমলে এইরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথম হইতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা সরকারী অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। দেশীয় ও করদ রাজ্যে মুসলিম শাসকের সংখ্যার অল্পতা এবং মুসলমান জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের অবস্থার (সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক) অবনতি ঘটিতে থাকে। আর্য সমাজের কর্মসূচী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রভাব এবং বালগোবিন্দধর তিলকের মত সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতাদের নীতি এবং হিন্দু মহাসভার কর্মপন্থা মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মুসলমান ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চাকুরী প্রাপ্তির ব্যাপারে হিন্দুদের স্বার্থহানির আশংকা এবং বৃটিশ সরকারের ভেদনীতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধি করে। রাজনীতি সম্বন্ধে নাগরিকদের পূর্ণ সচেতনতা না থাকার জন্যেই সাম্প্রদায়িকতা এত বেশী মাথা চাড়া দেয়। দেশের নাগরিকরা যদি শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইত তাহা হইলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হইত। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে, তখনকার ভারতীয় নাগরিকগণ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকিবার ফলে নেতৃকেন্দ্রিক রাজনীতি চলিতে থাকিল এবং তাহাদের ভুল ও ভ্রান্তির মাশুল দিতে হইল জনসাধারণকে।

ভারতীয়দের সমস্যা

সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের সম্মুখে প্রধানতঃ দুইটি সমস্যা নিশ্চল অবস্থায় থাকে। একটি হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্যের সমস্যা অন্যটি বৃটিশের কবল হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার সমস্যা। মুসলিম লীগের সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কের সমাধানকল্পে কংগ্রেস পরিষদে মুসলমানদের বত্রিশাট আসন নির্দিষ্ট করিতে প্রস্তুত হয়, আর সাম্প্রদায়িক

বাটোয়ারার শর্তসমূহ অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে ৩৩টি আসন সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থাসহ সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গণ্য করিবার ব্যবস্থা হয়। এই সম্পর্কে "ভারতের মুসলিম রাজনীতি"র লেখক বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "আমরা যাহা বর্তমানে লক্ষ্য করিতেছি তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, মিঃজিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেসের নিবুদ্ধিতা ও এক-গুঁয়েমী বা জীদের বশবর্তী কার্যকলাপই এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। নতুবা এক সময়ের হিন্দু-মুসলমান সংহতির দূত কি করিয়া বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও বিচ্ছেদের কারণ হইতে পারে? এবং কি করিয়া লীগকে কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে? যতই বৃটিশ এবং মিঃ জিন্নাহর মধ্যে আঁতাত ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে ততই মুসলিমগণ আর্থিক সুবিধা পাইতে থাকে আর হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে, এমনকি জাতীয়তাবাদ বোধের বৃদ্ধি সংকুচিত হইতে থাকে। এই ভাবে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বার্থের বিরোধী হইয়া উঠে।"

জনসাধারণ ও রাজনৈতিক নেতা

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিবর্তন সমাজের বিভিন্নস্তরে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে; দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও শ্রেণীস্বার্থকে কি ভাবে বিচলিত করে। দেশের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারা সকল সময় পরিবর্তন-শীল এবং দ্রুত সঞ্চালনশীল। রাজনৈতিক নেতারা যত শীঘ্র চিন্তার এবং কর্মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। অশিক্ষিত দেশে যেখানে শিক্ষার হার নিম্নতম, নিরপেক্ষ সংবাদ পত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম, সেখানে রাজনৈতিক কর্মসমূহের খুঁটিনাটি বিষয় জনসাধারণের পক্ষে সঠিক

জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই সব কারণেই রাজট
উপনীত হইবার জন্য কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের
রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গ যত শীঘ্র মত পরিবর্তন কর[illegible] পারেন
তত শীঘ্র জনসাধারণের পক্ষে মত পরিবর্তন করা সম্ভব। হবে না ইহাই
স্বাভাবিক। বাস্তবে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এইরূপ জটিল অবস্থা
ভবিষ্যৎ রাজনীতির অধ্যায় সমূহ পূর্ণ করিয়াছে।

নেহরুর মত

পূর্বের উদ্ধৃতিতে ঐতিহাসিক বিনয়েন্দ্র চৌধুরী মুসলমানদিগের মধ্যে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে সম্পর্কে শ্রী জওহরলাল নেহরু "ডিসকভারী অফ ইন্ডিয়া" পুস্তকে (পৃঃ ৩০৪) লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর অপরাপর দেশে যেরূপ জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী এশিয়াতেও সেইরূপ এবং ভারতের এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একই ভাবে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে ও বৃটিশ শক্তিকে বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়। জাতীয়তাবাদী ভারতের অধিক সংখ্যক মুসলমান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদে হিন্দু প্রাধান্য ছিল এবং হিন্দুয়ানী দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করিত। এই জন্য মুসলমানদিগের মনে নানা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেকে এইরূপ জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়াছিল, অনেকে ইহাকে তাহাদের খেয়াল খুশীমত চালাইবার চেষ্টা করিত, অনেকে ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও দূরে থাকিত। এমন বহু কারণ আছে, বহু সহযোগী (Couiibutory) কারণ আছে; দোষ আছে উভয় পক্ষের, ভুল আছে এবং সর্বোপরি বৃটিশ সরকারের ভেদ-নীতি আছে। কিন্তু ইহাদের পিছনে কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও মনস্তাত্বিক বিষয় রহিয়াছে; তাহা মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভবের বিলম্ব, বিশেষ করিয়া ভারতে জাতীয়তাবাদী বিদেশী বিরোধী সংগ্রাম

ব্যতীতও জমিদারতন্ত্র ও বর্তমান যুগের নীতি, আদর্শ এবং দল সমূহের ভিতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইহা ব্যতীত জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও হিন্দু, মুসলমান এবং আরও বৃহৎ দল সমূহের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি বিশেষভাবে জাতীয় কংগ্রেসই করিত এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইহা কতকগুলি পুরাতন ভিত্তির উপর নতুন চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক প্রবাহের মতই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেণীর স্তরের ও চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। হিন্দুদের পক্ষে তাহাদের সামাজিক আদেশ-নির্দেশের কড়াকড়ি জাতীয়তাবাদ বিস্তারে বাধাস্বরূপ হয়; এবং অপর সকল দলকে ভীত করিয়া রাখে। কিন্তু এই সব সামাজিক বাধাবিপত্তি, যাহা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, অতি দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার মত যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইতেছে। মুসলমানদের পক্ষে জমিদার শ্রেণীর প্রভাব এখনও সাধারণের উপর নেতৃত্ব করিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির ব্যাপারে প্রায় এক পুরুষের মত সময়ের তফাৎ এবং সেই পার্থক্য রাজনীতি, অর্থনীতি ও আরও বিভিন্ন দিকে প্রতি-ফলিত হইতেছে আর এই অনগ্রসরতা কিংবা পশ্চাদপদতা মুসলমানদের মনে অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে যথেষ্ট আশংকার কারণ হইয়া উঠে।"

হান্টারের মত

পণ্ডিত নেহরুর এইরূপ উক্তির মধ্যে সত্য আছে অনেকখানি মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির ব্যাপারে কতকগুলি ঐতি-হাসিক ঘটনা বিবেচনার বিষয় এবং তাহাও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অংশ বিশেষ বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ হান্টারের মত অনুযায়ী ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে একটি সম্প্রদায়, যাহারা দীর্ঘদিন রাজত্ব করিয়াছেন; রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে

ক্ষমতা দেখাইয়াছে তাহাদের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক সকল ক্ষেত্রের মান রাতারাতি না হইলেও অতি অল্প দিনের মধ্যে এত নিম্নস্তরে নামিয়া আসিবার কারণ প্রথমতঃ বৃটিশ সরকার কর্তৃক মুসলমান সংগ্রামী শক্তির প্রতি সন্দেহ ও সেইরূপ শক্তিকে ধ্বংস করিবার সকল প্রকারের চেষ্টা; তাহার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারী দফতর হইতে মুসলমানদের অপসারণ ও সাধারণ দফতরে নিয়োগ বন্ধ, বড় বড় মুসলিম জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা, হিন্দু ও দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের মধ্যে সুয়োরাণী এবং দুয়োরাণী সুলভ ব্যবহার। মুসলমানগণ কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ ইংরাজী শিক্ষা বর্জন, জেহাদী ও ওহাবী প্রভৃতি বৃটিশবিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া খিলাফত এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-গুলির এইরূপ মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করিতে বিলম্ব। কিন্তু পরবর্তী কালের ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন মুসল-মানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রসারিত হয় তেমনি নিজেদের স্বার্থ-রক্ষা সম্পর্কে মুসলমান যুবকগণ সচেতন হইতে থাকে। এক দিকে হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের অফিস আদালতে চাকুরীর দাবী, সামাজিক ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থ সংরক্ষণের সংঘর্ষ, অন্যদিকে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের দলীয় মতবাদের সম্মান রক্ষার প্রচেষ্টাই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষের ব্যর্থতার কারণ।

কংগ্রেসের সঙ্গে মতদ্বৈধতা

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ১৯৩২ সালের আগস্টে, কিন্তু তহবিল পাশ করাইয়া লইতে তাহাদের তিন বৎসর সময় লাগিয়া যায়। উহা বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। কংগ্রেস ইতিমধ্যে আর একটি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে এই অধিবেশনে সে

তাহারা স্বাধীন মতবাদ ও অভিমত ব্যক্ত করিতে পারিত কিন্তু বাটোয়ারা গৃহীত অথবা বর্জিত হওয়া সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকার দরুণ তাহা করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন হইয়া গেল; এই নির্বাচনে অন্যান্য আরও অনেক বিষয়সহ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতিও হইল প্রতিপক্ষদের আক্রমণের স্থল। নির্বাচন দ্বন্দ্বে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস জয়ী হইল, কেবলমাত্র বাংলায় নির্বাচিত সদস্যগণ অন্য সকল বিষয়ে আনুগত্য মানিয়া লইলেও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের বিশিষ্ট পথ অনুসরণ করিবার দাবী করিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও বৃটিশ ভেদনীতির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক ফলপ্রসূ হইল এবং সেই ফল হইল প্রবাদবিদিত 'কলহের কনক আপেল'। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি দ্বয়ের মধ্যে আর একবার আপোষের চেষ্টা হয় কিন্তু সার্থকতা লাভ করে না।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রস্তাব

ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩৫ সালের জুন মাসে এবং সেই অনুসারে ভারতবর্ষে নির্বাচন পর্ব শেষ হয় ১৯৩৬/৩৭ সনের শীতকালে। ভারতীয় জনসাধারণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের স্কন্ধে শাসন সংস্কার আরোপ করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া নিখিল ভারত মুসলিম লীগ এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাহাতে উল্লেখ থাকে যে তদন্তগত প্রাদেশিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে এখন কতকগুলি আপত্তিজনক অংশ আছে যাহার দরুন ব্যবস্থাপক সভা তথ্যমন্ত্রী পরিষদের হস্তে প্রকৃত দায়িত্ব বলিতে কিছুই অর্পিত হইবে না। তথাপি যতটুকু সম্ভব তাহাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। পরিশেষে নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া বলা

হইল যে, ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবশালী দেশীয় রাজ্যের তুলনায় বৃটিশ ভারতের মূল স্বার্থের পক্ষে অধিকতর মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর; ভারতের কাম্য ও লক্ষ্য পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনে পৌঁছাইবার প্রয়াস অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত এবং ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে একান্ত অযোগ্য। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মুসলিম লীগ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নিন্দিত ও ধিকৃত হইলেও তাহা মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া নহে। ভারতের লক্ষ্য স্বায়ত্ত শাসনে পৌঁছাইবার প্রয়াস অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা রচিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ভারতীয় স্বার্থের কল্যাণে তাহা গ্রহণযোগ্য হয় নাই। মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ড নির্বাচন-নীতি নির্ধারণ করিয়া এক নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিলেন। ইহাতে লিখিত হইল, "বিভিন্ন আইন সভায় আমাদের প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিবেন :

১। প্রস্তাবিত প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্থানে অবিলম্বে পরিপূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিতে হইবে।

২। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের উন্নতির জন্য বর্তমান শাসন সংস্কার হইতে যতটুকু সুখ-সুবিধা আহরণ করা সম্ভব বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভার মারফৎ তাহা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। পৃথক নির্বাচন প্রথা যতক্ষণ বলবৎ রহিবে মুসলিম লীগ দলের অস্তিত্ব ততক্ষণ সত্যরূপে অপরিহার্য, কিন্তু যে দল বা দলসমূহের লক্ষ্য এবং আদর্শ অনুরূপ তাহার বা তাহাদের সহিত সহজভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে।

নির্বাচন ইস্তাহারে যে কার্যক্রম প্রচারিত হয় তাহার মাত্র দুইটি ধারায় মুসলমানদের বিশিষ্ট স্বার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ক) মুসলমানদের ধর্মগত অধিকার রক্ষা করা।

খ) মুসলমানদের সাধারণ অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করা।

অবশিষ্ট ধারাগুলি ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। যথা—দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, যে সমস্ত বিধান ভারতীয় স্বার্থের তথা জনসাধারণের স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নের প্রতিকূল এবং যদ্বারা দেশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্ভবপর হইবে তাহাদের প্রত্যাখ্যান, দেশ শাসন ও সামরিক বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয়ভার হ্রাস, জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে অর্থ তহবিল গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার, দেশের স্বার্থে কারেন্সী এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি।

নির্বাচনের সময় মুসলিম লীগ প্রদেশ সমূহের প্রতিটি মুসলিম আসনের প্রার্থীদের দাঁড় করান নাই; করিয়া থাকিলে সবগুলি আসন অধিকার করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিটি আসনের জন্য মনোনয়ন করিলেও মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রের মাত্র কয়েকটির জন্য দাঁড় করাইয়াছিলেন।" (খণ্ডিত ভারত পৃঃ ১৬২)

দেশের শিক্ষিত সমাজের একাংশ বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাস লেখকদের অনেকেই লিখিয়াছেন যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত সমূহ কেবল মাত্র মুসলমানদের খুশী করিবার জন্যই বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতের প্রশাসনিক ব্যাপারে এইরূপ আইন মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই নহে হিন্দু, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, শিখ, অনুন্নত শ্রেণী; শ্রমিক, রাজন্যবর্গ ও মুসলিম জমিদার প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে ভারতীয় সংহতি নষ্ট করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। যদি কোন বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় অধিকতর সুযোগ পাইয়া থাকে তাহা হইল এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, শিল্পপতি এবং দেশীয় ও করদ রাজ্য সমূহ। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ব্যতীত শিল্প-পতি, বা দেশীয় করদ রাজ্যের রাজা এবং জমিদার শ্রেণীর শতকরা পঁচানব্বই জনেরও অধিক ছিলেন হিন্দু সদস্য। অনুন্নত হিন্দু এবং শ্রমিকদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যা অপেক্ষাও ছিল অনেক

বেশী। সেইজন্য বলিতে হয় যাহারা প্রচার করেন যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা হিন্দু-স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়াছিল তাহাদের সততা সম্পর্কে স্বভাবতই সন্দেহ করা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তি অনুযায়ী দেশের ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষের জন্য মুসলিম লীগ প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। আর জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস বিরোধিতা করা তো দূরের কথা সদস্য-গণের মতদ্বৈধতার জন্য স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিতে পারে নাই। বাটোয়ারার শর্ত বর্জনও করেন নাই, গ্রহণও করেন নাই। ইহাতে জাতীয়তাবাদী স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হয় এবং সেই জন্যই দেশের শিক্ষিত সমাজের এক অংশের নিকট কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি দারুণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কংগ্রেস ও লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বিরোধী প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবেই উল্লেখ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আসন বণ্টন ব্যবস্থা ভারতের স্বায়ত্ত শাসনকে বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত এবং সেই জন্যই তাহা গ্রহণের অযোগ্য। মুসলিম লীগের প্রস্তাবের মধ্যে পৃথক নির্বাচন প্রথার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়। পাঞ্জাবের অহরর পার্টি এবং বাংলার প্রজাপার্টি এই সময় ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অধঃপতনের ভিত্তি করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং রাজনৈতিক চেতনা লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দলীয় কার্যসূচী গ্রহণ করে। তাহারা কংগ্রেস কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত সম্পর্কে না বর্জন না গ্রহণ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। এই দুইটি মুসলমান রাজনৈতিক দলের নীতি হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে যথেষ্ট উদার পন্থী বলিয়া খ্যাত ছিল। তখন প্রজা-পার্টির নেতা ছিলেন ফজলুল হক। বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়া-ছেন, "জনসাধারণের মধ্যে পাঞ্জাবের অহরর পার্টি এবং বাংলার পার্টীকে ধন্যবাদ জানাই, তাহারা অনেক সময় কংগ্রেস অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করিত। তাহাদিগের কর্মসূচীতে ধর্মীয় সংস্কারের সহিত অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের দাবীও মিলিত ছিল। এই সকল বিষয় হইতে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদিগের রাজনৈতিক মনোভাব এবং কর্মধারা বুঝিতে পারা যায়।" (ভারতে মুসলিম রাজনীতি—পৃঃ ৪৮)

১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও মুসলিম লীগের এবং কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ মীমাংসার চেষ্টাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু সংঘাত সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ তাহার গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী

একদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় হইয়া উঠে অন্যদিকে কংগ্রেসের সহিত মীমাংসায় আসিবার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু তখন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে কোন পক্ষই কোন ক্রমে মীমাংসায় পৌঁছাইতে পারে না বরং উভয়ের মধ্যে পুরোপুরিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; তাহাতেই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার আপত্তিজনক শর্তগুলির বিরোধিতা করা হয়, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি স্যার ওয়াজির হাসান দুঃখ করিয়া বলেন, "ভারতবর্ষ একটি মহাদেশের মত তাহা সকল সময় স্মরণ রাখা উচিত এবং যাহারা এই দেশে বাস করেন সেই হিন্দু এবং মুসলমানগণ অনেক বিষয়ে দুইটি জাতির মত।"

—(মুসলিম ভারত, নোমান পৃঃ ৩২৬)

মওলানা আজাদের সদুপদেশ

ইহার পূর্বেই কংগ্রেস নির্বাচনে সম্মতি জানায়। "ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম" পুস্তকে (পৃঃ ১৩) মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের একদল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে নারাজ ছিল, কিন্তু আমার মত ছিল অন্য রকম, আমি মনে করিয়াছিলাম যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা বিরাট ভুল হইবে। কারণ যদি কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহা হইলে ভারতবাসীর নামে যাহাদের ভারতীয় আইন পরিষদে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে, তাহারাই আসিয়া ভীড় করিবে। ইহা ব্যতীত নির্বাচনী প্রচার কার্যের মধ্যে ভারতীয় জনগণকে ভারতীয় রাজনীতির মৌলিক ধারা সমূহ জ্ঞাত করা সম্ভবপর হইবে। কংগ্রেস সদস্যদের নিকট আমার অভিমত ব্যক্ত করিবার ফলে আশানুরূপ ফল হয় এবং কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।"

এই নির্বাচনে মুসলমানদের মধ্যে পাঞ্জাবের অহরর পার্টি বাংলার প্রজাপার্টি এবং জামিয়ত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ মুসলিম লীগ হইতে পৃথকভাবে জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা লইয়া কংগ্রেসের সহযোগী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশের জমিয়ত উল

উলেমা-ই-হিন্দ মুসলিম লীগের সহিত মুসলিম আসনগুলি সম্বন্ধে একটি শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে কংগ্রেস হিন্দু আসনে মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। বোম্বাই এবং উভয় পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র সদস্যগণ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করে ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও উড়িষ্যা প্রদেশে মুসলিম লীগ একটিও আসন পায় না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে মুসলিম জনসাধারণের উপর তখনও মুসলিম লীগের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারা যথেষ্ট নিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী ছিল। আর সেই কারণেই সারা ভারতে ৪৮৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগের সদস্য নির্বাচিত হয় ১০৮টি। বাংলার প্রজাপার্টি এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টপার্টি মুসলিম আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; আর কংগ্রেস সমস্ত অমুসলমান আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। প্রকাশ্যভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বীকার করেন "মুসলমান আসনগুলিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কৃতকার্য্য হইলেও কংগ্রেস অকৃতকার্য হইয়াছে।" (মুসলিম ভারত পৃঃ ৩৪২)

কিন্তু মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার ফলেই তাহাদিগের পক্ষে মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভবপর হয় না।

মন্ত্রীসভা গঠনের প্রশ্ন উঠিলে প্রথমে কংগ্রেস তাহাতে অসম্মতি জানায়। কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কথা উল্লেখ থাকিলেও প্রাদেশিক গভর্ণরের হস্তে এক বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। যাহার ফলে গভর্ণর জরুরী আইন দ্বারা মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিতে পারিবেন এবং সমস্ত ক্ষমতা

নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই সকল বিষয়ের প্রতিবাদ মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পূর্বেই করা হইয়াছিল কিন্তু তখন কংগ্রেস তাহার সহিত সহযোগিতা করেন নাই; বরং না গ্রহণ না বর্জন নীতির অন্তরালে পরোক্ষভাবে শর্ত সমূহ মানিয়া লইয়াছিল। গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনও কার্যকরীভাবে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সাহায্য করে নাই। মুসলিম লীগও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারায় সকল প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠনে যথেষ্ট বিপত্তি দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে সচেষ্ট হইয়া উঠে; কারণ সরকার ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অপরাপর দলের সহিত যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য পরামর্শ করিতে থাকে। এই অবস্থায় ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় মওলানা আজাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয়। মওলানা আজাদ নিজ অভিমত প্রসঙ্গে বলেন, "ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য এতদিন পর্যন্ত শাসন ব্যাপারে কংগ্রেস দায়িত্বপূর্ণ কোন কার্যের ভার গ্রহণ করে নাই, কেবল মাত্র সমালোচনা করিয়া আসিয়াছে।"

১৯৩৭ খৃস্টাব্দের ৭ই জুলাই কংগ্রেস যে সব প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল সেই সব প্রদেশে তাহার মন্ত্রীসভা গঠন করে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী দল সমূহের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিবার চেষ্টা করে। বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে এমন কি উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন করিবার প্রস্তাব করে—কিন্তু বিফল হয়। স্যার বি, পি, সিংহ রায় (পার্লামেন্টারী গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া পৃঃ ২১৬) লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের পক্ষে এরূপ অবস্থায় যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের আবহাওয়া অনুকূলে থাকিলেও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ লীগের এরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ মন্ত্রীসভা গঠনে শাসনতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী প্রাদেশিক গভর্নরদের মন্ত্রীসভা গঠনে বাধা দিবার কোন কারণও ছিল না।"

যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ড কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়া মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব করে এবং কংগ্রেসের ওয়াদা কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে কংগ্রেসের সকল কার্যসূচী মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। কংগ্রেস এই প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যান করে তাহাই নহে বরং প্রস্তাব গ্রহণ করিবার অনুকূলে যে সকল শর্ত আরোপ করে তাহা মুসলিম লীগের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সংগঠনের হিসাবে মুসলিম লীগ যথেষ্ট অপমানিত বোধ করে। এই সকল কারণেই এখন হইতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসে মধ্যে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। আর তাহারই ফলে ভারতের অগণিত হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট ভোগ করিতে থাকে।

—

চতুর্দশ অধ্যায়

কংগ্রেসের স্বরূপ

কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠন করিবার পর একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড সৃষ্টি হয় এবং সংগঠনের পক্ষ হইতে মন্ত্রীসভার কর্মপ্রণালী তদারক করা এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে মন্ত্রীদের সাংগঠনিক নীতি এবং আদর্শ অনুযায়ী নির্দেশাদি দেওয়াই তাহাদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। উত্তর প্রদেশ মুসলিম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ড এই সময় কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিতে চাহিলে, মওলানা আজাদ মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের ওয়াধা কার্যসূচী মানিয়া লইতে আহ্বান করেন। শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। মুসলিম লীগকে উত্তর প্রদেশ এসেমব্লিতে পৃথক দল হিসাবে সকল কার্য বন্ধ করিতে হইবে।

২। সকল মুসলিম লীগ সদস্যদের কংগ্রেস দলে যোগদান করিতে হইবে।

৩। উত্তর প্রদেশ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ভাঙিয়া দিতে হইবে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়া শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "উপরিউক্ত শর্ত সমূহ বিচার করিলে কাহারও পক্ষে আশ্চর্য হইবার কিছুই থাকিবে না। কারণ এইরূপ অবস্থা কংগ্রেসের সহিত লীগের সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করিবার সামিল। কারণ মওলানা আজাদের শর্ত সমূহ যে কোন সংগঠনের পক্ষে মানিয়া লওয়া অসম্ভব ব্যাপার যদি না সেই সংগঠন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে চায় অর্থাৎ কংগ্রেসের শর্ত সমূহ মুসলিম লীগের পক্ষে মানিয়া লইবার অর্থই হইল লীগ সংগঠনের আত্মহত্যার সামিল।" (ভারতে মুসলিম রাজনীতি ঃ পৃঃ ৪৯)

স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য সর্ব-প্রকার চেষ্টা করিতে থাকে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এইরূপ সম্পর্ক দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। মনে হইয়াছিল লীগ ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত লোপ পাইবে। এরূপ চিন্তা যে রাজনীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ ভুল, তাহা ভবিষ্যৎই সাক্ষ্য দেয়।

মুসলিম লীগ সদস্যের কংগ্রেসে যোগদান

কংগ্রেস তখন লীগকে সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেও কংগ্রেসের ভিতরকার রূপ জাতীয়তাবাদীর মানদণ্ডে সম্পূর্ণ বিচার্য হয় নাই। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদিগের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধেও অধিকতর উদারতা দেখাইতে পারে নাই। এরূপ রাজনৈতিক পরি-বেশের মধ্যে জনসাধারণ এবং মুসলিম লীগ সদস্যরা যথেষ্ট বিভ্রান্ত হয় এবং বহু সংখ্যক মুসলিম লীগ সদস্য মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইহাতে মিঃ জিন্নাহ্ মন্তব্য করেন, "মুসলমানদের মধ্যে, যাঁহারা যত বেশী মুসলমান সমাজের দুষমনী করিতে পারিবেন তাঁহারা ততবেশী কংগ্রেস কর্তৃক পুরস্কৃত হই-বেন।" (ভারতে মুসলিম রাজনীতি : পৃঃ ৩৪৮)

কংগ্রেসের মুখোশ খুলল

যাহারা মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন, তাহাদিগকে নতুনভাবে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য মুসলিম লীগ দাবী জানায়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র হাফিজ মহাম্মদ ইব্রাহীম আইন সভার লীগ সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের টিকেটে পুনরায় মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং মুসলিম প্রার্থীকে পরাজিত করেন। মুসলিম লীগ ব্যতীত অপরাপর

মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল সমূহ কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন করিতে চাহিলে কংগ্রেস তাহাদিগের সহিত যৌথভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সম্মত হয় না। বাংলার প্রজা পার্টি'র প্রস্তাবও কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম লীগের অধিবেশন হয়। তাহাতে কংগ্রেসের এইরূপ মনোভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা হয়। সেই সভায় মিঃ জিন্নাহ্ বলেন, "কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব বিশেষ করিয়া গত দশ বৎসর যাবৎ ভারতের মুসলমানদের সকল ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিবার জন্য দায়ী। এই সংগঠন বিশেষ করিয়া হিন্দু প্রভাবপূর্ণ এবং তাহারা যে ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে সেখানে তাহারা সংখ্যা গরিষ্ঠ, তাহাদিগের বাক্যে, কার্যে এবং কার্যসূচীতে এমন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, মুসলমানরা কোনক্রমেই সুবিচার আশা করিতে পারে না। তাহারা যতটুকু ক্ষমতা পাইয়াছে তাহাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিশেষ প্রকাশ্যভাবেই দেখাইয়াছে যে হিন্দুস্থান হিন্দুদেরই। (যেহেতু পট্টবর্ধন কর্তৃক লিখিত 'ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা।" পৃঃ ৪৩)

মুসলিমদের সমস্যা ও জটিলতা

খণ্ডিত ভারতে (পৃঃ ১৬৭) ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উল্লেখ করিয়াছেন, "হিন্দু কংগ্রেস প্রদেশের পঁয়ত্রিশ জন মন্ত্রীর মধ্যে ছয় জন মুসলমান।" এই ছয়টি প্রদেশে মোট আসন সংখ্যা ৮৮২ তাহার মধ্যে ১৭৪ জন মুসলমান। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৫৮ জন ছিলেন মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্য। দেখা যায় মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বাদ দিলে কংগ্রেসী মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা হয় ১১৬ জন।

আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী মন্ত্রীগণের সংখ্যা প্রায় সঠিক হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র কংগ্রেসী মুসলমানদের মন্ত্রীসভায় স্থান দিবার ফলে বিদ্যাবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দিক হইতে মুসলমানদের

প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট হালকা হইয়া পড়ে। তাহার ফলে তাহাদের উপর কোন প্রকার দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার থাকে না এবং সেই জন্য প্রশাসনিক ব্যাপারে তাহাদের উপর কেহই কোন প্রকার গুরুত্ব দিতে চাহেন না। অর্থাৎ নামকা ওয়াস্তে মন্ত্রী থাকিলেও সমাজের ও সাধারণভাবে দেশের সত্যকার জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাহারা কেবলমাত্র তাহাদের সম্মান গদী এবং চাকুরী বজায় রাখিতে সকল সময় ও সর্ব প্রকারে যত্নবান থাকিতেন। তাহারা মুসলমানদের প্রতিনিধি হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল না। ইহার ফলে সমাজের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মুসলিম সমাজের মধ্যে, বিভিন্ন দল বিদ্যমান থাকায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নানা প্রকার মতবিরোধ দেখা যায়। সকল কার্যের মধ্যে কোনটা সাম্প্রদায়িক, কোনটা জাতীয়তবাদী এইরূপ বিচার কার্য করিবার ফলে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যেমন পার্থক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমেই ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সকল সময় প্রশাসনিক ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয়তাবাদীর প্রশ্ন মীমাংসা করা সহজ হয় না। তাহার ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং সংগঠন ছাড়াও সমাজ-জীবনে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিজীবনে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসী মুসলমান এবং মুসলিম লীগপন্থী মুসলমান বলিয়া পার্থক্য সূচিত হয়। বাস্তবে মুসলমান সমাজের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে মুসলমানদের বেশীর ভাগ দাবীই সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলিয়া হিন্দুদের নিকট বিবেচিত হইতে থাকে। আর কংগ্রেসী মুসলমান মন্ত্রীরা পাছে সংখ্যা গরিষ্ঠদের নিকট সাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচিত হয় সেই জন্য অনেক বিষয়ে তাহারাও চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয় মনে করিতেন। কিন্তু সমস্যাগুলি তাহাদের নিজস্ব গতি ও গুরুত্ব কখনই রুদ্ধ হইতে দেয় না বা লাঘব করে না বরং সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ফীত হইতে থাকে। এমন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা ছিল যাহা অনায়াসেই সমাধা হইতে পারিত; কিন্তু মুসলমান

মন্ত্রীদের ঔদাসীন্য ইহাদের সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য না করিয়া ভিতরে ভিতরে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার সুযোগ করিয়া দিত এবং তাহাই ভবিষ্যতে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপর্যয় আনয়ন করে ও জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করে। এইভাবেই একদিকে মুসলমানদের ও মুসলিম লীগের অভিযোগের পরিধি বর্ধিত হইতে থাকে এবং সমস্যার সমাধান ব্যবস্থাও ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতে থাকে।

কংগ্রেসে কংগ্রেসী মুসলিমদের স্থান হয়নি

মুসলিম লীগ ব্যতীত অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল, যাহারা সকল সময় কংগ্রেসের সহিত এতদিন সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিল এবং যাহারা যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য কংগ্রেসের নিকট অনুরোধ জানাইতেছিল তাহাদেরও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন কাজে গ্রহণ করে না। তাহার কারণ কংগ্রেস নিজস্ব সাংগঠনিক দায়িত্ব স্বতন্ত্র ও বিশেষ কর্মসূচী পালনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিয়াছে একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা লইয়া এবং সুনির্দিষ্ট একটি নীতির অনুসরণে; কাজেই কংগ্রেস কর্মপন্থা এমন কেন সাম্প্রদায়িক নীতির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করিলে, নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রতারিত করা হইবে।) কার্যক্রম যে ভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সাম্প্রদায়িক যুক্তিতে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হইবার অবকাশ মাত্র ছিল না। অবশ্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায় হইতে বিশিষ্ট কোন একটি শ্রেণীর লোক যে তাহার কোন কোন ধারার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারিতেন তাহা নয়। কাজেই কংগ্রেস কর্মপন্থা এমন কোন সাম্প্রদায়িক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হয় না, বিশেষ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত, যাহার মতবিরোধ হইতে পারে। সে কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। কাজেই যে সব মুসলমান তাহা গ্রহণ করে তাহারা অমুসলমান হইয়া

যায় নাই। যাহারা উহা গ্রহণ করিলেন না তাহাদের অপেক্ষা গ্রহণ যাহারা করিয়াছিলেন তাহাদের প্রতি কংগ্রেসের অনুরাগ যে অধিক হইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেস এই কারণে সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট নিয়মতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী একদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, অবশ্য কংগ্রেসের যাহারা সদস্য সেই সব মুসলমানকেই মন্ত্রি পরিষদের জন্য নির্বাচন করা হইল।"

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি। ফলে তাঁহার উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এইরূপ মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে হইলে কংগ্রেসকে তাবৎ মুসলিম লীগের অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর মতে কংগ্রেস তখনও হিন্দুয়ানী ভাবধারায় সম্পৃক্ত; আর মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক দল। ইহাদিগের কোনটাতেই যোগদান না করিয়া একদল মুসলমান বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নাম দিয়া জাতীয়তাবাদী দল সৃষ্টি করিয়া কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল এবং তাহারা যে প্রকৃতই জাতীয়তাবাদী ছিল তাহা পণ্ডিত নেহরু এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা যে সকল প্রকার ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মন লইয়া কেবল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছিল তাহা খাকসার পার্টি; খোদাই খেদমদগার পার্টি, রেড সার্ট দল, ইউনিয়নিস্ট পার্টি, মোমেন পার্টি, অহরর পার্টি ও প্রজা পার্টির ম্যানিফেস্টো হইতে জানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস ইহাদের সহিত যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয় না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করিয়া বলে যে, ইহারা মুসলমান বলিয়াই লওয়া হয় নাই; কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু মহাসভাপন্থীগণের বিরুদ্ধে কোন কথা উঠে নাই। আর সেই জন্যই মুসলিম লীগকে মুসলমানদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য অধিকতর যত্নবান হইতে হইবে। একথাও মুসলিম লীগ হইতে বলা হয় যে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের অন্তরালে হিন্দু মনোভাব পরিলক্ষিত হইবার জন্যই

জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল সমূহ কংগ্রেসের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। হিন্দু স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে না বলিয়া চিৎকার করিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা আছে। কিন্তু মুসলমানদের মত হিন্দুদের আর কোন জাতীয়তাবাদী দল নাই। উপরোক্ত উক্তির মধ্যে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, 'যে সকল মুসলমান কংগ্রেসের কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি কংগ্রেসের অনুরাগ যে সমধিক হইবে ইহা স্বাভাবিক। "এই অবস্থাটাই বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মিঃ জিন্নাহ্ বলেন, 'যে সকল মুসলমান তাহাদের সমাজের প্রতি যতখানি দুষমনী করিতে পারিবে তাহারাই কংগ্রেসের নিকট ততখানি আদরের হইবে।' এই অবস্থাটিকে বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতা ফজলুল হক কিছুদিনের জন্য যখন মুসলিম সংগঠনে যোগদান করেন তখন তাহার কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া বলেন, যে, "আমাকে যখন হিন্দুগণ সমালোচনা করিয়া কঠোর মন্তব্য করেন তখন আমি বুঝিতে পারি যে আমি নিশ্চয়ই মুসলমান সমাজের কোন উপকার করিয়াছি।"

কংগ্রেসী নীতি

শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, কংগ্রেস কোন দলের সঙ্গেই, এমন কি বাংলার প্রজাপার্টি'র মত জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গেও, যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয় নাই। কংগ্রেসের এই নীতি কেবল মাত্র মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নহে। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ কংগ্রেসের এই নীতিকে হিন্দু প্রভাবান্বিত নীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যই কংগ্রেসের নীতি সকল সময় একই নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে নাই বরং পরস্পরবিরোধী ছিল। কংগ্রেস কর্তৃক লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল দল বলিয়া আখ্যা দিবার অধিকার ছিল এবং তাহার সহিত অসহযোগিতা করাও কংগ্রেসের

ইচ্ছা ছিল। পণ্ডিত নেহরুর মুসলমানগণ সাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার প্রস্তাব এবং মওলানা আজাদের উত্তর প্রদেশের মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রতি সহযোগিতার প্রস্তাব ও শর্ত সমূহ দেখিলেই মনে হয় যে কংগ্রেস মনে করিয়াছিল যে মুসলিম লীগ একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে না। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মুসলিম লীগের কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া মুসলমান জনসাধারণের কংগ্রেসে আনয়ন করিবার চেষ্টাই একমাত্র করণীয় ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র সহিত আপোষ নিষ্পত্তির আলাপ আলোচনা চালাইয়াছিলেন। সেই হিসাবে মিঃ জিন্নাহ্‌ একই নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে সহযোগিতা করিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করে লীগকে কোণ-ঠাসা করিবার শেষ উদ্দেশ্য কংগ্রেসের থাকিলে ১৯৩৭ সালই ছিল উপযুক্ত সময়, যখন কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এবং মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল। এ লীগ যখন দুর্বল ছিল এবং কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আবেদন জানাইয়াছিল।"

পুনরায় লিখিয়াছেন "জিন্নাহ্‌ নিতান্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানের মত লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রাজনীতি ক্ষেত্রে সদিচ্ছা ভালবাসা এবং স্নেহ ও শ্রদ্ধা তখনই দেখান উচিত যখন তুমি শক্তিশালী। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস উপযুক্ত হইয়া এবং জয়ী হইয়া এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নাই এবং লীগ যখন সহযোগিতার জন্য অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল তখন একদিকে কংগ্রেস সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে অন্যদিকে কংগ্রেসের সভাপতি গণলীগের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে থাকে। কংগ্রেসের নীতিভ্রষ্টতার উদাহরণ যেমন দেখা যায় তেমনি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।

আসন বিজয়ে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক হার

নবগঠিত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে প্রথমটিতে ৫০ টি আসনের মধ্যে ১৯ টি দখল করে কংগ্রেস আর অন্যান্য মুসলমান দখল করে ৩১ টি আর সিন্ধু প্রদেশে ৬০ টি আসনের মধ্যে ৭টি দখল করে কংগ্রেস এবং ৩৬টি দখল করে অন্যান্য মুসলমান দল। মুসলিম লীগ উভয় প্রদেশে একটিও আসন দখল করিতে পারে নাই; অথচ মুসলিম লীগ সংগঠনই এই দুইটি পৃথক প্রদেশ গঠন করিবার দাবী জানাইয়া কৃতকার্য হয়। ইহাতে মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আর একবার প্রমাণিত হয়। এই দুইটি প্রদেশে কংগ্রেস কিন্তু যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করে।

পূর্বপ্রান্তে আসাম প্রদেশের অবস্থা প্রায় একই রকম। সেখানে কংগ্রেস জয়লাভ করে ৩৩টি আসনে মুসলিম লীগ ৯টিতে আর অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান জয়লাভ করে ২৫টি আসনে। এখানেও কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন ক'রে মুসলিম সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিন জন মুসলমান মন্ত্রী ও একজন হিন্দু-মন্ত্রী গৃহীত হয়। কিন্তু এই তিন জন মুসলমান মন্ত্রীর মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ডঃ খান সাহেব কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। আসাম মন্ত্রীসভার আটজন মন্ত্রীর মধ্যে পাঁচজন হিন্দু ও তিন জন মুসলমান মন্ত্রী গৃহীত হইবার ফলে এখানে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক হার রক্ষিত হয় নাই। মন্ত্রীসভা গঠন ব্যাপারে শ্রী বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন, "যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কংগ্রেস দিতে পারে নাই ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পূর্বে মিঃ জিন্নাহ সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। জিন্নাহ্ সেকেন্দার প্যাক্ট সম্পন্ন করেন—যাহার ফলে ইউনিয়নিস্ট পার্টীর সদস্যগণ

মুসলিম লীগে যোগদান করে। বাংলার প্রজাপার্টীর নেতা মিঃ ফজলুল হক কংগ্রেস নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর নিকট কংগ্রেস প্রজাপার্টীর যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য আবেদন জানান; কিন্তু শরৎ বাবু এইরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইহার ফলে বাংলা প্রদেশেও পাঞ্জাবের মত লীগ প্রজা যৌথ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কংগ্রেস যতই আইন সভায় বিরোধিতা করিতে থাকে ও মন্ত্রীসভা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকে ততই প্রজাপার্টী ও লীগ সদস্যগণ লীগ মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। ইহা সত্য যে বাংলা প্রদেশে মিঃ হক এবং পাঞ্জাবে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান লীগকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেন।

যদি বাংলা প্রদেশে কংগ্রেসের নীতি বুদ্ধিমানের মত পরিচালিত হইত তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে মিঃ হককে মুসলিম লীগে যোগদান হইতে বিরত করা যাইত। কংগ্রেসের নেতৃগোষ্ঠী যখন বুঝিতে পারে না যে সারা ভারতের মধ্যে একা বঙ্গদেশই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের নেতৃত্ব দিতে পারিত, তাহাকে আরও দুর্বল করিতে পারিত এমনকি পাকিস্তানের স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইত। কংগ্রেসের এই ভুল অবশ্য ধরা পড়ে কিন্তু বহু বিলম্বে। কংগ্রেসের সভা মিলনে মুসলমান সমাজ কোন প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হইত না, অন্ততঃপক্ষে প্রজা লীগ দলের নিকট হইতে মুসলমানগণ সতাই যে সকল সুযোগ সুবিধা পাইয়াছিল তাহা হইতে কম হইত না; কিন্তু প্রজা কংগ্রেস মিলনে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা চাকুরী সংগ্রহ ব্যাপারে কোনক্রমেই যোগ্য হিসাবে গণ্য হইতে পারিত না।" (ভারতে মুসলিম রাজনীতি পৃঃ ৫১)

লেখকের লেখার এই অংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য কারণ ইহার মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যাপার ব্যতীত হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রে কংগ্রেসের নীতি জাতীয়তাবাদ নীতি হইতে যে অনেক সময় বাস্তবে দূরে সরিয়া গিয়াছে লেখক তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল ঘটনা মুসলিম লীগের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়।

সরকারী চাকুরী ও মুসলিম সম্প্রদায়

আইন সভার সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্দিষ্ট হইলেও সরকারী চাকুরী ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও বাংলা প্রদেশে মন্ত্রীসভা মুসলমান যুবকদিগের চাকুরী সংস্থান ব্যাপারে অনেকখানি উদারতা দেখান। কিন্তু জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে চাকুরী চাহিলে কিংবা দেওয়া হইবে বলিলেই চাকুরী দেওয়াও যেমন যায় না, তেমনি পাওয়াও যায় না। ১৯৪০ সালের শেষ পর্যন্ত ডাক্তারীতে শতকরা তিনজনও মুসলমান ছিল না। অপরাপর সরকারী চাকুরীতেও শতকরা ১৫ জনের অধিক হয় নাই। তাহাও চাপরাসি পিয়ন ইত্যাদি নিম্নতম কর্মচারী সমেত। কিন্তু আবহাওয়া এমনই বিষাক্ত কলুষিত হইয়া উঠে যাহার ফলে উপরোক্ত মন্তব্য ব্যতীত বিনয়েন্দ্র চৌধুরী তাঁহার পুস্তকে আরও লিখিয়াছেন, "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানগণ এখনও বৃটিশ শাসক-শ্রেণীর অনুগত থাকে এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের রুটিতে আরও মাখন পড়িতে থাকে।" (পৃঃ ৪৮)

অন্যত্র তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন, "যাহাই হউক না কেন মুসলমান জনসাধারণও এরূপ মন্ত্রীসভার নিকট অবহেলিত হয় এবং তাহাদিগের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবহেলিত হইতে থাকে। কেবলমাত্র এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও মুসলমান বাংলায় এ বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতে থাকে।" (পৃঃ ৫০)

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে মুসলমানরা যত না চাকুরী পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন; নতুবা জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার আশংকা থাকে এবং বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু সমাধান ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে

একের স্বার্থরক্ষার জন্য যেমন অপরের স্বার্থক্ষুণ্ণ হইতে পারে তেমনি অপরের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া জাতীয় সংহতি বিনষ্ট করিতে পারে। তখনকার দিনে চাকুরী সংস্থান ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের যথেষ্ট শিরঃপীড়া হয় এবং এ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যত বেশী হয় নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আন্দোলন হয় মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় জীবনের দীর্ঘতম সময় ও শক্তি ইহাতে ব্যাপৃত থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে মুসলমানদিগের এই সকল দাবীর পিছনে যে যুক্তি ছিল তাহা বাস্তব, ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য ছিল কিনা? এ সঙ্গে মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস যে ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন তাহা উদাহরণস্বরূপ এবং স্মরণীয়। বাংলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু নানা কারণে শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। তাহারা শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের অধীনে ত্রিশটি চাকুরী পায় নাই। মিঃ সি, আর দাস একজন বাস্তববাদী লোক ছিলেন এবং তিনি ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে মুসলমানদের সমস্যা অর্থনৈতিক; এবং যতদিন পর্যন্ত না তাহারা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা পাইতেছে ততদিন তাহারা কংগ্রেসে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত না মুসলমানগণ চাকুরী ক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে উপযুক্তহারে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিতেছে ততদিন বাংলায় সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে না। যখনই একবার অসমতা কাটিয়া যাইবে তখনই মুসলমানের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগের প্রয়োজন হইবে না।" (ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' পৃঃ ২০)

শ্রী দাসের এইরূপ অভিমতের আলোচনা করিয়া মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, মিঃ সি. আর. দাসের এইরূপ সাহসিকতাপূর্ণ সত্য প্রচারের পর সারা বাংলার কংগ্রেসের ভিত্তি কাঁপিয়া গেল। বহু কংগ্রেস নেতা শ্রীদাসেরও এইরূপ প্রচারের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শ্রীদাস পাথরের মত কঠিন হইয়া এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা

করেন। সারা দেশ পরিক্রম করিয়া মুসলমানদের মনে তিনি কংগ্রেস সম্বন্ধে গভীর চিহ্ন রাখিতে সক্ষম হন। আমি নিশ্চিত জানি যে অসময়ে হঠাৎ শ্রীদাস মারা না গেলে দেশে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই অনুচররা তাঁহারই বিরোধিতা করেন এবং তাহারই ফলে বাংলায় মুসলমানরা কংগ্রেস হইতে সরিয়া যায় এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ রোপিত হয়। শ্রীদাসের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই আর সেই জন্য সমস্যা যেন আরও দৃঢ়ভিত্তিক হইয়া উঠে। বাস্তবে মুসলমান, খৃষ্টান সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সকল সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখা হইলেও শিখ ও তপশিল প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান খৃষ্টান ও রাজন্যবর্গের স্বার্থও বণ্টিত হয় সম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত সমূহের মধ্যে। এই সাম্প্রদায়িক বটোয়ারার কিন্তু মুখ্যস্থান অধিকার করে হিন্দু ও মুসলমানের সমস্যা এবং তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বর্ধিত করিবার একটি প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে।

ভারতীয়দের লক্ষ্য

বৃটিশ শাসক শ্রেণীর নাগপাশ হইতে ভারতের স্বাধীনতাকে ছিনাইয়া লওয়াই ছিল ভারতীয়দের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করিতে চাহিলেও সে লক্ষ্যবিন্দু হইতে কাহাকেও বিচলিত করিতে পারে নাই। সম্মিলিত শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিভক্ত হয় কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। স্যার বি. পি. সিংহ রায় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, "মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন একটি অতি জরুরী ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য দায়ী। এই অধিবেশনে মুসলিম লীগ স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে তার মত পরিবর্তন করে এবং তাহার পরিবর্তে মুসলমান এবং অপরাপর

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া ভারতে স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানায়।" (ভারতের পার্লিয়ামেন্টরী গভর্মেন্ট, পৃষ্ঠা ২১৯) অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, মুসলিম লীগ কখনও ভারতের স্বাধীনতা চাহে নাই। এরূপ উক্তি ও মতবাদ যে কতখানি বিভ্রান্তিকর হইতে পারে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা বোধ হয় তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসরও পান নাই।

১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত সমূহ ঘোষিত হইবার পর কংগ্রেস কর্তৃক কোন কোন শর্তের কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং সমানভাবে এরূপ বাটোয়ারার প্রতিবাদ করা হয়। হিন্দু-মহাসভা নতুনভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে জীবনীশক্তি ফিরিয়া পায় এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার আদর্শগত সীমারেখা অনেকখানি বিলীন হইয়া যায়। জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি গত্যন্তর না দেখিয়া বাদ-প্রতিবাদে যোগদান না করিয়া চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয় মনে করে। কিন্তু বাস্তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহারা কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকে, অন্যদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে হিন্দ-মুসলমানের সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা চলে। বলা বাহুল্য তখন আপোষ মীমাংসা সম্ভব বলিয়া অনেকেই মনে করিতেন।

নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশগ্রহণ

প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে বাটোয়ারার শর্ত অনুযায়ী সারা ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করে, মুসলিম লীগ ও বেশীর ভাগ মুসলিম আসনে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে। কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসের মত অনুযায়ী মুসলিম লীগ এবং কোন কোন জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন এক যোগে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে।

উত্তর প্রদেশে জমিয়ত উল উলেমায়ে হিন্দ, মুসলিম লীগের সহিত এক যোগে নির্বাচন কার্যে অংশগ্রহণ করে। সমস্ত দেশের মধ্যে সকল মুসলিম আসনে কংগ্রেস প্রতিনিধি মনোনয়ন করে নাই; কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল সমূহ বেশীর ভাগ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের ফলাফল সাধারণভাবে মুসলিম লীগের অনুকূলে যায় না, মন্ত্রীসভা গঠনের সময় কংগ্রেস মুসলিম লীগের সহিত কোয়ালিশন, মন্ত্রীসভা গঠন করিতে রাজী ছিল না। বাংলা প্রদেশে কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগ এবং পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ এবং ইউনিয়নিস্ট পার্টির মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কেবল সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করে। বাংলা এবং পাঞ্জাবে অনায়াসে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারিত কিন্তু কংগ্রেস মুসলিম লীগের মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি উত্তর প্রদেশে স্থানীয় অবস্থার চাপে মুসলিম লীগ এবং জমিয়ত উল উলেমায়ে হিন্দের সদস্যগণকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করিতেও কংগ্রেস অসম্মত হয়। অনেকেই কংগ্রেসের এরূপ মনোভাবকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব বলিয়া মনে করেন।

মুসলিম লীগ কংগ্রেস মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকে নতুন করিয়া জোরদার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উভয়ই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

তপশিলী সম্প্রদায় ও গান্ধীজী

শিখ ব্যতীত হিন্দুদের মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায় এই সময় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, তাহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাত হইতে মুক্ত হইতে চাহে। ইহাদের নেতা হইলেন ডঃ আম্বেদকর। দিল্লী এবং প্রদেশ সমূহে সংগঠনের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইল। ইতিমধ্যে গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের

সম্মানীয় উপদেষ্টার কার্য করিতেছিলেন। সর্বপ্রথমে গান্ধীজী বুঝিতে পারেন যে, তপশীলদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে না পারিলে ভারতের জাতীয় বিপ্লব আত্মঘাতী বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। বর্ণ-হিন্দুরা, যাঁহারা শিক্ষা ও বিত্তের পরিমাপে দেশের শীর্ষস্থানীয় এবং ভারতের নেতৃত্ব করিবার অধিকারী বলিয়া নিজেদের মনে করেন, একদিন তাঁহারা বিপর্যস্ত হইবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অভাব, তপশীল ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অশিক্ষা কুশিক্ষা ও সংস্কার এবং সর্বোপরি অতীতের দীর্ঘদিন ব্যাপী বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার অবিচার ও উৎপীড়নের প্রক্রিয়া দেশের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইতে পারে। তাহারই সুযোগ লইয়া কখনও মুসলিম লীগ কখনও বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে বর্ণদোষে দুষ্ট বলিয়া কোণ-ঠাসা করিতে পারে। এমনকি হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম, মন্ত্র, মত ও পথ বিশ্বাস ও সংস্কারের নীতিগতভাবে পার্থক্য না থাকিলেও বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বর্ণ হিন্দু ও তপশীল দুইটি ভাগে ভাগ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

জিন্নাহ্‌র সংগে আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠতা

এই চিন্তার একমাত্র কারণ হইল যে মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেসের যতই দরকষাকষি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল মিঃ জিন্নাহ্ ততই কংগ্রেসের নানা দুর্বলতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজের অসামঞ্জস্যতা, ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া শিখ এবং তপশীল সম্প্রদায়কে শেষ পর্যন্ত অনেকখানি মুসলিম লীগের পক্ষে টানিয়া আনিয়া মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রচারণার অসারতা বুঝাইতে চাহিয়াছি-লেন। ডঃ আম্বেদকর ও অপরাপর তপশীলনেতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সময় মিঃ জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের সাহায্য

ব্যতিরেকে তপশীল সম্প্রদায় অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কোন উপায় নাই। সেই জন্য ডঃ আম্বেদকর মিঃ জিন্নাহ্‌র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন। বাংলা প্রদেশে মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগ একজন তপশীল নেতাকে স্থান দিয়া অবস্থাটি আরও জটিল করিয়া তোলেন।

গান্ধীর হরিজন আন্দোলন

সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারতের তথা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া গান্ধীজী এই সময় হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু গান্ধীজীর মত একজন পরিপক্ক রাজনৈতিক নেতা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে, ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্যই যে হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাহার হরিজন পত্রিকা মারফৎ যেমন হরিজনদিগের সর্বপ্রকার মান উন্নয়নের ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আলোচনা চলিত তেমনি রাজনীতিও স্থান লাভ করিত। কেবল মাত্র ইহাই নহে তাহার প্রার্থনা সভাতেও একই প্রকারের কর্মসূচী পালিত হইত। তিনি সাধারণভাবে প্রচার করিতে থাকেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতেছে ভারতে 'রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠা করা। পাছে এইরূপ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় আবেদন শুনিয়া মুসলমানরা কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করে। সেই জন্য আল্লাহ্‌ এবং ঈশ্বরের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই তাহাও তাঁহার ভজন গানে প্রচারিত হইতে থাকে।

মুসলিম লীগ এরূপ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ বলিয়া মনে করে। তাহাদের মতে ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, হিন্দুদের অনুকূলে রাখিতে হইলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সংহতি রক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং সেই ব্যবস্থা কার্যকর করিবার জন্যই গান্ধীজী হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ধর্মের নামে ডাক দিলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন শ্রেণীর মানুষ যত শীঘ্র সাড়া দেয় অন্য কিছুতে তেমন সাড়া জাগে না। গান্ধীজীর "রামরাজ্যে"র ডাকেও হিন্দু-সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ উদাত্ত আহবান ছিল। গান্ধীজী কর্তৃক এই আন্দোলনের মাধ্যমে একই সময়ে একই সভায় ধর্ম ও রাজনীতি প্রচার ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া মুসলিম লীগ নেতাগণ বলিতে থাকেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে; প্রথমে কংগ্রেসের স্বার্থরক্ষা এবং তাহার মাধ্যমে হিন্দুদিগের সংহতি রক্ষা করা সম-সাময়িক কালে হরিজন বা তফশীল সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকর পাকিস্তান আন্দোলন ও দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থন করিয়া অনেক সময় বলিতেন যে, ভারতের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা জাতির সংখ্যা নির্ধারণকারী সূত্র।" (ভারতের রাজনীতি পৃঃ ৬৮)

শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "এই সূত্র অনুযায়ী ভারতে বহু জাতি বাস করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ শিখ, অস্পৃশ্য বাঙালী, উড়িয়া, ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ, যে কোন রাজনৈতিক দল, পূর্ব বাংলার ভদ্রলোক, মাড়োয়ারী প্রভৃতি। ইহাদের সকলকেই জাতি বলা যাইতে পারে।"

এরূপ অবস্থায় কাহাকে জাতি বলা যাইতে পারে, জাতির সংজ্ঞা কি? এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন যে কেবল ধর্মীয় এবং ধর্ম সংস্কারের প্রয়াসী চেষ্টা সেকথা বলিলে ভুল হইবে। মুসলিম লীগের মতে গান্ধীজী অনায়াসে "রামরাজ্য" শব্দটি ব্যবহার না করিয়া "ন্যায়রাজ্য" কিংবা অপর কোন উপযুক্ত আদর্শবাচক ধর্মমতনিরপেক্ষ শব্দব্যবহার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, অথচ আল্লা এবং রামের মধ্যে কোন তফাৎ নাই সেকথা বলিবার মধ্যে একদিকে যেমন বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে তেমনি তাহাদের প্রতি, মনের উদারতা প্রকাশের অবসর দিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের

কার্যোদ্ধারের চেষ্টা চলিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে সেদিনকার ভারতবর্ষে এরূপ আন্দোলন যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হইয়াছিল।

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

ডঃ আম্বেদকর এরূপ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন নাই এবং পক্ষেও যান নাই। তিনি মিঃ জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের সাহায্যে তপশীল সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। বৃটিশ সরকারও তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত অনুযায়ী যথেষ্ট শক্তিশালী করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তপশীল সম্প্রদায়ের তেমন কোন উন্নতি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার লক্ষাধিক অনুচর সহ হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এখনও হরিজন সম্প্রদায় সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বর্ণ হিন্দুদিগের অত্যাচার অবিচার হইতে মুক্তি পায় নাই। ভারতের রাজনীতি কখনও ধর্মীয় প্রভাব বর্জিত ছিল না। এবং এখন যাঁহারা রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া প্রচার করেন এবং বাস্তবে প্রয়োগের উপদেশ দেন, তাঁহারা নিজেদের কাজেকর্মে, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায়, সামাজিক ন্যায় বিচার স্থাপনে কোন দিন এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথে কোন প্রমাণ রাখিতে পারেন নাই। অনেক ইতিহাস লেখক, অনেক সাহিত্যিক, অনেক জ্ঞানী-গুণী যাঁহারা মুসলমানদের বৃটিশবিরোধী জেহাদী যুদ্ধকে, ওহাবী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় যুদ্ধ এবং ধর্মীয় আন্দোলন বলিয়া ভারতীয় মুসলমানদিগের ধর্মান্ধতার পরিচায়ক রূপে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের সমর্থনে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর "রামরাজত্ব" প্রতিষ্ঠার আহ্বান জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি এবং বৃটিশবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়। ইহাও হিন্দুদেরকে সংঘবদ্ধ করিবার আহ্বান। কিন্তু মুসলমানগণ পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশের

সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কেবল সময় এবং রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য হেতু এই আন্দোলনসমূহই ছিল দারুল হারবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং বৃটিশের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টা।

কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন

এইরূপ অবস্থার জন্য কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক বিরুদ্ধ মতবাদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রশাসনিক ব্যাপারে নানা প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ উভয় সংগঠন হইতে উত্থিত হয় এবং তাহার প্রতিকার ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটিতে থাকিলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের মধ্যেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়। মিঃ জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসকে যথারীতি হিন্দু সংগঠন বলিয়া আখ্যা দেন। একথাও বলিতে থাকেন যে, হিন্দুদের পক্ষ ব্যতীত কংগ্রেস মুসলমানদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল; মুসলিম লীগ সেই সকল মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক অবিচার ও অত্যাচারের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং যে সকল প্রদেশে মুসলিম লীগ ও যৌথ মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সেখানে কংগ্রেস যথেষ্ট বিরোধিতা করিতে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই কংগ্রেস মুসলিম লীগ দল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা বৃটিশ সরকারকে তোষণ করিয়া নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে, এইরূপ ধরনের প্রচার চালাইতে থাকে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর হিন্দু মহাসভাও আরও দুই একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন বেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। এবং তাহারা যেমন ভারতে "হিন্দুরাজ্য" সৃষ্টির পক্ষপাতী তেমনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষবিরোধী। তাহাদের লক্ষ্য ছিল। যাহাতে মুসলমানরা সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ব্যাপারে উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিতে না পারে মুসলিম লীগ কর্তৃক উত্থিত

দাবীর বিরুদ্ধে পাল্টা দাবীর সৃষ্টি ও প্রচার করাই ইহাদের প্রধান কারণ হইয়া উঠে। মুসলিম লীগ বিরোধী প্রস্তাবগুলি প্রায় ক্ষেত্রে একই রকমের হইত। এইজন্য মুসলিম লীগ দল কথিত গান্ধীজীর "রামরাজ্য" আর হিন্দু মহাভারত পরিকল্পিত "অখণ্ড হিন্দুস্থান" কিংবা হিন্দুস্থানে "হিন্দুরাজ্য" প্রতিষ্ঠার দাবীর পিছনে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইত না। "মুসলিম ভারতে"র লেখক মহাম্মদ নোমান লিখিয়াছেন, "১৯৩৮ সালে পাটনায় মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হয় তাহাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নাহ বলেন যে, কংগ্রেস যে নীতি লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল তাহা তখন ভুলিয়াছে এবং ক্রমেই হিন্দু সংগঠনে পরিবর্তিত হইতেছে। ইহারা পুরাপুরি "ফ্যাসিস্ট" বা "হিন্দুরাজ্য" প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে।" (পৃঃ ৩৬৮)

গান্ধীজীর অহিংসনীতির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ অথবা সাধারণ মুসলমানদের কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কংগ্রেসের বহু নেতা বিশেষ করিয়া সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, পুরুষোত্তম দাস টেন্ডন, আচার্য্য কৃপালনী প্রমুখের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত এবং গান্ধীজীকে তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থক বলিয়া মুসলিম লীগ মনে করিত। ১৯৩৮ সালের ১৫ই নভেম্বর পীরপুরের রাজার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির এক রিপোর্টে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমূহের মুসলমান ও মুসলিম লীগ কর্মীদের প্রতি কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের কর্মীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহু অত্যাচার, অবিচার ও অপমানের বিবরণ প্রকাশ করা হয়, আর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাকে এই সকল কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থক বলিয়া অভিহিত করা হয়। অভিযোগ সমূহ মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে বড় লাটের নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই বলিয়া কংগ্রেস পক্ষ দাবী করেন। এমনকি একজন প্রাদেশিক গভর্নর কংগ্রেসকে এই ব্যাপারে সমর্থন করে। তখন মিঃ জিন্নাহ একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া তদন্তের দাবী জানান, কিন্তু সরকার কর্তৃক এরূপ কমিশন গঠন ব্যাপারে যথেষ্ট

ঔদাসীন্য দেখান হয়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কিছুদিন পরে মিঃ জিন্নাহ্ অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য রয়াল কমিশন নিয়োগের দাবী লইয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু গভর্নমেন্টের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য হইল না।" (খণ্ডিত ভারত : পৃঃ ১৬৯)

উভয় পক্ষের মধ্যে যেমন তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তেমনি শাসন সম্পর্কে নানা অভিযোগ ও প্রতি অভিযোগ ও সেই সকলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নানা প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার উশৃংখলতা প্রকাশ পাইতে থাকে এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশৃংখলতা দেখা দেয়। ঠিক অরাজকতা না হইলেও শাসন-যন্ত্র যেন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব যতই নষ্ট হইতে থাকে সরকারী অফিস আদালতে এর প্রতিক্রিয়া ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ওদিকে ইউরোপীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহা যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। মন্ত্রী-সভার পতনে স্বভাবতই মুসলিম লীগ আনন্দিত হয় এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার সারা ভারতে মুসল-মানরা বিজয়ীর আনন্দ উৎসব পালন করে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

নেহেরু জিন্নাহ্‌ পত্রালাপ

কোন জাতির রাজনৈতিক জীবন ও ইতিহাস সহজ ও সরল নহে। সকল সময়ই সমস্যাসংকুল। তাহা কেবল বিশেষ কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হইতে সময় এবং শক্তি অপচয় করে না বরং বাধার সৃষ্টি করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ নেতাদের মধ্যেও নূতন ধরনের মতবিরোধ দেখা দেয়। তাহারই উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পত্রের উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করিব। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ শ্রী জে, বি, কৃপালনী সম্পাদিত "নেহরু জিন্নাহ্‌ পত্রালাপ" পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পত্রখানি শ্রী নেহরু উত্তর প্রদেশের লীগ সভাপতি নবাব ইসমাইল খাঁকে লেখেন।

ইসমাইল খাঁকে লেখা—জওহারলাল নেহরুর পত্র

নবাব ইসমাইল খাঁ এম, এল, এ
মিরাট

আনন্দভবন, ১০ই নভেম্বর, ১৯৩৭।

প্রিয় নবাব সাহেব,

যেহেতু বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থা দেখিয়া আমি নিতান্ত বিচলিত হইয়াছি, সে জন্য আপনাকে পত্রখানি লিখিবার সুযোগ লইতেছি। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, লেখা হইতেছে কিংবা বলা হইতেছে তাহাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে; তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে, এমন কি কলহ সৃষ্টি হইতে পারে। আমি নিশ্চিত জানি এই সব বন্ধ করিবার আমি যতখানি ইচ্ছা করি আপনিও ততখানি করেন। নির্বাচনের সময় যে সকল বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে সাধারণ সময়ে সেরূপ অতিরঞ্জিত বিবৃতি প্রচার করা হয় না এবং যখন এই সব বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা

হইয়াছে তখনই আমি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এবিষয়ে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছি। বন্দেল খণ্ড ও বিজনৌর নির্বাচনকালে মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে আমি আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বর্তমানে নির্বাচনের উষ্ণতা কমিয়াছে এখন অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিবে। কিন্তু যদি এইরূপ উগ্র বক্তৃতা ও লেখা চলিতে থাকে তাহা হইলে হঠকারিতা ও সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।

আমি জানি না আমাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু; কিন্তু মনে হয় সামান্যই। যাহাই হোক না কেন আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে এক মত হইবেন যে জনসাধারণের কাজ বন্ধ করিতে হইলে সাধারণের মধ্যে আবেদন-নিবেদনের মধ্যে উন্মাদনা বৃদ্ধির একটা সীমা থাকা উচিত। তাহা হইলে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভবপর।

আমি ধরিয়া লইতেছি যে আপনারা মনে করেন যে কংগ্রেস ভুল করিতেছে এবং ভ্রমাত্মক পথ বাছিয়া লইয়াছে। আমি মনে করি যাহাই হউক না কেন এইরূপ সমালোচনা নির্দিষ্ট এবং রাজনৈতিক এইরূপ ধারণা হইলে আমাদের এবং জনসাধারণের মধ্যে বোঝাপড়া কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারে। কংগ্রেসের কোন উদ্দেশ্য নীতি এবং কার্যসূচীর সঙ্গে আপনি একমত নন জানিতে পারিলে কৃতজ্ঞ হইব। আপনি এবং খালিকুজ্জামান জানাইয়াছেন যে কংগ্রেসের ওয়ার্ধা কর্মসূচীর সঙ্গে একমত। কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে প্রস্তাব আপনারা জানেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কলিকাতায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় কৃষ্টি এবং ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রস্তাব সমূহ নিশ্চয় দেখিয়াছেন। ভাষা এবং অক্ষর সম্পর্কে আমার লিখিত আবেদন, যাহা প্রায় সকলের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় দেখিয়াছেন। ইহা হইতেই আমাদের মধ্যে মতৈক্য এবং মতভেদ ধরা পড়িবে এবং সেই বিষয়ে খোলাখুলি আমাদের মধ্যে আলোচনা চলিতে পারে। দেশের শাসন পরিষদ সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব সমূহ আমি

লক্ষৌ যাইয়া আলোচনা করিয়াছি এবং শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু মতভেদ থাকিলেও নীতিগত মতভেদ খুবই কম আছে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি।

এই পত্র লেখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যে সকল বিকৃত বিবৃতি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে প্রচারিত হইতেছে সেই সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যে সকল কাজ ও কথা আপনার পক্ষ হইতে নিন্দা করা উচিত ছিল তাহা আজও হয় নাই। বিশেষ করিয়া মুসলিম লীগের জনৈক কর্মী কর্তৃক একজন মুসলমান কংগ্রেস কর্মীকে ছুরিকাঘাত সম্বন্ধে। অপর প্রকার হঠকারিতা এবং পাশবিক কার্যকলাপও যথেচ্ছা চলিতে থাকে বলিয়া সংবাদ পাইতেছি। এইরূপ উগ্র বক্তৃতা এই ধরনের দুঃখজনক কার্যকলাপ করিতে সাহায্য করে।

বিজনোর নির্বাচনে যে বলা হইয়াছে কংগ্রেস ইসলাম ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক ইহা বিন্দুমাত্র সত্য নহে। একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এইরূপ বিভ্রান্তিকর বিবৃতি নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যুক্ত প্রদেশের মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী একটি নির্বাচন ইস্তাহারে প্রকাশ করেন যে, (১) কংগ্রেস উদু ভাষা উঠাইয়া দিতে চায়। (২) কংগ্রেস তাজিয়া বন্ধ করিতে চাহে, (৩) কংগ্রেস গো জবেহ বন্ধ করিতে চাহে, (৪) কংগ্রেস পায়জামার বদলে সকলকে ধুতি পরিতে বাধ্য করিতে চাহে, (৫) কংগ্রেস উলেমাদের ঘুষ দিয়াছে। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, আমাদের সহকর্মীদের দ্বারা জমিয়ত উলেমার কর্মীদের ঘুষ দেওয়ার কথা অসম্ভব এবং হাস্যকর। নাজিবাদ নির্বাচন কেন্দ্রে 'আল্লাহু আকবর' লিখিত পতাকা আমি ছিঁড়িয়া দিয়াছি, একথাও সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই এবং আমি যেহেতু জনসমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করি আমার মনেও নাই। মৌলানা শওকত আলী বলিয়াছেন যে কংগ্রেসের পক্ষে ভোটদানের জন্য তহশীল-দার পাটওয়ারী মহাজন এবং জমিদারগণ কৃষক ভোটদাতাদের উপর জুলুম করিয়াছে। ইহার মধ্যে সত্য থাকিলে আমি অনুসন্ধান করিব।

ডঃ কে, এম, আশরাফকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহরর কনফারেন্সে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ান, মুসোলিনি ও হিটলারের

মত আমরা সকল ধর্মস্থান ধ্বংস করিব এবং ধার্মিক লোকদের হত্যা করিব। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে মুসলিম লীগ কর্মীগণ গ্রামে প্রচার করিতেছে যে কংগ্রেস মুর্দাবাদ, গান্ধী মুর্দাবাদ, হিন্দুগণ কাফের—উহাদের হত্যা করিলে আমরা বেহেশতে যাইব। গ্রামের লোকদের মধ্যে ইহাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। আমাদের লোকেরা না থাকিলে অশান্তি ঘটিত। এরূপ মিথ্যা এবং ধর্মীয় উত্তেজনাপূর্ণ প্রচার চলিতে থাকিলে লোকদের মধ্যে ক্রোধ বৃদ্ধি পাইবে এবং খোলাখুলি সংঘর্ষ বাধিবে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যবহার। মৌলানা জাফর আলী খাঁ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলারের উত্তেজনাই ছাত্রদের এরূপ কাজে সাহায্য করে। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এবং আপনি কিভাবে দেশের কাজ করিতে পারি? আপনি এবং আমি বহুদিন হইতে জনসাধারণের কাজে লিপ্ত আছি এবং উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করি। আমরা রাজনীতিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করি নাই, আমরা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ কাজে লিপ্ত। নির্বাচন আসিবে এবং যাইবে, কিন্তু এরূপ ঘটিতে থাকিলে জীবনের সকল সুগন্ধই নষ্ট হইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে আমাকে জানাইবেন। আমাদের সংগঠন যথেষ্ট বড় এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা রোধ করিতে আমরা প্রস্তুত।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহরু

নেহরুর পত্রোত্তরে নবাব ইসমাঈল

মুস্তফা ক্যাসেল, মিরাট,
১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আপনার ১১ তারিখের পত্রের উত্তর দিতে দেরী হইল, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার ভদ্রতা যে আপনাকে আমার নিকট পত্র লিখিতে উৎসাহিত করিয়াছে, সে বিষয়ে আমি সজাগ। বর্তমানের ক্রমবর্ধমান

সাম্প্রদায়িক তিক্ততা যে পর্যায়ে পেঁৗছিয়াছে; সে সম্বন্ধে আপনার সুবিবেচিত মত জানিবার সুযোগ দিলেন। দুঃখজনক ঘটনাসমূহ যাহা আপনাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে সে সম্পর্কে আমিও আপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের মুখপাত্র-দের সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন সে সম্পর্কে আমি একমত নহি। কিংবা যে সকল সংবাদ আপনি পাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আপনি আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহা যে স্বার্থপ্রণোদিত দল হইতে পাইয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে যে দ্রুত সমাধানে পেঁৗছিয়াছেন সে বিষয়ে আমার চিন্তা না করিয়া উপায় নাই। তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। কতকগুলি বিকৃত ঘটনার উল্লেখ আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে। আমি নিশ্চিত জানি যে আমাদের দায়িত্বসম্পন্ন কর্মীগণ কখনও এইরূপ উক্তি করেন নাই। কোথায় এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আমাকে জানাইবেন ? নির্বাচনের সময়, যাহাদের সহিত লীগের কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু প্রার্থীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, এইরূপ ব্যক্তিগণও প্রচার-কার্যে যোগদান করিয়া থাকেন আর তাহার জন্য লীগকে দায়ী করা যায় না।

আপনি যথার্থ বলিয়াছেন যে জনসাধারণের কার্যে সকল বিষয়ের একটা সীমা থাকা উচিত এবং অযথা ধর্মান্ধতা কিংবা শত্রুতা সৃষ্টি করা উচিত নহে। কিন্তু আমি একথা বলিতে যথেষ্ট সাহস রাখি যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে সকল মৌলভী এবং প্রচারক মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের কর্মসূচী প্রচার করিতে যান লীগ কর্মচারীদের মত তাহাদের প্রতিও এইরূপ উপদেশের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অহরর নেতাগণ যাঁহারা আজ কংগ্রেসের স্বার্থ দেখিতেছেন তাঁহাদের কোন বক্তৃতা আপনাকে বোধ হয় জানান হয় নাই; কিংবা দেশীয় ভাষায় সম্পাদিত সংবাদপত্র সমূহে, যাহাতে এই সকল নেতাদের বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহা বোধ হয় আপনি পাঠ

করেন নাই। তাঁহাদের কদর্য ও কটুভাষা, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কংগ্রেস কমিটিগুলি প্রার্থীর জয়লাভের অনুকূল বলিয়া সর্বত্র ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করেন। আপনার কর্মীগণ আপনাকে এই বিষয়ে তাহাদের পক্ষে আপনাকে পাইবেন না বলিয়া নিশ্চয়ই আপনাকে বলেন নাই। গত কয়েক মাস যাবৎ জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এবং আরও যাহারা অতি জঘন্য ভাষায় মুসলিম লীগ বিরোধী প্রচার করিতেছেন তাহার লম্বা ফিরিস্তি দিতে চাহি না। যাহা হউক আমি একটি নাটকের কথা—যাহা হিন্দুস্থান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—উল্লেখ করিতেছি এবং তাহার পরিচালক ছিলেন যুক্ত প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। দয়া করিয়া এই পুস্তকখানি আপনি পাঠ করিয়া আপনার মতামত জানাইবেন। সর্দার শার্দুল সিং-এর বক্তৃতা যাহা তিনি পাঞ্জাবে রাজনৈতিক সম্মেলনে দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিবেন, তিনি মিঃ জিন্নাহর ব্যক্তিগত জীবন ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। যদি কংগ্রেসের এইরূপ দায়িত্বসম্পন্ন নেতাগণ অনুরূপ আলোচনা করেন তাহা হইলে সাধারণ বক্তার নিকট হইতে কিছু শুনিতে পাইলে আশ্চর্য হইবার কি আছে? মুসলিম লীগের উচ্চ স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতাগণ যদি অপমানকর আলোচনা করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে মুসলমানগণ কিছু করেন তাহাতে আপনার ভীত হওয়া উচিত নহে। গণতন্ত্রের উন্মেষের সাথে সাথেই বক্তা এবং ভাষণদাতাগণের ভাষা সকল ভদ্রতা ও শালীনতা বোধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। আমি অনায়াসে আরও অনেক ঘটনার কথা বলিতে পারি, কিন্তু তাহার স্বার্থকতা কি? কেবল মাত্র দোষ দেখিলেই জনগণের কার্য হইবে না।

যাহাতে অবস্থা শান্ত হয় তাহার জন্য সাহায্য করুন। আপনি যদি সত্যই ইহার মূলোচ্ছেদ করিতে চান তাহা হইলে অন্যভাবে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি বন্ধ করিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও আপনার সহিত যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিব।

আপনি বিজনৌর ও বুন্দেলখণ্ডের নির্বাচন সম্পর্কে কতকগুলি ইস্তাহারের উল্লেখ করিয়াছেন, আপনি জানেন—সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সাধারণ মানুষের নিম্নতম বৃত্তির নিকট আবেদন জানান হয়। এখনও দুইটি উপ নির্বাচন হইতেছে যাহাতে লীগ অপেক্ষা কংগ্রেস যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেছে এবং উগ্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে গণসংযোগের নামে লীগবিরোধী প্রচার করিতেছে, তাহাতে কোন প্রকার সংঘর্ষ হইবে কিনা বলিতে পারি না।

আপনি যথেষ্ট দয়া করিয়া আমাদের মতৈক্য ও মত-পার্থক্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা ওয়ার্ধা কর্মসূচী অনুসারে আইন সভায় কার্য করিতে প্রস্তুত আছি, তাহা জানা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে যে মতপার্থক্য থাকিতে পারে তাহা আপনার জানা উচিত। সম্প্রতি মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাহার মতবাদ "সারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই তাহার লক্ষ্য" লীগ কর্তৃক এই প্রস্তাব গ্রহণের পরেও যদি মুসলমানদের মধ্যে আপনাদের "গণসংযোগ" ব্যবস্থা চালু না করিতেন এবং সে সকল মুসলিম লীগ পার্টির উপর আক্রমণাত্মক ব্যবহার না করিতেন তাহা হইলে মুসলমানদের কংগ্রেস মতবাদের আজও নিকটে পাইতেন। আমি জানি বহু মুসলমান কংগ্রেস কর্মী, যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহারাও কংগ্রেসের বর্তমান কার্যকলাপে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলেন এবং সেই কারণেই মৌলানা কুতুবুদ্দীন, আবদুল ওয়ালী সাহেব এবং সৈয়দ জাকির আলী সাহেব অন্যভাবে চিন্তা করিতেছিলেন—যাহা আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। তাহাদের মত আপনি গ্রহণ নাও করিতে পারেন কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাহাদের আছে। অনেক চিন্তাশীল মুসলিম বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেস আন্দোলনের দ্বারা মুসলিম সংহতি নষ্ট করিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং এই ব্যাপারে কংগ্রেস মুসলমান সাহায্যকারীগণ কংগ্রেস কর্তৃক যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পান এবং এই সংগঠন বর্তমানে হিন্দুভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত।

আর একটি ঘটনা। মন্ত্রী পদে এমন কয়েকজনকে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহারা দলত্যাগ করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। অবস্থা নিরূপণের সাহায্য হইতে পারে বলিয়া মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

এইভাবে আপনার পত্রে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে আপনাদের প্রস্তাব মুসলমান সম্প্রদায়ের মন হইতে একটি বড় রকমের অভিযোগ সরাইয়া দিতে পারিয়াছে। আপনার উর্দু ভাষা সম্পর্কে রচনাটি পড়িলাম এবং আশা করি সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট ইহা উপযুক্ত আদর পাইবে। মুসলিম লীগ সম্পর্কে যদি কোন অভিযোগ থাকে কিংবা ইহার কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি যেন স্থানীয় মুসলিম লীগ কমিটিকে অবহিত করে। আশা করি এইরূপ নির্দেশ দিবেন।

আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে একজন লীগ কর্মী একজন মুসলমান কংগ্রেস কর্মীকে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল এবং এরূপ কার্যের জন্য কেহ নিন্দা পর্যন্তও করে নাই। আমি বলিতে পারি যে এ বিষয়ে লীগ অনুসন্ধান করিয়াছে এবং জানিতে পারিয়াছে যে এই কার্যের জন্য লীগ কর্মীটিকে যথেষ্ট উত্তেজিত করা হইয়াছিল। এ বিষয়ে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। তাহা ছাড়া ব্যাপারটি যখন বিচারালয়ে আইনের আওতায়। আপনি মনে করেন যে, মুসলিম লীগ সংঘর্ষে সাহায্য করে। ইহার কোন যুক্তি নাই এবং আমি ইহা শুনিয়া দুঃখিত। "ইসলাম বিপন্ন" এই কথাটা মুসলিম লীগের সদস্যগণ কখনও বলেন না। ইহা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কথা, যাহা আমাদের মুখে দেওয়া হইয়াছে। আপনাদের সহকর্মী জমিয়ত উল-উলেমাকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারকে নিন্দা করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমান দ্বারা মওলানা শওকত আলী সম্বন্ধে এবং আমাদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে অভিযোগগুলি তুলনা করিয়া

দেখিবেন। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, যে কংগ্রেস পতাকাটিতে 'আল্লাহু আকবর' লেখা ছিল তাহা একজন কংগ্রেস কর্মীর নিকট হইতে আপনি স্বয়ং কাড়িয়া লইয়াছিলেন। খাজনা আদায়কারী অফিসারগণ কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে যে ভোট সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা মওলানা শওকত আলী কর্তৃক যে উত্থিত নিশ্চয় তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। ডঃ কে, এম আশরাফ নিজেই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন সভায় সংঘটিত ঘটনার জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপনি স্বীকার করিবেন যে ইহার জন্য মুসলিম লীগ দায়ী নহে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছাত্রদের ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দিয়াছেন।

আমি কি জানিতে পারি যে আপনি লিখিয়াছেন সংঘর্ষের মনোভাব বিদ্যমান। ইহা কি মুসলিম লীগের জন্যই হইয়াছে মনে করেন ? ইহা যদি মনে করিয়া থাকেন যে এরূপ পূতিগন্ধ আবহাওয়া আমরা ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। অবশ্য আপনি যদি উপরোক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাহেন যে দেশে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বিদ্যমান তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য এবং দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিতে হইবে তাহা হইলে আমরা আপনার এই ইচ্ছাকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আমাদের সর্বশক্তি দিয়া সম্প্রীতি বজায় রাখিতে আপনাকে সাহায্য করিব।

আপনার বিশ্বস্ত
মুহম্মদ ইসমাইল

ইসমাইলের পত্রোত্তরে নেহরু (২য় পত্র)

আনন্দভবন
২৬শে ডিসেম্বর
১৯৩৭ সাল,

প্রিয় নবাব সাহেব,

আপনি লিখিয়াছেন যে, আমি যেসব সংবাদের কথা লিখিয়াছি তাহা তৎপরতার সহিত বিচার করিয়াছি এবং সংবাদগুলিও স্বার্থান্বেষী

দল দিয়াছিল—ইহা হইতেও পারে। ধীরভাবে বিবেচনা করিলে হয়তো আমার মত পরিবর্তন হইতে পারিত। যে-কোন লোক যতই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হউক না কেন, যাহা দেখেন এবং শোনেন, তাহার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হন। লীগ কর্মীদের সম্পর্কে আমি যত না দেখিয়াছি তাহা অপেক্ষা বহু বেশী শুনিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবে আমার দুঃখের কারণ লীগের প্রচারপত্র এবং আবেদনগুলি সম্পর্কে। এইগুলি ভীষণ সাম্প্রদায়িক এবং কংগ্রেসবিরোধী। রাজনীতির প্রশ্ন বিশেষ নাই বলিলেই চলে। আমার মনে হয় ইহার দ্বারা জাতির সেবা করা হয় না। কারণ রাজনৈতিক চেতনা দলের উন্নতি করিতে পারে। রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান আদর্শগতভাবে অনেক উচ্চে।

এই পত্রখানিও আমি যথেষ্ট ব্যস্ততার মধ্যে লিখিতেছি সেইজন্য আপনার পত্রে উল্লিখিত সকল প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা ব্যতীতও আমার মনে হয় আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিযোগ সমূহ আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা নিজদিগকে মুসলিম লীগের সদস্য বলেন তাহাদের অনেকেই অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইরূপ বহু অভিযোগ আমার নিকট আসিয়াছে। তাহাই বলিতে চাহি।

গ্রাম কংগ্রেস সভায় জাতীয় পতাকা ছিন্ন করা, নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার কয়েকটি আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি। পতাকা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইয়াছে—আমরা মুসলিম লীগ পতাকা ব্যবহার সম্পর্কে কোন প্রকার বাধা দিই নাই।

কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে ইহাতে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে ? এবং হিন্দু মহাসভা এবং শিখ, লীগ, খৃস্টান এসোসিয়েশন তাহাদের নিজ নিজ দলীয় পতাকা প্রকাশ্যে ব্যবহার করিতে পারে ? ইহা সত্য যে এইভাবে জাতীয় সংহতি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তি লাভ করিতে পারে না। বহুদিন হইতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে আদৃত এবং পরিচিত হইয়াছে এবং সবুজ রংটি মুসলমানদের প্রতীক রূপে ও সমগ্র

পতাকাটি ভারতের ঐক্যরূপে ধরা হয়। মওলানা মহম্মদ আলী এবং শওকত আলী অনেক জায়গাতেই এই পতাকা উত্থিত করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামানও লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে ইহা উত্তোলন করিয়াছেন। তিনি এখন মুসলিম লীগ পতাকা কিংবা অপর সকল সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক পতাকা উত্তোলন করিবেন।

এই সকল সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভেদ জাতীয় বিরোধী রাজনীতির অরাজনৈতিক ব্যাখ্যা সমূহ আমাকে দুঃখ দেয়; আমি বুঝি এবং অনুভব করি যে মুসলিম লীগের প্রস্তাবসমূহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বহু নিকটবর্তী। ইহাকে স্বাগত জানাই; কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে ইহা গৃহীত হইয়াছে তাহার সহিত উহার সামঞ্জস্য নাই। পুনরায় বলিতেছি মুসলিম লীগের বহু নেতা (আপনি কিংবা মিঃ জিন্নাহ্ নহেন) আমরা যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম তখন বৃটিশ সরকারের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিতেছিলেন। আমি কি এখন ধরিয়া লইব যে তাহারা এখন স্বাধীনতায় ধর্মান্তরিত এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামী? কংগ্রেস কর্মীগণের উদ্ধত মন্তব্য সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমি মনে করি আপনারা একমত হইবেন যে কংগ্রেস কর্মীগণ এরূপ করে নাই, কিন্তু কোন মৌলভী ও অহরর কর্মী করিয়াছেন তাহার জন্য আমি দুঃখিত। হিন্দি কিংবা উর্দু সংবাদ-পত্র আমি পাঠ করি না এবং তাহাদের উচ্ছাস সম্পর্কেও কিছুই জানি না। ইংরজীতে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্র আছে। তাহারা নিশ্চয়ই মুসলিম-বিরোধী বক্তব্য প্রচার করে কিন্তু তাহা মনে হয় রাজনৈতিক। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুই দেখি নাই এবং কংগ্রেসেরও নিজস্ব কোন সংবাদ-পত্র নাই। অনেক ক্ষেত্রে আমি তাহাদের মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি। কিন্তু তাহাদের আয়ত্তে আনিতে পারি না। আমি সর্দার শার্দুল সিং-এর বক্তৃতা শুনি নাই এবং 'হিন্দুস্থান' পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকও দেখি নাই। গুজরাটি যে পত্রিকায় মিঃ জিন্নার ব্যক্তিগত জীবন লইয়া আলোচনা করা হইয়াছিল, সেই পত্রিকার সহিত আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ না থাকিলেও আমি মিঃ জিন্নার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি।

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। সে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচার চালাইতে চাহে। মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য বিশেষ ছিল না বলিয়া লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর আমি তাহাদের মধ্যে প্রচার চালাইতে বলি। কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান কিন্তু কখন কখন সাম্প্রদায়িক কিংবা দলীয় ব্যাপারে ভুল করে, তাহাকে ঠিক করিবার সকল চেষ্টা করিতে হইবে।

আসন জিতিবার জন্য আমরা নির্বাচন করি। কিন্তু লক্ষ্য আরো উপরের দিকে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধে লোকের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। নির্বাচন সেই সুযোগ দেয়। ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করে। কংগ্রেস কিভাবে মুসলমানদের সংহতি নষ্ট করিতে পারে তাহা আমি বুঝি না। ধর্মীয় কৃষ্টিগত সংহতি বজায় থাকা উচিত; কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে সংহতি বলিতে জাতীয় সংহতিই বোঝায়, সাম্প্রদায়িকতা নহে। সেইভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সর্ব সময়ের কংগ্রেস কর্মী ব্যতীত, হিন্দু-মুসলমান কোন কর্মীকেই অর্থ দেওয়া হয় না; এবং যাহা দেওয়া হয় তাহাও নামমাত্র।

ইদানীং যাহারা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন তাহাদের কাহাকেও মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। মনে হয় হাফিজ মুহম্মদ ইব্রাহিমই আপনার লক্ষ্য। আমার মনে হয় তাঁহার প্রতি আপনি অবিচার করিতেছেন। আপনি বোধ হয় জানেন না যে তিনি বহু দিনের কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস কমিটিতে তিনি দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ওয়ার্ধা কর্মসূচী সম্বন্ধে একমত। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে খুব বেশী মতপার্থক্য নাই। পার্থক্য খুঁজিয়া বেড়ান উচিতও নহে। পার্থক্য মিটাইয়া ফেলাই কর্তব্য। আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহরু

ইসমাইলের নিকট নেহরুর ৩য় পত্র

বোম্বাই
২রা জানুয়ারী ১৯৩৮

প্রিয় নবাব সাহেব,

আশা করি আমার পূর্ব পত্র পাইয়াছেন। আপনাকে পত্র লিখিবার পর কলিকাতার মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে মিঃ জিন্নাহ্ এবং ফজলুল হক যাহা বলিয়াছেন সংবাদ-পত্রে তাহা পাঠ করিলাম। যেরূপ উদ্ধত-ভাবে তাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন সে বিষয়ে আপনি একমত হইবেন কি না জানি না। কিন্তু যেহেতু মিঃ জিন্নাহ্ আমার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন, সেই হেতু দুই একটি কথা বলিতে হইল। সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্য যে বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছি তাহার নকল আপনার নিকট পাঠাইলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত পত্রের নকল—

সংবাদপত্রে রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিলাম যে, মিঃ জিন্নাহ্ আমাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। কেন তিনি এইরূপ চ্যালেঞ্জ জানান প্রয়োজন বোধ করিলেন তাহা বুঝিলাম না। মিঃ জিন্নাহ্ আরও বলিয়াছেন যে কংগ্রেস হিন্দুদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সেই সভায় মিঃ ফজলুল হক মুসলমানদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা যেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকে। যাহারা বাধা দিবে তাহাদের জন্য একটি বড় লাঠির প্রয়োজন। তিনি অদূর ভবিষ্যতে এরূপ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিপদ আছে জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহা হইলে তিনি নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত আছেন। যাহারা দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক নেতাদিগের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়াছেন এবং রাজনীতিতে দায়িত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এরূপ খুনাখুনীর মত উত্তেজনা ও ঘৃণাত্মক সাম্প্রদায়িক উক্তিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বিস্ময়ের ব্যাপার। যাহারা

সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত বোঝাপড়া করিতে চান তাহাদিগকে বাতাসে যুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল মারাত্মক ব্যাপারে কংগ্রেসের কিছুই করিবার নাই। আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দের সহিত লড়াই করিতেছি এবং যতদিন না ভারতের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিতে পারি লড়িব। এই যুদ্ধে আমরা সকলের সহযোগিতা আশা করি এবং সকল শক্তি দিয়া দেশের লোকের সমর্থন ও সদিচ্ছা লাভের চেষ্টা করিব।

মিঃ ফজলুল হকের ভাষা ক্রোধ ও ভীতি সঞ্চারের আর মিঃ জিন্নার ভাষা বন্ধুত্বপূর্ণ। আমার সহকর্মীদের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্নাহকে আমি এ কথা বলিতেছি যে চ্যালেঞ্জ ব্যতিরেকে যে-কোনও বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্কমূলক বিবেচনা পাইবেন। ভারতের যেকোন সমস্যা আমরা একযোগে বসিয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছি। সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে কংগ্রেসের ইহাই ঘোষণা ও নীতি তাহাদের সমর্থন ও সদিচ্ছা লাভের জন্য তাহারা সুবিচার ব্যতীত আরও কিছু পাইতে পারেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, যাহারা ভারতে বাস করেন, তাহাদের সমান স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের ব্যাপারে সমান সুযোগ ব্যতিরেকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন কংগ্রেসের চিন্তার বাইরে। শাসনতন্ত্রে তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ সাধন মৌলিক অধিকারের মধ্যে গণ্য হইবে। ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্তমান সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্ত রহিয়াছে এবং তাহাদের মত ব্যতিরেকে কোনরূপ পরিবর্তন করিতে চাহি না। ইহা ব্যতীত প্রাদেশিক আইন, যাহা কংগ্রেস সভাপতি ও বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ ও মিঃ জিন্নাহর মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াছি। আর কি বাকী রহিল? আর যদি কিছু বাকী থাকে তাহা হইলে আমা-দের বিবেচনা করিতে হইবে।

কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাহা জাতীয় রাজনীতি এবং অর্থনীতি লইয়া যেমন বিবেচনা করে সেইরূপ ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের সহিত জড়িত। মুসলিম লীগের অধুনা প্রস্তাবসমূহে আমি

সম্বর্ধনা জানাই। ইহা সত্যই লীগকে কংগ্রেসের নিকটবর্তী করিয়াছে। তাহাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি সকল কার্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

আমি একথা মিঃ জিন্নাহকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে তিনি যখন কংগ্রেসে ছিলেন তাহা অপেক্ষা বর্তমানে কংগ্রেস অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে; ইহার সদস্য সংখ্যা ৩১ লক্ষ—তাহার মধ্যে এক লক্ষ মুসলমান।

বর্তমানে আমাদের বৃহৎ সমস্যা কি? রাজনীতির দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং স্বাধীনতা, সমাজের দিক হইতে মানুষের জীবন ধারনের মান উন্নয়ন ও আর্থিক উন্নতি সাধন......আমি কি আশা করিতে পারি যে, ইহার পর সাম্প্রদায়িক এবং সংখ্যালঘু প্রশ্নগুলি নিরপেক্ষ হইবে এবং ঘৃণা ও তিক্ততা বৃদ্ধি করিবে না।

জওহরলাল নেহরু

নেহরুর নিকট ইসমাইলের দ্বিতীয় পত্র

মিরাট
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

ব্যক্তিগত অভিযোগ এবং দোষারোপ যে অভিপ্রেত নহে সে বিষয়ে আপনি আমার সহিত একমত জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম...... আপনি লিখিয়াছেন যে মুসলিম লীগের প্রচারপত্রগুলি যে ভূমিকায় রচিত তাহাই আপনাকে মনোবেদনা দিয়াছে। সেই পটভূমিকাকে আপনি নিতান্ত ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক এবং কংগ্রেসবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে ইহার জন্য সকল দোষ কি মুসলিম লীগের ঘাড়ে চাপান ঠিক হইবে? কংগ্রেস কি অস্বীকার করিতে পারে যে মুসলমান জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসের

প্রচার এই সকল দোষ হইতে মুক্ত? কংগ্রেস কি দুইটি উপনির্বাচনে বিখ্যাত মুসলমান মৌলভীদের সম্পূর্ণ কাজে লাগায় নাই এবং মৌলভীরা অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণকে ধর্মীয় বোধ দ্বারা অভিভূত করে নাই? আমাদের বিশ্বাসের দরুন মুসলমানগণ এই সব আলেমদের সম্পর্কে বহু উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নহে বরং তাহাদের ধর্মীয় এবং অধ্যাত্মবাদের সম্মান স্বরূপ। একজন সাধারণ মুসলমান মৌলভী সাহেবদের উক্তিকে সকল ধর্মীয় আদেশ বলিয়া মনে করে। মুসলমান জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী দ্বারা অনুপ্রাণিত করাই যদি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে এই সকল নিষ্ঠাবান ভদ্রলোকদের, যাহারা সকল বিষয়েই ধর্মকে টানিয়া আনেন তাহাদের পরিবর্তে রাজনীতি জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদের লাগাইতে পারিত। কেবল তাহাই নহে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে প্রত্যেক নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির জন্য সব সময় এই সব আলেমদের সাহায্য গ্রহণ করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গত উপ-নির্বাচনের কয়েকটি ঘটনা জানি। সেখানে মুসলিম ভোটার মুসলিম লীগের ভোট দিতে সাহস করেন নাই, কারণ তাহাদের পীর সাহেব এরূপ কার্য করিলে ধর্মচ্যুত হইবার ভয় দেখাইয়াছিলেন।

গত নির্বাচনে হিন্দু, জমিদার, মহাজন কিংবা উকিল, যাঁহারাই হউন না কেন, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। যাঁহারা কয়েকদিন পূর্বে সর্ব প্রকারে কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরোধিতা করিতেছিলেন তাঁহারাই হঠাৎ কংগ্রেসের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক প্রকার প্রচারের জন্যই, যে প্রচারে বলা হয় যে কংগ্রেস সরকার অর্থেই হিন্দু সরকার, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এরূপ সাম্প্রদায়িক প্রদর্শনীর পর সংখ্যালঘুরা যদি তাহাদের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে কি আপনি তাহাদের দোষ দিবেন কিংবা আশ্চর্য হইবেন?

কংগ্রেসবিরোধী প্রচারের জন্য লীগ কর্মীদের আপনি দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু লীগ কি সেই ভাবে কংগ্রেসকে দোষী সাব্যস্ত করিতে

পারে না ? আমি বিশ্বাস করি যে আপনি জানেন যে কংগ্রেস কর্মীরা লীগের সমালোচনা করিতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করে না। কয়েক-দিন পূর্বে মওলানা আতাউল্লা শাহবুখারী জনসভায় লীগকে পূতি-গন্ধময় মৃত দেহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পতাকার বিষয় সম্বন্ধে আমার বলা প্রয়োজন যে কোন মুসলমান সংগঠনই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তাহারা সকল সময় ইহাকে কংগ্রেস-পতাকা বলিয়াই জানে। আমার যতদূর মনে হয় যখন শিখরা ইহার বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন তখন কংগ্রেস সংগঠনের পক্ষ হইতে রং-এর সহিত সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া জবাব দেওয়া হইয়াছিল। আমি জানি না হিন্দু মহাসভা কিংবা খৃষ্টান সম্প্রদায় এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করে কি না।

আমি ভালভাবেই আপনার মনের অবস্থা, কর্মে নিষ্ঠা বুঝিতে পারি এবং সমবেদনা জানাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাব সম্বন্ধে আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমি একটি প্রার্থনা জানাই যে যদি এই সব বন্ধ করিতে হয় তাহা হইলে আপনি কখনই আপনার কল্পিত ধারণার দ্বারা যে সকল ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ এবং বাক্যালাপ নাই তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার নিন্দ-নীয় বাক্য ব্যবহার করিবেন না। অথবা তাহাদের সাম্প্রদায়িক বলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিবেন না। আপনি যথেষ্ট নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে কংগ্রেসে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান সদস্য থাকা সত্ত্বেও এবং কংগ্রেস কর্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষার ঘোষণা ও প্রস্তাব সমূহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইল। আমার মনে হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিশেষ অংশ জাতীয়তাবাদীর ভান করিলেও এখনও তাহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবাবিষ্ট। ইহা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী ভাব নষ্ট করিয়া জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব সৃষ্টি করিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ কর্মপন্থা মাত্র।

আপনি লিখিয়াছেন যে আমাদের গত সংগ্রামের সময় বহু লীগ নেতা বৃটিশ সরকারের পক্ষে যোগ দিয়াছিল, আমি তাহাদের মতবাদ পরিবর্তনের পরও তাহারা এই সংগঠন হইতে পদত্যাগ করে নাই। এইরূপ পরিবর্তিত মতবাদ সম্পর্কেও তাহাদের কোন প্রতিবাদও শোনা যায় নাই। আমার মনে হয় তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। সত্য সত্যই তাহারা স্বাধীনতা এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাসী কিনা তাহা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নহে।

আমি কখনও অস্বীকার করি না যে মুসলমানদের কংগ্রেসী মতবাদে দীক্ষিত করিবার অধিকার কংগ্রেসের নাই। এই প্রকার অধিকার সকল সংগঠনেরই আছে। কিন্তু যাহাতে আমরা বাধা দেই সেই জন্যে কংগ্রেস কর্তৃক যথেষ্ট অর্থ খরচ করিয়া একদিকে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে বাধ্য করা, অন্য দিকে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক সংগঠন বন্ধ করিবার উপর জোর দেওয়া হইতেছে। কিন্তু অপর সম্প্রদায়কে তাহাদের বন্ধ করিতে এ ধরনের চেষ্টা হইতেছে না। আমি বিশ্বাস করি, আপনার স্মরণ আছে, যখন হরিজনদের অনুরোধে তাহাদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তখন মুসলমানরা তাহার সমর্থন জানায়। হিন্দু নেতারা এই প্রশ্নে মুসলমানদের সমর্থনের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ জানায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তখন হিন্দু সংহতি বিনষ্ট করিবার অভিযোগ করা হয়। বর্তমানে মুসলমানরাও কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে সেই প্রকার অভিযোগ করিতেছে।

আমার বিশ্বাস মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্ন সম্পর্কে আমাকে আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি হাফেজ ইব্রাহীমের নাম করি নাই আপনি করিয়াছেন। আমি কি জানিতে পারি যে মুসলিম লীগের টিকিটে কি করিয়া তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী নির্বাচনে প্রার্থী হইয়াছিলেন—যখন কংগ্রেসকর্মীরা কাউন্সিল ত্যাগ করিয়াছেন? তখন তিনি পদত্যাগ করেন নাই কেন? কংগ্রেসের সংগ্রামে তাঁহার অংশগ্রহণ কিরূপ? আমার মন্তব্য অসাধু, আপনি এইরূপ উক্তি

করিবার জন্যই আপনি যতটা নিজের পথ ছাড়িয়া বাহিরে গিয়াছেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য এ-কথার উল্লেখ করিলাম। পত্র শেষ করিবার পূর্বে একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। জানিতে পারিলাম যে সাহারামপুরে কোন কর্মীর প্রশ্নে প্রকাশ্য জনসভায় আপনি বলিয়াছেন যে লীগ সকল প্রকার অশান্তি ঘটাইতেছে। ইসমাইল খাঁ দুইজন মন্ত্রী চাহিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহাতে সম্মত হয় নাই। এ সম্পর্কে আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে কৃতজ্ঞতা সহকারে জানিতে চাহি যে আপনার বিবৃতি কি মত আমার নিকট পৌঁছাইয়াছে কিনা ?

আপনার বিশ্বস্ত
মহাম্মদ-ইসমাইল খাঁ

নবাব ইসমাইলের নিকট নেহরুর ৪র্থ পত্র

প্রিয় নবাব সাহেব,

আপনার পত্রের সম্পূর্ণ উত্তর পরে দিব। কিন্তু আপনার পত্রের শেষের দিকে ভুল বোঝার যে অংশটি রহিয়াছে এখন তাহারই সত্বর উত্তর দিতে চাই। সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল। কোন এক জায়গায় কোন একটি সভায় আমি বাধা পাই। বাধাদানকারীদের অভিযোগ জানিতে চাহিলে তাহারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আমি বলি যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পার্থক্য কোথায় ? এবং কোন কোন বিষয়ে ? তাহা আমি জানি না—জানিতে চাই। আরও বলি যে, নবাব ইসমাইল খাঁ এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামান আমাদের কথা দিয়াছে যে, তাহাদের নিজেদের পক্ষ হইতেও তাহাদের সহকর্মীদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের ওয়াধা কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। এবং আমরা প্রায় চুক্তিবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারে ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

পুনরায় ৫ই ডিসেম্বর তারিখে একটি পত্রের অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের গণসংযোগ কেবলমাত্র মুসলমানদিগের জন্য নহে; তবে নির্বাচনের সময় আমি মুসলমানদের উপর বিশেষ চাপ দিতে বলিয়াছিলাম। তাহাও রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মসূচী অনুযায়ী। মুসলিম লীগের বিরোধিতা করিবার জন্য নহে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা মুসলমান রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ এবং বিখ্যাত আলেমদের সাদর আহ্বান জানাই। যতদূর আমরা জানি কোন কারণেই ধর্মীয় ব্যাপারের উপর গুরুত্ব দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিছু সংখ্যক আলেম কংগ্রেস এবং খেলাফত আন্দোলনে আমাদের সহকর্মী ছিলেন। তাহাদের মতবাদ সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক না হইলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছিল। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন এরূপ বহু আলেমকে প্রার্থী কিংবা সংগঠনকে সাহায্য করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল। তাহা কোন প্রকারেই অস্বাভাবিক ছিল না। আপনার নিকট হইতে প্রথম জানিতে পারিলাম যে কোন কোন মৌলভী যাহারা আমাদের পক্ষে কাজ করিতেছিলেন তাহারা মুসলমান ভোটারদের ধর্মচ্যুতির ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি জানি না কাহারা এই ব্যক্তি কিন্তু ইহা অনুচিত।

বহু ব্যক্তি, যাহাদের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল না, তাহারাও কংগ্রেসপ্রার্থীকে সমর্থন করিয়াছিল। তাহাদের ভালবাসার সহিত হিন্দু সরকার গঠনের সম্পর্ক নাই। মনে করুণ একজন হিন্দু মহাসভা প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে জমিদারদের দ্বারা কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ইহা কোন প্রকারেই সাম্প্রদায়িকতা নহে বরং সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া। নির্বাচনের সময় কংগ্রেস কর্মীরা কোন দোষ করে নাই, যাহা করিয়াছে তাহা অহরর কর্মীরা। তাহারা আমাদের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না।

আপনি যথার্থ বলিয়াছেন যে, বহু হিন্দু যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয় তেমনি বহু মুসলমানও। কিন্তু আমাদের কি করা উচিত? যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ বৃদ্ধি পায় সেরূপ কার্য করিলে সমাজ এবং জাতির ক্ষতি হইবে। আপনি যদি মনে

করিয়া থাকেন যে কংগ্রেস অপর সকল সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র মুসলমানদের উপর নজর দিতেছে তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছেন আমার হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি এবং তাহাকে অকর্মণ্য করিয়াছি। আমরা খৃস্টান পার্শী শিখ এবং ইহুদিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। সেইভাবে মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে—কেবলমাত্র তাহাদিগের শুভেচ্ছা পাইবার জন্য। এই জন্য কাহাকেও যথেচ্ছা অর্থ সাহায্য করা হয় না। কংগ্রেস কোন সময়েই মুসলমান কিংবা অপর কোন সম্প্রদায়ের সংহতি নষ্ট করিতে চাহে না। হাফিজ মহাম্মদ ইব্রাহীম সম্বন্ধে আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। কিন্তু বহুদিন হইতে কংগ্রেসের সদস্য ও স্বরাজ্য পার্টির পক্ষ হইতে আইন সভায় ছিলেন। আমি জানি না কেন তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থী হইয়াছিলেন। একটি কারণ হইতে পারে যে তখন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিশেষ বিরোধ ছিল না।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

জিন্নাহুর নিকট নেহরুর ১ম পত্র লক্ষ্ণৌ
প্রিয় মিঃ জিন্নাহ, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

কয়েকদিন পূর্বে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত আপনার এক বিবৃতি সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছি। আমার মনে হয় যে আমার মূল প্রশ্নটিকে ভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন এবং আপনি যেভাবে লইয়াছেন তাহা সাধারণের সাহায্যে আসিবে না। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে এই সব বিষয়ের যুক্তি ও তর্ক সংবাদপত্রের মারফৎ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনার কলিকাতার বক্তৃতায় আমার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং আমাকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। সেই জন্যই জনসাধারণের সম্মুখে বক্তব্য পেশ না করিয়া উপায় ছিল না।

আপনি বোধ হয় জানেন যে গত কয়েক মাস যাবৎ নবাব ইসমাইল খাঁর সহিত আমাদের মধ্যে যে যে বিষয়ে মিল আছে আর যে যে বিষয়ে পার্থক্য আছে সেগুলি জানিবার জন্য পত্রালাপ করিতেছি—এখনও পর্যন্ত কোন কারণ জানিতে পারি নাই। আপনার বিবৃতি কোন প্রকার সাহায্য করে নাই। আমাদের কলহের বিষয়গুলি জানিতে পারিলে অযথা বাক-বিতণ্ডা, বাদ-প্রতিবাদ বন্ধ করিয়া দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য ও প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিতে পারি।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহরু

নেহ্‌রুর নিকট জিন্নাহ্‌র ১ম পত্র

মালাবার হিলস

বোম্বাই ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩৮

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনার পত্র আমার পক্ষে বুঝিতে পারা কষ্টকর। আপনি কি চান তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ইহা কোন প্রকার কার্যকরী প্রস্তাবেরও উল্লেখ করে না, কেবল মাত্র আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রশ্নটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার বক্তব্য—যাহাতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলাম ও আপনি তাহার উত্তরে সংবাদ পত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। আমার যে বক্তৃতায় আপনাকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলাম আপনি আমাকে তাহার সারাংশও পাঠান নাই এবং চ্যালেঞ্জটি কি প্রকারের ছিল, যাহার উত্তর পত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও লেখেন নাই। শেষ পর্যন্ত আপনার অনুরোধে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের কলহের বিষয় কি তাহা আপনাকে জানাইতে হইবে। সংবাদপত্র মারফৎ এই সকলের যুক্তি তর্ক না করার প্রসঙ্গে আপনি আমার সঙ্গে একমত হইয়াছেন

জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে এই সকল বিষয় লইয়া পত্রালাপে আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। অতএব ইহাও সমভাবে অনভিপ্রেত। গান্ধীজীর উত্তর পাইয়াছি এবং তাঁহাকেও উত্তর দিয়াছি।

আপনার বিশ্বস্ত

এম. এ. জিন্নাহ্

জিন্নাহ্র নিকট নেহ্রুর ২য় পত্র

ওয়ার্ধা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্,

আমার পূর্ব পত্র আপনার পক্ষে বুঝিতে কষ্টকর জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের মধ্যে পার্থক্য এবং মিলের বিষয়গুলি জানিতে চাওয়াই আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য ছিল। মনে হয় পার্থক্য নিশ্চয় আছে, কারণ আপনি প্রায় কংগ্রেসের নীতি কর্মসূচী সম্পর্কে সমালোচনা করেন। লিখিতভাবে এগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বুঝিতে সহজ হয়। মনে হয় ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অহেতু ভীতির কারণে ঘটিতেছে। এই অহেতু ভীতি দূরীভূত করা যায়। ইহা হইতে পারে যে কতকগুলি কারণ মৌলিক এবং তাহাও আমাদের জানা দরকার এবং সমাধান ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে হইবে। যখন মতবাদের সংঘর্ষ তখন বিরোধী পক্ষের মত জানার বিশেষ প্রয়োজন। কোন একটি বক্তৃতায় আপনি বলিয়াছেন যে কোন ভদ্র লোক কংগ্রেসকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক দিয়াছে। এবিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞাত। যাহা জানি তাহাতে বহুদিন যাবৎ কেহ পাঁচ হাজার টাকারও চেক দেয় নাই। আরও বলিয়াছেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় কর্তৃপক্ষ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং অনেক ছাত্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেহ এই আন্দোলনে

যোগ দেয় নাই। কিন্তু সত্যই অনেক ছাত্র যোগদান করিয়াছিল। ইহার ফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাশী বিদ্যাপীঠ ও গান্ধী আশ্রম সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে আলিগড় প্রথমে জামিয়া ও পরে দিল্লীতে চালু হয়।

আপনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে কংগ্রেস হিন্দী, হিন্দুস্থানী ভাষা চালু করিয়া উর্দু ভাষা ধ্বংস করিতে চাহে। আমার মনে হয় আপনি ভুল সংবাদ শুনিয়াছেন। কংগ্রেস উর্দুর ক্ষতি করিতে চায় তাহা আমি জানি না। কিছুদিন পূর্বে আমি 'ভাষার প্রশ্ন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার বিশ্বাস তাহাই কংগ্রেসের মত বলিয়া মনে করি। ইহা গান্ধীজীও অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক নাই কিন্তু উর্দু ভাষার উন্নয়ন আশা করেন এরূপ ব্যক্তিরা, এমনকি হায়দ্রাবাদের আঞ্জুমানে তরক্কি উর্দুর সম্পাদক মৌলভী আবদুল হক অনুমোদন করিয়াছেন। আপনার অবগতির জন্য রচনাটি পাঠাইতেছি, সমালোচনা আশা করি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী সেখানকার বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং জামিয়া মিলিয়া প্রাথমিক পুস্তক সকল রচনা করিতেছেন। এই পুস্তকগুলি দেব নাগরী ও উর্দু অক্ষরে লিখিত হইবে। ছাত্ররা যে-কোন অক্ষরে পড়িতে পারে। কিভাবে অহেতুক ভীতির সঞ্চার হয় তাহা দেখাইবার জন্য ইহা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সত্যকার বিষয়গুলি আরও বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আশা করি আপনি সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ জানেন। আপনি যদি চান আমি পাঠাইতে পারি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের অবস্থা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাবে কংগ্রেসের নীতি সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ কিংবা এই গুলিতে ভুলও থাকিতে পারে। তাহা যদি হয় সংশোধনের জন্য আপনার পরামর্শগুলি আনন্দের সহিত বিবেচনা করিব। ধর্মীয় এবং কৃষ্টিগত ব্যাপারে কংগ্রেসের করণীয় আর কি থাকিতে পারে তাহা আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝিতে পারি না। রাজনীতি ক্ষেত্রে

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অসন্তোষজনক, যতদিন না বিভিন্ন দলের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া ইহার পরিবর্তন সাধন করা যায়, ততদিন গ্রহণীয়।

আইন সভা এবং বাইরে আমাদের বর্তমান নীতি যাহা ওয়ার্ধায় সংক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগের নবাব ইসমাইল খাঁ ও চৌধুরী খালিকুজ্জামান গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে স্বাধীনতা, আইন সভা গঠনের দাবী, শাসনতন্ত্র ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়ক নীতি সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বর্ণিত আছে। ইহাতে দেশের শ্রমিক ও কৃষি সম্বন্ধে কার্যসূচীও উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতেই মনে হয় বহু বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে মিল আছে। কেবল-মাত্র মৌলিক ব্যাপারেই নহে ব্যাপকভাবেও রহিয়াছে।

এই সকল মতৈক্য সত্ত্বেও বহু মতভেদ আছে দেখিয়া আমার দুঃখ হয়। ইহা সত্ত্বেও আপনার বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমার মনে এমন বহু বিবৃতির বিষয় মনে হয় যাহাতে বোঝা যায় কংগ্রেস হিন্দুরাজ্য সৃষ্টি করিতে চাহে। কিভাবে এবং কে এইরূপ করিতে চাহে সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। যদি কংগ্রেস কি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা এরূপ করিতে চাহে তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দিবেন। কিছু দিন পূর্বে মওলানা আজাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি সংখ্যালঘু সম্বন্ধে আমাদিগের সকলের অপেক্ষা কংগ্রেসের মতবাদ ভালভাবে বুঝাইতে পারেন। যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই আমরা আলোচনার জন্য মিলিত হইতে পারি।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

নেহরুর নিকট জিন্নাহ্‌র ২য় পত্র

নিউ দিল্লী
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল,

সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত আমার পক্ষ হইতে আপনার প্রতি ব্যবহৃত "চ্যালেঞ্জ" শব্দটি সাংবাদিকের কল্পনা মাত্র। কারণ যে অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে ইহা

নিমন্ত্রণ মাত্র। আপনি যে মতবাদের কথা লিখিয়াছেন, ঐ সকল প্রশ্ন যদি জনসাধারণের সম্মুখে আলোচনা না করিয়া গোপনভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে কি ঐ সকল প্রমাণ করিতে পারিবেন? আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা জনসাধারণের সম্মুখেই বলিয়াছি। তাহার সত্যকার রিপোর্ট পাইলে আমি সকলের সম্মুখেই প্রমাণ করিতে পারি। আপনার পত্রে উল্লেখিত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা আপনার পূর্ব পত্রের পুনরুল্লেখ মাত্র। যাহা আমি পত্রালাপের মাধ্যমে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক এবং অনুচিত বলিয়া মনে করি। একত্রে বসিয়া আলোচনা করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করি। যখনই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করিবেন তখনই একত্রে বসিতে এবং আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনারা একে অপরকে অভিযুক্ত করিবেন আর আমি আমার কথা প্রত্যক্ষ শুনাইব। আপনি নিশ্চিত জানেন এবং এটা আপনার জানা উচিত যে কলহের মৌলিক বস্তু কোনগুলি এবং তাহা কি প্রকারের।

আপনার বিশ্বস্ত

এম, এ, জিন্নাহ্

জিন্নাহ্‌র নিকট নেহ্‌রুর ৩য় পত্র

বোম্বাই

২৫শে ফেব্রুয়ারী

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ,

আমি জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে আপনার কলকাতার বক্তৃতা সংবাদ পত্রে ঠিক মত প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু কোন অংশের ভুল আছে এবং সেই ভুল সংশোধনের কোন চেষ্টাও করেন নাই। আপনার নিকট হইতে এই সম্পর্কে সত্য বিবরণ জানিতে পারিলে আপনি কি চান এবং আপনার লক্ষ্য কি তাহা বুঝিতে সাহায্য হয়।

বুঝিতে পারিলাম যে আমি নবাব ইসমাইল খাঁ এবং চৌধুরী খালেকুজ্জামানের সহিত যে সকল পত্রালাপ করিয়াছি তাহা জানিতে

চাহেন না। তাঁহারা আপনার মতবিরুদ্ধ কোন কার্য করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বর্তমান মুসলিম লীগের রাজনীতি এবং সাম্প্রদায়িক নীতি কিরূপ এবং কংগ্রেসের সহিত পার্থক্য কোথায় তাহা জানিবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলাম। গত বৎসরের পর লীগ তাহার লক্ষ্য এবং অর্থনীতি পরিবর্তন করিয়াছে এবং সেই ভাবেই কংগ্রেসের নিকটবর্তী হইয়াছে। সত্যকার পরিবর্তনগুলি কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমি উদগ্রীব। এ গুলি জানিতে না পারিলে লীগের বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আমি যে লিখিয়াছিলাম আপনার কলিকাতার বক্তৃতায় আমাকে "চ্যালেঞ্জ" করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবেও কি এইরূপ সমালোচনার প্রমাণাদি জানিতে পারি না। আপনি লিখিয়াছেন যে এরূপ নির্দেশ আমি মানিয়া লইতে পারি না, আরও লিখিয়াছেন যে, "আমার নিকট প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে প্রমাণ করিবার মধ্যে তফাৎ কিছু নাই, যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক মত প্রকাশিত হইলে আমি প্রকাশ্যেই প্রমাণ করিতে পারিব।" আমার পত্রখানি আর একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি কোথাও এইরূপ নির্দেশ দিই নাই। ইহা আপনার কল্পনা মাত্র। আপনার সমালোচনার প্রকাশ্য প্রমাণ পছন্দ করি। কিন্তু আপনি যখন সংবাদ-পত্রে এ বিষয়ে কিছু লিখিতে চাহেন না তখনই আপনাকে গুপ্তভাবে প্রমাণ করিতে বলিয়াছিলাম আপনি যদি কংগ্রেসের কোন প্রকার সমালোচনা না করিয়া থাকেন এবং সংবাদ-পত্রে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রমাণের প্রশ্নই উঠে না। সংবাদের প্রতিবাদ প্রয়োজন। যদি সমালোচনা করিয়া থাকেন, যাহা মনে হয় করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রকাশ্যেই হউক কিংবা গুপ্তভাবেই হউক আপনাকে প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিব। ব্যক্তিগত-ভাবে প্রমাণ করাই পছন্দ করি। আমি ভীত কিন্তু আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব সত্যকার মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। সেই জন্য আপনার নিকট এসব জানিতে চাহি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত

কোন প্রকার সাহায্য পাই নাই। নিশ্চয়ই সুযোগ আসিলে আমরা সাক্ষাৎ করিব। আমি সভাপতি সুভাষ বোস কিম্বা মৌলানা আজাদ কিম্বা ওয়ার্কিং কমিটির আর কেহ সুযোগ পাইলে সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু আমাদের যখন সাক্ষাৎকার হইবে তখন কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে? দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা, যাঁহাদের পিছনে এক একটি সংগঠন আছে তাঁহারা, বাতাসে আলোচনা করিতে পারে না। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তাহারা পরিষ্কার বিবরণ এবং তাহার কি লক্ষ্য ইহা জানার প্রয়োজন নতুবা বিষয়টি ঠিকমত বিবেচিত হয় না। ১৯৩৫ সালে বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের সহিত আপনার যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, সেরূপ হইলে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। সেই জন্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তথ্য জানা প্রয়োজন। আশা করি আপনি তাহা জানাইবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহরু

নেহ্রুর নিকট জিন্নাহ্র ৩য় পত্র

নিউ দিল্লী

৩রা মার্চ, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল,

আপনার পত্রে ক্রমে ক্রমে পরোক্ষভাবে একই ধরনের তুচ্ছ ব্যাপার সমূহের উল্লেখ দেখিয়া দুঃখিত। ইহাতে আমাদের বর্তমান সমস্যার অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা ও মিলন সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় উদ্ভূত হইতে পারে না। আপনি আপনার পত্রে কলহের বিষয়সমূহ উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন। ঐ বিষয়গুলি আমাকেই বলিতে হইবে এবং আপনার বিবেচনার জন্য পাঠাইতে ও পরে পত্রালাপে আলোচনা হইবে উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থা যে বাঞ্ছনীয় এবং যথার্থ নহে তাহা পূর্বেই জানাইয়াছি। এরূপ ব্যবস্থা দুইটি বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের উকিলের সাহায্যের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা ঠিক নহে।

আপনি যখনই বলেন যে সত্য-সত্যই কলহের বিষয়সমূহ আপনি জানেন না, তখনই আপনার অজ্ঞতার জন্য বিস্ময় বোধ করি। এই বিষয়টি ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দেশের উচ্চ স্থানীয় নেতাদের মধ্যে আলোচিত হইতেছে কিন্তু তখনই তাহার সমাধান হয় নাই। আপনাকে এই সমস্ত জানিবার জন্য আবেদন করিতেছি। আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব গ্রহণ করিবেন। আপনি যদি সত্যই আগ্রহান্বিত হন তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট না করিয়াও বুঝিতে পারিবেন—কারণ কলহের বিষয়গুলি সকল সময় সভা সমিতি ও সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশিত হইতেছে।

আপনার বিশ্বস্ত

এম, এ, জিন্নাহ্

জিন্নাহ্‌র নিকট নেহ্‌রুর ৪র্থ পত্র

এলাহাবাদ

৮ই মার্চ ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্,

দুঃখের বিষয় আমাদের পত্রগুলি পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ে লেখা হইতেছে। আমি যতবারই বিষয়গুলি বলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি আপনি ততবারই পত্রালাপে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া জোর দিতেছেন। সাথে সাথে উল্লেখ করিয়াছেন কলহের বিষয়সমূহ সকল সময় সংবাদপত্র এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছে। আমি সতর্কতার সহিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং আপনার বক্তৃতা পাঠ করি। আপনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় যাহা সমালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে আমি কতকগুলি বাছিয়াছি। আপনার উত্তরে লিখিয়াছেন যে রিপোর্ট সত্য নহে, অথচ সত্য রিপোর্ট কি হইবে তাহা জানান নাই। আপনি আমার অসুবিধা বুঝিতে পারেন। তুচ্ছ ব্যাপার সমূহ যাহা প্রকৃত সমস্যা জানিতে দিবে না তাহা উল্লেখ করা আমার ইচ্ছা নহে। কিন্তু সব সত্ত্বেও ব্যাপারগুলি কি? ইহা হইতে

পারে হয় আমি অন্ধকারে নতুবা সমস্যাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিহিত নহি। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমার জানা উচিত। ইদানীং এরূপ কোন বিবৃতি যাহা সংবাদপত্র কিংবা সভায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানাইলে আমি বাধিত হইব। পত্রালাপে মতবিরোধ সৃষ্টি করা আমার ইচ্ছা নহে, কেবল মাত্র আলোচনার প্রকৃত বিষয়সমূহ এবং কলহগুলি জানিতে চাহি। জাতীয় সমস্যা স্থির করা এবং তাহার আলোচনার সাহায্যের জন্যই ইহার প্রয়োজন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমরা প্রায়ই এরূপ পথ গ্রহণ করিয়া থাকি।

আপনি ঠিক বলিয়াছেন যে ১৯২৫ সাল হইতে পুনঃ পুনঃ এই ব্যাপারগুলি লইয়া মাথা ঘামান হইতেছে। আপনি কি মনে করেন না যে সেই জন্যই বিষয়গুলি ঠিকমত জানিয়া কি করা উচিত তাহা ঠিক করা প্রয়োজন। কোন প্রকারেই ভাসা ভাসা জানা ও ব্যবস্থা করা উচিত নহে। ইহা ব্যতীতও কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে —যেমন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা। এ বিষয়ে অন্য কোনভাবে কি আপনি ইহার মীমাংসা চাহেন?

কংগ্রেস সব সময়ই সকল প্রকার ভুল বোঝাবুঝি এবং সংঘর্ষ মিটাইতে চাহে। বৃহৎ জাতীয় সমস্যাসমূহ ব্যতীতও অপর সকল ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি বাধা স্বরূপ। ইহা সকল বিষয়ে প্রায়ই বিবেচনা করে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবগুলি ঠিক কি বেঠিক তাহা অবশ্য তর্কের ব্যাপার। আমরা যদি ইহাতে কৃতকার্য না হই তাহা হইলে সেটা হইবে আমাদের দুর্ভাগ্য। আমার ধারণা এই সকল ব্যাপারে পরামর্শ সুফল দিতে পারে।

এই ব্যাপারে কয়েকটি সমস্যা আমি বাছিয়া লইয়াছি। নিম্নে তাহা উল্লেখ করিলাম:

১। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—যাহা পৃথক নির্বাচন এবং আসন সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

২। ধর্মীয় রক্ষাকবচ।

৩। কৃষ্টি সম্পর্কে রক্ষা ব্যবস্থা।

আপনি যেহেতু প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি বিবেচনা করিতে চান সেইজন্য উপরে লিখিত তিনটি সমস্যা প্রধান বলিয়া মনে হইয়াছে। আরও কিছু ছোট ছোট সমস্যা হয়তো আছে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেস তাহার মত পরিষ্কার করিয়াছে। আপনি যদি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান, আমাকে জানাইবেন ধর্ম কৃষ্টি রক্ষা সম্পর্কে কংগ্রেস রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আরও যদি কোন রক্ষা করনের দরকার হয় জানাইবেন। ভাষা সম্বধে আমার রচনা আপনার নিকট পাঠাইয়াছি। আশা করি তাহার দ্বারা সে বিষয়ে একমত হইবেন। ইহা ছাড়া কি আপনি অপর কোন বিষয় আলোচনা করিতে চান? নিশ্চয়ই তাহা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিকায় হইবে। যথা ঃ—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমাদের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা সমূহ, আমাদের যুদ্ধবিরোধী নীতি, জনগণের শোষণ সম্পর্কে আমাদের চেষ্টা, শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যা প্রভৃতি। মুসলিম লীগ নীতি পরিবর্তনের পর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পটভূমিকায় লীগের সহিত কংগ্রেসের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া আমার ধারণা। বার বার একথা বলিতেছি বলিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার মনে হয় গান্ধীজী ইতিমধ্যে আপনাকে আলোচনার জন্য প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছেন। বর্তমানে আমি কংগ্রেস সভাপতি নহি। সেইজন্য পূর্বের মতো প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করিতে পারি না, তাহা সত্ত্বেও যদি আমার সেবা প্রয়োজন হয় আমি সকল সময় প্রস্তুত থাকিব।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

নেহরুর নিকট জিন্নাহর ৪র্থ পত্র

নিউ দিল্লী
১৭ই মার্চ ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

আমার মনে হয় মুসলমানদের ধর্ম কৃষ্টি, ভাষা ব্যক্তিগত আইন, জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক অধিকার, সরকার ও শাসন সম্বন্ধে

তাহাদিগের স্বার্থ এবং অধিকার বিষয় বা প্রশ্ন লইয়া আমরা আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। বহু প্রকারের ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে মুসলমানদের মনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস নিরাপত্তা বোধ আনিতে পারে। কিন্তু আমি তখনই আশ্চর্য বোধ করি যখন উত্তরে আপনাকে লিখতে দেখি যে, "এই সকল সঙ্গত ব্যাপারগুলি কি ? হয়ত আমি অন্ধকারে আছি নতুবা সমস্যাগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নহি" ইত্যাদি। আশা করি আপনি ১৪ দফার বিষয় সমূহ শুনিয়াছেন।

আপনার সহিত একমত যে, ইতিপূর্বে বহু কিছু ঘটিয়াছে এবং বহু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইঙ্গিত ও পরামর্শও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে ১১ তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত "মুসলমানদিগের দৃষ্টিতে শীর্ষক একটি রচনা (নকল পাঠান হইল) তারপর নিউটাইমস্‌ পত্রিকায় ১লা মার্চ তারিখে প্রকাশিত আপনার বক্তৃতা সম্পর্কে সমালোচনা দেখিতে বলি। আমার মনে হয় হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে আপনি বলিয়াছিলেন "আমি তথাকথিত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নগুলি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে কিছু নাই বলিয়া কিছুই দেখিতে পাই নাই।" এই সমালোচনার সহিত বহু পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। (নকল পাঠাইলাম) আরও বোধ হয় মিঃ অ্যানের সাক্ষাৎকার সংবাদটি দেখিয়াছেন; যেখানে তিনি মুসলিম লীগের দাবী সম্বন্ধে কংগ্রেসের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এখন মনে হয় অনেক তথ্য ও পরামর্শ ও আলোচনা আপনাকে দেওয়া হইল। শেষ পর্যন্ত ইহাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমি বিবেচনা করি প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী, তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত কিংবা যে দলভুক্তই হোক না কেন, তাঁর কর্তব্য বা অবস্থা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটি চুক্তি সাধন করিয়া সত্যকার একটি যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করা। আপনি এবং আমি যে দলেই থাকি না কেন এবং যে সম্প্রদায়ের হই না কেন আপনার এ বিষয়ে যতটুকু কর্তব্য আছে ঠিক আমারও ততটুকু কর্তব্য আছে।

আপনি যখন বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি নহেন বলিয়া লিখিয়াছেন তখন মনে হয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেহ সরকারীভাবে লিখিলে আমিও মুসলিম লীগের কাউন্সিলকে তাহা জানাইব এবং সরকারী-ভাবে তাহা আলোচিত হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত

এম. এ. জিন্নাহ্

—লাহোর হইতে প্রকাশিত ১লা মার্চ তারিখের নিউ টাইমস পত্রিকা হইতে উদ্ধৃতি।

"সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন"

গত হরিপুরা কংগ্রেস সম্মেলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যা-লঘুদের ধর্ম এবং কৃষ্টি সম্পর্কীয় অধিকার বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উত্থাপন করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই বক্তৃতাটি নিতান্ত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। যদি প্রস্তাবটিকে বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ইহার কোন প্রকার গুরুত্ব ছিল না। বোকা সংখ্যালঘুগণ, যাহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আত্মসন্তুষ্ট থাকিতে চাহে, তাহাদের খুশী করিবার জন্যই ইহা করা হয়। মিঃ জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, সত্য-সত্যই দেশে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই। তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ-ভাবে বক্তব্যটি প্রকাশ করেন তাহা আমরা লিখিতে চাহি। তিনি বলেন, আমি তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি দূরবীণের সাহায্যে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু যেখানে কোন সমস্যা নাই সেখানে কি দেখিতে পাইব? আমাদের মনে হইয়াছিল যে এইরূপভাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা নিতান্ত অসাধুতা। যদি কোন সমস্যা নাই থাকে তাহা হইলে সে সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা কেন? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পক্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখিতে না পাওয়া কিংবা বুঝিতে

অক্ষম হওয়া ইহাই প্রথম নহে। মিঃ জিন্নাহর বিবৃতির উত্তর দিতে গিয়া তিনি বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যে মিঃ জিন্নাহ কি চাহেন তিনি চেষ্টা করিয়াও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (কংগ্রেস যাহার বিরোধীতা করিতেছে) আইন সভায় বর্তমানে আসন রক্ষা নিশ্চিত করিয়াছে, এখন আর কিছুই বাকি নাই।

তিনি পুনরায় উত্তেজনাপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে বলেন যে, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দ্বারা মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক একটি সমস্যার সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাহাতে আইন সভার কয়েকটি আসন লাভ কিংবা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ কিংবা মন্ত্রীসভায় স্থান লাভ করা যায়। আমরা পণ্ডিত জওহরলালকে বলিতে চাই যে তিনি আদৌ মুসলমান সংখ্যালঘুদের অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের সভাপতি হইয়া, যিনি ভারতের সকল লোকের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করেন, তিনি মুসলমান সংখ্যালঘুদের সমস্যা সম্বন্ধে এতখানি অজ্ঞ কেমন করিয়া হইতে পারেন। আমরা নিম্নে মুসলমানদের কয়েকটি দাবীর উল্লেখ করিব, যাহাতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিতে না পারেন যে মুসলমানরা কি চাহে তাহা তিনি জানেন না।

১। এখন ইহাতে কংগ্রেস যেন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বাধা দান ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা উচ্ছেদের জন্য সকল আন্দোলন বন্ধ করেন এবং ইহা যে জাতীয়তাবাদ ক্ষুন্ন করে এরূপ প্রচারে বিরত থাকে।

২। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা কেবল দেশের আইন সভায় মুসলমান এবং অপরাপর সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করিয়াছে কিন্তু সংখ্যালঘুদের সরকারী চাকুরীতে প্রতিনিধিত্বের অংশ-বণ্টন বাকী আছে। মুসলমানদের দাবী হিন্দুরা চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করিতে যতখানি অধিকারী মুসলমানরাও মাতৃভূমিতে সেই পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী। এ-ব্যাপারে মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং তাহাদের চাকুরী ক্ষেত্রে রক্ষা কবজের প্রয়োজন আছে। দেশে উপযুক্ত আইন

করিয়া মুসলিমদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে কোন বিভাগের কোন কর্তা "উপযুক্ততা"র প্রশ্ন তুলিয়া মুসলমানদের চাকুরী প্রাপ্তিতে বাধা দিতে না পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভাল-ভাবেই প্রশ্ন তুলিয়া ভারতবাসীদের তাহাদের নিজের দেশেই চাকুরী দেয় নাই। বর্তমান কংগ্রেস যখন সাতটি প্রদেশে শাসন করিতেছে তখন মুসলমানরা তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্ট ভাষায় এই বিষয়ে ঘোষণা চাহে।

৩। আইন দ্বারা মুসলমানরা তাহাদের ধর্ম এবং কৃষ্টি রক্ষার দাবী জানায়। আন্তরিকতার অগ্নি-পরীক্ষার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেসের কর্তব্য তাহারা যেন শহীদগঞ্জ মসজিদটি মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ফেরৎ দিতে শিখদের নিকট নৈতিক চাপ দেন।

৪। মুসলমানরা দাবী করে তাহারা যেন মসজিদে উচ্চস্বরে আজান এবং ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে কোন প্রকার বাধা না পায়, আমরা ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে জানাইতে চাহি যে লাহোর জেলার কাসুর তপশীলের, যাহা সাধারণত রাজা জং নামে পরিচিত, সেখানে শিখগণ মুসলমানদের উচ্চস্বরে আজান দিতে বাধা দিতেছে। এইরূপ প্রতিবেশীর সহিত বাস করিতে হইলে ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে আইন প্রয়োজন। কংগ্রেস যখন শাসন-ব্যবস্থা অধিকার করিতেছে তখন এরূপ শক্তিশালী সংগঠনকে ধর্মে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বলিতে চাই যখন শিখগণ ঝটকা করিয়া থাকে তখন মুসলমানদের যেন গো হত্যা করিতে বাধা না দেওয়া হয়। পণ্ডিত নেহরু ধর্মীয় আচারে বিশ্বাস করেন না। তিনি দাবী করেন অর্থনৈতিক সমতার উপর সব কিছু নির্ভরশীল। মুসলমানদের জন্য গো-হত্যা প্রশ্নের সঙ্গে আর্থিক সমস্যা জড়িত। সেই জন্য কোন হিন্দু-আইন যেন গো-হত্যা বন্ধ করিতে না পারে।

৫। মুসলমানদের দাবী তাহারা যে সকল প্রদেশে সংখ্যাগুরু সেই সকল প্রদেশের সীমা ভাগ করিয়া কখনও যেন বর্তমান অবস্থার পরি-বর্তন করা না হয়।

৬। জাতীয় সঙ্গীতের প্রশ্ন আর একটি বিষয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিশ্চয় ইহা অজানা নহে যে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত কিংবা অপর কোন মুসলিম মনোভাববিরোধী সঙ্গীত সারা ভারতের কোন মুসলমান জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পছন্দ করে না এ কথা যদি তিনি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বুঝাইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যেন লম্বা লম্বা কথা না বলেন একথা তাহার বোঝা উচিত। হিন্দু জনসাধারণ তাহাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, কেবল মুসলমানদের সংহতি নষ্টের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে।

৭। স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব আর একটি অমীমাংসিত ব্যাপার যে মতবাদ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মধ্যে লুকাইয়া আছে। যথা :—পৃথক নির্বাচন এবং সংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব, এবং সেইভাবে জন সংখ্যার আনুপাতিক হারে সকল স্থানীয় সংস্থা সমূহে প্রতিনিধি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দাবীগুলোর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল এবং কংগ্রেসের উত্তর জানিতে চাহি। এ কথা তিনি ভালভাবেই জানেন হিন্দু অপেক্ষা ভারতের মুসলমানরা দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে অধিকতর আগ্রহশীল। তাহারা যেমন দেশে মুসলিমরাজ্য চাহে না তেমনি সকল শক্তি দিয়া হিন্দুরাজ্যের সৃষ্টির বিরোধিতা করিবে। তাহারা দেশের সকল শ্রেণীর সকল লোকের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাহে; কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের রাজ্য সৃষ্টির বিরোধিতা করে, কারণ এরূপ সরকার সকল সংখ্যালঘুদের ধর্ম ও কৃষ্টি রক্ষার সকল প্রতিশ্রুতি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলিকে পণ্ডিত জওহরলাল তুচ্ছ মনে করিতে পারেন কিন্তু সংখ্যালঘুরা যেরূপ গুরুত্বের সহিত দাবী জানায় সেইভাবে কংগ্রেসের কার্যক্রমের মধ্যে ইহা বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। সংখ্যালঘুরা ইহার বিচারক, সংখ্যাগুরু নহে। মনে হয় পণ্ডিত নেহরু যে মনোভাব লইয়া বক্তৃতায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছেন এবং

যেভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর প্রশ্ন কৃত্রিম এবং স্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট। ইহা মনে করিবার কারণ আছে। সেই জন্যই মনে হয় ইদানিং পণ্ডিত নেহরু এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে যে পত্রালাপ চলিতেছে তাহা সফল হইবে না।

নিউদিল্লী হইতে প্রকাশিত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮
স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার উদ্ধৃতি
"মুসলমানদের দৃষ্টিতে" (আইনল শুক্র)

বোম্বাই-এ পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর ২রা জানুয়ারীর বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নে আশাপ্রদ প্রতিক্রিয়া হইয়েছে এবং নেতাদের মধ্যে হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারত সম্বন্ধে বোঝাপড়ার সুবিধার জন্য আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ্‌-প্রসাদ আলোচনা অপেক্ষা ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ্‌-নেহ্‌রু আলোচনা উত্তম ফল দিবে কিনা তাহা দেখিবার বিষয়। খুব বেশী আশাবাদী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতজী হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য উত্তর প্রদেশ হইতে আগত সদস্যগণকে বোম্বায়ে তাঁর বিবৃতি সম্পর্কেও আলোচনা কালে বলেন, "কোনক্রমেই কংগ্রেস তার মতবাদ বিসর্জন দিবে না।"

ইহা মোটেই আশাপ্রদ বিবৃতি নহে। কারণ লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের জন্য গ্রহণীয় শর্ত কিংবা চুক্তি অর্থে কংগ্রেস কর্তৃক লীগের পৃথক নির্বাচন, কিছু দিনের জন্য যুক্ত মন্ত্রীসভা লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংগঠন, হিন্দু এবং উর্দু অক্ষর সম্বন্ধে মত পরিবর্তন, বন্দেমাতরমকে পরিত্যাগ, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার পুনর্বিন্যাস, কিংবা মুসলিম পতাকাকে সমমর্যাদাসম্পন্ন জানিয়া লওয়া এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর যে উভয় পক্ষের নেতারা অল্প বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য করিলে কোন পক্ষের মতবাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করিয়াও একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন,

কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হইবে হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা। বাংলা প্রদেশের সকলেই যদিও কেবল মাত্র মহাসভাপেন্থী নহে তবুও তাহারা ভাবাবেগে চালিত হয় বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। হিন্দুদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসকে কথা বলিতে দেওয়ার প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। এমন কি জিন্নাহ্-প্রসাদ শর্তসমূহ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এখন যাহা হইতে চলিয়াছে তাহাও তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে তাহারা ভীষণভাবে আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং অত্যন্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। নব নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা ও জিন্নাহ্ প্রসাদ শর্ত সমূহ সম্পর্কে আলোচনা যথেষ্ট সংযত।

বর্তমান অবস্থায় মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য উত্তম আশা পোষণ করিয়া অপেক্ষা করাই একমাত্র কর্তব্য যে লীগ মুসলমানদের সহিত বোঝাপড়া করিতে কংগ্রেসকে বাধ্য করিয়াছে সেই লীগের জন্য মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে প্রত্যহ তাহার শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন।

জিন্নাহ্‌র নিকট নেহ্‌রুর ৫ম পত্র

কলিকাতা
৬ই এপ্রিল ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্,

আপনার পত্রে আমার মনে থাকা কতকগুলি বিষয় দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। যে বিষয়গুলি আমাদের সহিত আলোচনার জন্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া কিছুটা আশ্চর্য হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পূর্বেই কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে বিচার করিয়াছে এবং সে সম্পর্কে কি করণীয় তাহা স্থির করিয়াছে আর কতকগুলি আলোচনার উপযুক্ত নহে। আরও বলা হইয়াছে যে আপনি এবং বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

যে সকল শর্ত বাহির করিয়াছিলেন তাহা মোটেই মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই এবং এই পথে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। যে সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব কিরূপ তাহা জানিতে হইবে। কিন্তু এইগুলি বিবেচনার পূর্বে রাজনীতি এবং অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের স্বাধীনতা, যাহার জন্য আমরা কাজ করিতেছি, এবং শেষ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা ইহাদের পরিচালনা করিবে, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তা করিলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতেই পারে না, অথবা তার প্রয়োজন নেহাৎ কম। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে কিংবা বৃটিশ রাজত্ব চলা কালে এগুলি বিবেচিত হইতে পারে। অনেকগুলি দাবী শাসনতন্ত্রী পরিবর্তন ব্যতীত সম্ভবপর নহে। যদি এইরূপ পরিবর্তন প্রয়োজনীয় তবুও তুচ্ছ ব্যাপারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া আমাদের নীতি নহে। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনাকালে কি কি বিষয়ে রক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহা বলিতে পারি। সংখ্যালঘুদের ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা এবং অপরাপর বিষয়ে অধিকার সম্পর্কে করাচী সম্মেলনে মৌলিক অধিকার প্রস্তাবের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। এই মৌলিক অধিকারগুলি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এইবার আপনার পত্রে লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিতেছি :

১। আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার চৌদ্দ দফা এক প্রকার চিন্তা বহির্ভূত। কারণ কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে, কতকগুলি কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য, আবার কতকগুলি শাসনতন্ত্র পরিবর্তনীয়। বাকি যাহা রহিয়াছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট তর্কের বিষয়।

২। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার শর্তসমূহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। যাহা পরিবর্তনযোগ্য তাহা কেবল মাত্র দলগুলির ইচ্ছা অনুযায়ী হইতে পারে। আমাদের যদি বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা জাতীয়বিরোধী নহে তাহা হইলে মিথ্যা

বলা হইবে। ইহা জাতীয় সংহতি উন্নয়নে বাধা স্বরূপ। ইহাতে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে অযথা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যদিও কোন কোন বিষয় অস্থায়ীভাবে আমাদের মানিয়া লইতে হয়। তাহাও জাতীয় বিরোধী বলিতে হইবে।

৩। মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরীর সংখ্যা সংরক্ষণ করিতে হইলে অপর সকল সম্প্রদায়ের জন্যও করিতে হয়—ইহা জানিতে হইবে। সরকারী চাকুরী সকলের জন্যই এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না।

৪। কংগ্রেস কৃষ্টি রক্ষা ব্যবস্থা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে। ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না।

৫। সহিদগঞ্জ মসজিদ ব্যাপারটি মৌলিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ পালনের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়কে দিবে।

৭। গো-হত্যা কংগ্রেস আইন দ্বারা বন্ধ করিতে চাহে না এবং কংগ্রেস মুসলমানদের এরূপ বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রকার আইন করিতে চাহে না।

৮। প্রদেশ সমূহের নির্ধারিত সীমানা রদ-বদল সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন প্রশ্ন উঠে নাই। যদি কখনও উঠে তাহা হইলে দলগুলির মধ্যে আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

৯। বন্দেমাতরম সঙ্গীত সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি গত অক্টোবর মাসে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করিয়াছে। সেই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথমতঃ আজ পর্যন্ত কংগ্রেস কোন প্রকার জাতীয় সঙ্গীত আইনানুগভাবে স্থির করে নাই কিন্তু ইহা সত্য যে বিগত বহু বৎসর হইতে এই গানটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহিত জড়িত আছে এবং ইহা জনসাধারণের যথেষ্ট প্রিয় এবং গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠে নাই। যাহা হউক ওয়ার্কিং কমিটি দুইটি পংক্তি বাদ দেওয়ার সাব্যস্ত করিয়াছে। আশা করি এখন আর কেহ কোন

প্রকার অভিযোগ করিবে আর এই সময় এত জনপ্রিয় সঙ্গীত কোন সংগঠনের পক্ষে বাদ দেওয়া সম্ভপর নহে।

১০। কংগ্রেস বহুদিন হইতেই যৌথ নির্বাচন পছন্দ করে—দেশের সংহতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার জন্য। ইহার যত মূল্যই থাক না কেন কিন্তু যাহারা চাহে না তাহাদের উপর চাপাইতে চাহে না।

১১। মুসলমান শিখ এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেস ১৯২০ সাল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির একটি করিয়া জাতীয় পতাকা থাকে কোন সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে রংগুলির লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিতে চাহি না। কিন্তু শিল্পীর রং-এর বিন্যাস বেশ সুন্দর মনোহর এতদিন এই পতাকা জাতীয় আশা, সাহস এবং একতার জ্ঞান যোগাইয়াছে। ইহাও কত হিন্দু-মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কত লোকের ত্যাগ, জেল প্রহার এবং মৃত্যুর সাথে জড়িত। ইহার ব্যবহারে কোন প্রকার বাধা থাকিবার সঙ্গত কারণ নাই।

১২। মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি। স্থানীয় সংগঠন বলিয়া অনুমোদন অর্থে কি বলিতে চাহেন তাহা আমি বুঝি না; মুসলিম লীগ একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক দল আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং পার্থক্য বুঝি না। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যে সকল দল এবং ব্যক্তি আছে তাহাদের সকলের স্বার্থেই একই প্রকার ব্যবহার করিতে হয়। কংগ্রেসের মধ্যেও লক্ষ্যাধিক মুসলমান আছেন যাহারা আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে; জেলে এবং বাহিরে বহু বৎসর কাজ করিয়াছে; আমরা তাহাদের সহযোগিতার মূল্য দিই আরও বহু দল যাহাতে মুসলমান এবং অমুসলমান কিছু কিছু আছে, যথা ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ইউনিয়ন, কিষাণ সভা জমিদার এসোসিয়েশন চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে। আর বিশেষ ধরণের মুসলমান দল আছে যথা: জামাএত-উল-উলেমা

প্রজাপার্টি', আহরর পার্টি' এবং আর সকল যাহা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে দল যত বেশী যোগ্যতা বা শক্তি রাখে সেই দল তত বেশী তাহাদের প্রতি মনোযোগী হইতে বাধ্য করে।

১৩। যুক্ত মন্ত্রীসভা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে একই ধরণের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কর্মপন্থা হইলে যুক্তভাবে কাজ করা সহজ হয়। কংগ্রেস বিধান সভায় নির্দিষ্ট কর্মসূচী এবং স্বচ্ছনীতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। সেই রকম ক্ষেত্রে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের কথা বুঝিতে পারি নতুবা কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রীসভা কিংবা বিধানসভার কোন উৎসাহ নাই।

আমি সম্পূর্ণ একমত যে এক যোগে যৌথ চেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা আনিতে পারে এবং লোকের দৈন্য দূর করিতে পারে। তাহার জন্য প্রত্যেক ভারতীয়ের চেষ্টা করা উচিত। কোন প্রকার "প্যাক্ট" করা আমি পছন্দ করি না, তবে মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ লোকের উপকারের জন্যই আমি মনে করি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। সেই ভাবেই আমি সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করি; নতুবা এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। সংবাদপত্রে আমার হরিপুরার যে বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভ্রান্ত।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

নেহরুর নিকট জিন্নাহর ৫নং পত্র

বোম্বাই
১২ই এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল,

আপনার পত্র অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার মনে হয় আপনি আমার পত্রের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কারণ আপনি যথার্থ বলিয়াছেন যে, আপনার "মন আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং পৃথিবীর উপর

যে ভয়াবহ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা লইয়া পূর্ণ।" সেই জন্য আমাদের সম্মুখে ভারতে যে প্রকৃত অবস্থা রহিয়াছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে চিন্তা করিতেছেন। সেই জন্যই আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ঘুরাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করিয়াছেন। তাহার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি আপনার পত্রে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের আমার বক্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আপনি বার বার আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যদি ইদানীং কোন সংবাদ-পত্রে কিংবা বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কোন তথ্য বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার অবগতির জন্য পাঠাইলে বাধিত হইব। আমি কেবলমাত্র সেগুলি পাঠাইয়াছি। নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে বিষয়গুলি বর্তমানে মুসলিম ভারতকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার মধ্যে এইগুলি কয়েকটি। কিন্তু কিভাবে তাহার মীমাংসা হইতে পারে, কতদূর মীমাংসা হইতে পারে, সে ব্যবস্থা করা। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে তাহা প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর কর্তব্য। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। তাহা আমরা চুক্তির মাধ্যমে করিব বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার পত্রে আপনার রায় দিয়াছেন এবং অধিকাংশ ভাগ বাটোয়ারার বিষয়ে, আলোচনার মাধ্যমে যাহাদের মীমাংসা হইতে পারিত, তাহার অপেক্ষা না করিয়া প্রতিকূল উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে "এই ফর্দটি দেখিয়া আমি এতই আশ্চর্য হইয়াছি যে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আপনি আমাদের সহিত আলোচনা করিতে চাহেন—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কংগ্রেস পূর্বেই বিচার করিয়াছে এবং কতকগুলি আলোচনার যোগ্য নহে;" "এবং তাহার পর শেষের দিকের বিষয়গুলি আপনার নিজস্ব মতামত দিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। আপনার ভাব এবং ভাষা পূর্বের মতই একগুঁয়ে এবং সংঘর্ষ প্রয়াসী; যেন কংগ্রেস একমাত্র সর্বেসর্বা ও সর্বক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি। এমনভাবে আপনার পৃষ্ঠপোষকতার ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ একটি বিশেষ

সাম্প্রদায়িক দল; আমাদের জানা অপর দল ও ব্যক্তির সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি ঠিক সেইভাবেই ইহার সহিত ব্যবহার করি; তাহার প্রয়োজনীয়তা এবং অপরের সহিত পার্থক্য আমরা বুঝি না। "এখানে আমি কি আপনাকে জানাইতে পারি যে, আমার মতে যাহা প্রকাশ্যে প্রায়ই বলিয়া থাকি যে যতদিন কংগ্রেস মুসলিম লীগকে সম, পর্যায়ভুক্ত বলিয়া না মানিয়া লইতেছে এবং হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য প্রস্তুত না হইতেছে ততদিন আমাদের প্রকৃত শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং তখনই, "ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং অপর দল সকল অপেক্ষা ইহার গুরুত্বের মান উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আপনার মনের অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আরও বেশী করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা নিতান্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়।

আপনি কংগ্রেস সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন;—উত্তর প্রদেশ সরকার সম্বন্ধে এরূপ বহু অভিযোগ আমার নিকট আছে,—যাহা আমি বিনা তদন্তে আপনাকে জানাইতে চাহি না। এরূপ বহু মিথ্যা কথা কংগ্রেস সদস্য এবং কংগ্রেসের সংবাদপত্রসমূহ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বলিয়া থাকে ও লিখিয়া থাকে। তাহা আমাদের বর্তমান বিচার্য বিষয় নয় এবং তাহাতে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এ. জিন্নাহ্

জিন্নাহ্‌র নিকট নেহরুর ৬নং পত্র

এলাহাবাদ
১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ এম. এ. জিন্নাহ্,

আমার পত্র আপনাকে ব্যথিত করিয়াছে জানিতে পারিয়া দুঃখিত। আমার মনে হয় ইহা সত্য যে, আমরা সাধারণ সমস্যাগুলি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি এবং তাহা স্বাভাবিক। আমার মত যদি আপনাকে জানাইলে আপনার দুঃখ হয় তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

কিন্তু আমার মন এবং আমার মত কিভাবে কাজ করিতেছে তাহা জানিবার জন্যও আপনাকে জানাইবার জন্য খোলাখুলিভাবে আমি চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হইতে পারে কিন্তু তাহার আবেদন খোলাখুলিভাবে জানাইলে উভয় পক্ষের মধ্যে পার্থক্য কম হইতে পারে। আমি সেইভাবে নিষ্ঠার সহিত আমার আবেদন জানাইয়াছি। আমি পূর্ব পত্রে আপনার পত্রে লিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দৈনন্দিন রাজনীতির শেষ নাই, তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ শর্ত মানিয়া চলিতে হইবে। কংগ্রেস অতীতে এবং বর্তমানে কিরূপ নীতি মানিয়া চলিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি। আমি জানি যে কংগেস সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি নহে এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

মিঃ জিন্নাহ্ শ্রী বি. জি. খেরকে তাহার নিজস্ব প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে লিখিত হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে একটি পত্রসহ গান্ধীজীর নিকট পাঠান। শ্রীখের তিথালে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রী খেরের মধ্যে আলোচনা হয়, ইহার পর গান্ধীজী মিঃ জিন্নাহ্‌কে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন। উল্লেখ থাকে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে পত্রালাপ চলিতেছিল, তখন মিঃ জিন্নাহ্ শ্রীনেহরুকে লিখিত পত্রের নকলসহ ব্যক্তিগত কয়েকখানি পত্র গান্ধীজীকে লিখিয়াছেন।

জিন্নাহর নিকট গান্ধীর ১নং পত্র

তিথাল
২২শে মে ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্,

খের আমাকে আপনার প্রেরিত পত্র এবং সংবাদ দিয়াছেন। আমি কিছু করিতে পারি মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি নিতান্ত অসহায়।

একতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই উজ্জ্বল। কেবলমাত্র দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রকার দিবালোক দেখিতে পাইতেছি না। এরূপ দুঃখের মধ্যে ভগবানের নিকট আলোচনার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে গান্ধী

জিন্নাহ্‌র নিকট গান্ধীর ২নং পত্র

প্রিয় বন্ধু,

আপনার লক্ষ্ণৌ এর বক্তৃতা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়াছি এবং আমার মনোভাবকে আপনি ভুল বুঝিয়াছেন লক্ষ্য করিয়া গভীর-ভাবে মর্মাহত হইয়াছি। ঐ পত্রখানি আপনার বিশেষভাবে প্রেরিত পত্রের ব্যক্তিগত উত্তর। যাহাতে আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি। আপনি যেমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি উপযুক্ত হইয়াছে? আপনার বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি। তাহা এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণাস্বরূপ। এই গরীবকে উভয়ের মধ্যে সেতু হিসাবে সংরক্ষিত রাখিবেন ইহাই আশা করি। আপনি যদি কোন সেতু না চান তাহা হইলে দুঃখিত হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীর নিকট জিন্নাহ্‌র ১ম পত্র

বোম্বাই
৫ই নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় গান্ধীজী,

আপনি আমার বক্তৃতায় যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। এটা নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে। দয়া করিয়া আর একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। গত বারমাসের কার্য-কলাপ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নাই। আপনাকে সেতু কিংবা শান্তি-দূত

করিয়া রাখা সম্পর্কে কি বলিতে পারি—আপনি কি মনে করেন না যে বিগত মাস সমূহে আপনার নিশ্চুপ ভাব কংগ্রেসের নেতাদের কার্যকলাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি যে আপনি কংগ্রেসের চারি আনার সদস্যও নহেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এ. জিন্নাহ্

জিন্নাহ্‌র নিকট গান্ধীর ৩য় পত্র

সেবাগ্রাম
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় শ্রী জিন্নাহ্,

আপনার পূর্ব পত্রের উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোন প্রকার উত্তর দেওয়ার কিছুই ছিল না। সেই জন্য দিই নাই, তবে আপনি যখন উত্তর চান তখন দিতেছি। শ্রীখের আমাকে একান্তে লইয়া আপনার একটি পত্র দিয়াছেন। আমি তাহার মৌলিক উত্তর দিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আমার মনের সত্য অবস্থা জানাইবার জন্য একটি ছোট পত্র দিলাম। আপনি যদিও লিখিয়াছেন যে আপনার বক্তৃতা মোটেই যুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে, কিন্তু তাহা হইলেও আমার মনের যে প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে মনের ভাব কিভাবে প্রকাশ করি ? আপনার বক্তৃতায় আমি পুরাতন জাতীয়তাবাদীকে হারাইয়াছি। ১৯১৫ সালে আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসি তখন আমাকে সকলেই আপনার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি একজন গোড়া জাতীয়তাবাদী। হিন্দু-মুসলমানের আশাস্বরূপ। এখনও কি আপনি সেই জিন্নাহ্‌ই আছেন ? আপনি হ্যাঁ বলিলে বিশ্বাস করিব। আপনি আমাকে কয়েকটি প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিয়াছেন আপনাকে পূর্বের মত হইতে প্রস্তাব করিতেছি। আর হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল প্রস্তাব আপনার নিকট হইতেই আশা করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীর নিকট জিন্নাহ্‌র ২য় পত্র

নিউ দিল্লী
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া মৌলানা সাহেবের নিকট আমি কোন প্রকার অভিযোগ করি নাই। আপনার এবং আমার সাক্ষাৎ-কার সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া কেবলমাত্র তাহাকে ঘটনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম শ্রীখের যখন আপনার সহিত ওয়ার্ধায় সাক্ষাৎ করিতে যান তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে পত্রখানি গোপনে আপনাকে দেন। তাহার পর পুনরায় যখন তিনি তিথালে আপনার সঙ্গে দেখা করেন তখন হইতে পত্র সম্পর্কে কোন প্রকার গোপনীয়তা ছিল না—একথা তাহাকে বলিয়াছিলাম। আপনি এবং শ্রীখের এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করিয়া ঠিক করিবেন, যে আপনি বিষয়টি বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা এবং আপনার পূর্ণ প্রস্তাব কংগ্রেস কার্যকরী করিতে পারেন কিনা তাহা তাহাকে জানিতে বলিতেছিলাম। তখনই তিনি আপনার উত্তর লইয়া আসেন এবং তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি। কারণ আপনি জানেন যে শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আমার যে সকল মতবিরোধ দেখা দেয় তাহাতে আমিই মুসলমানের সমস্যা সমাধানে বাধাস্বরূপ বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। আপনার পত্রে গোপনীয় কথাটিও লেখা থাকে নাই। ইহা দ্বারা আমি নিজ ইচ্ছায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি ও আপনি তাহার উত্তর দিয়াছেন, 'একথা বলায় দোষ কি ?' আপনি লিখিয়াছেন, 'বিশ্বাস করুন এমনি করিয়া যখনইদুই সম্প্র-দায়কে একত্রিত করিতে পারিব তখন পৃথিবীর কেহই বাধাদিতে পারিবে না'। ইহাতে কি আমি মনে করিব যে এখনও সময় আসে নাই ?

আপনি আমার লক্ষ্মৌর বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ইহা যেন যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। আমি পুনরায় বলিতেছি তাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে। আপনি সম্ভবতঃ জানেন না যে কংগ্রেসের সংবাদপত্র সমূহে আমার বিরুদ্ধে বিরূপ গালি-গালাজ করা হইতেছে এবং আমার সম্বন্ধে কিরূপ বিকৃত এবং মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হইতেছে। জানিলে নিশ্চয় আমাকে আপনি দোষী করিতে পারিতেন না।

যে সকল প্রস্তাব দ্বারা হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্ভব হইতে পারে তাহা কি এইরূপ পত্রালাপে সম্ভবপর হইবে বলিয়া আপনি মনে করেন? হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যের মৌলিক কারণ যাহা আমি জানি তাহা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন এই সমস্যা সমাধান কিভাবে হইতে পারে তাহা আপনিও নিশ্চয়ই বলিতে পারেন। আপনি যদি সত্যই মনে করেন এবং অনুভব করেন সে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় আসিয়াছে এবং আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি লইয়া নিষ্ঠার সহিত সমস্যাদি সমাধান প্রয়োজন তাহা হইলে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আমি পশ্চাৎ-পদ হইব না।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এ. জিন্নাহ্

জিন্নাহ্‌র নিকট গান্ধীর ৪র্থ পত্র

ওয়ার্ধা সেবাগ্রাম
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। জওহরলালকে লিখিত আপনার পত্রখানি আমি পাঠ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিলাম যে উভয় পত্রই লিখিত উত্তর চাহে না, কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার নিমন্ত্রণ দেয়। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, প্রথমে আপনি ও জওহরলাল কিংবা বর্তমান সভাপতি সুভাষ বোস এবং আপনার মধ্যে আলাপ আলোচনা হইতে পারে। যদি আপনি মনে করেন যে তাহার পূর্বে আমি এবং আপনি আলোচনা করিব তাহা হইলে ১০ই মার্চের মধ্যে সেবাগ্রামে পাইলে আনন্দিত হইব। এখন ডঃ আনসারী আর আমাদের মধ্যে নাই, যাহাকে আমি হিন্দু-মুসলমানদের প্রশ্নে সঙ্গে পেতাম। সেই জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করিলাম। আমার পরামর্শ প্রথমে আপনি এবং মৌলানা সাহেব প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবেন এবং সকল সময় আমাকে আপনাদের ব্যবহারের জন্য পাইবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীর নিকট জিন্নাহ্‌র ৩য় পত্র

নিউ দিল্লী
৩রা মার্চ ১৯৩৮

প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার শরীর অসুস্থ থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আপনার পত্রে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। আপনার কথা মত প্রথমে আপনি এখন আলো দেখিতে পাইতেছেন কিনা এবং উপযুক্ত সময় আসিতেছে কিনা দ্বিতীয়তঃ যদি তাহাই হয় তাহা হইলে নিষ্ঠার সহিত বিষয়টির সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিনা এবং তৃতীয়তঃ যখনই উল্লেখ করিয়াছেন, যে আপনার সাহায্যের জন্য যেহেতু ডঃ আনসারী এখন আর নেই, সেইজন্য মৌলানা সাহেবকে আপনার সাহায্যের জন্য লইবেন, তখনই আমি বুঝিলাম যে, এখনও আপনি এই পথ অনুসরণ করেন তাহা হইলে পূর্বের মত আর একবার আপনারা মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিবেন মাত্র। যখন ডঃ আনসারী সর্বজনবিদিত দৃঢ় মতবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আপনারা একমত হইতে পারেন নাই তখন আপনারা অসহায়তা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন আপনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন নাই। আপনি জানেন যে, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে আপনি যোগদান করিতে যাওয়ার পূর্বেও একই রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন আপনি মোটামুটিভাবে কয়েকটি বিষয় জানিয়া লইতেছিলেন তখনও আপনি অসহায় বোধ করিতেছিলেন; কারণ হিন্দুরা ঐ প্রস্তাব মানেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানরা জানিয়া লইলে আপনার কোন আপত্তিই থাকিত না; কারণ আপনি তখন কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা এখন এক জায়গায় উপস্থিত হইয়াছি যখন সারা ভারত মুসলিম লীগকে মুসলমানদের সকল ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন এবং অপরদিকে আপনাকে ও কংগ্রেসকে ভারতের অন্যান্য হিন্দুদিগের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে কোন প্রকার

দ্বিধার কারণ নাই। এই ভাবেই আমরা এই প্রকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতে পারি।

আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যেরূপ আনন্দিত হইব, সেইভাবে পণ্ডিত জওহরলাল কিংবা শ্রীঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমভাবেই আনন্দিত হইব। আপনি জানে যে, উভয়েই আপনার সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই করিবেন না। সেই জন্য পূর্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক ১০ই মার্চের পূর্বে সেবাগ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন কার্যে ব্যস্ত থাকিব। কোথায় কখন আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে তাহা পত্র মারফত নির্ধারিত হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এ. জিন্নাহ্‌

জিন্নাহ্‌র নিকট গান্ধীর ৫ম পত্র

সেবাগ্রাম
৮ই মার্চ ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ্‌,

আপনার পত্রে কিছু কিছু তর্কের বিষয় থাকিলেও আমি সে সকল বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি না—আমি আপনার ইচ্ছাধীন, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমরা যথা সত্ত্বর আগামী এপ্রিল মাসে মিলিত হইতে পারি। আপনার পত্রে লিখিত দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাবী করে। আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি অনেক আশা দেখিতে পাইয়াছি কিনা। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে বলিতেছি, "না"। একথা আমি উচ্চস্বরে বলিতে পারি কিন্তু সে বাধা সত্ত্বেও বর্তমানে সমস্যার সমাধান করিতে সামান্যতম সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আশা করেন যে আমি কংগ্রেস এবং ভারতের অপরাপর হিন্দুদিগের পক্ষে কথা বলিতে পারি, কিন্তু আমি আশা পূর্ণ করিতে পারিব না। আপনি যেভাবে আমাকে কংগ্রেস এবং ভারতের অপর

হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিতে বলেন, আমি তাহাতে অক্ষম। কিন্তু কোন প্রকার সম্মানীয় সমাধান পাইবার জন্য আমার যতটুকু প্রভাব তাহাদের পাঠাইবার চেষ্টা করিব।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

গান্ধীর নিকট জিন্নাহ্‌র ৪র্থ পত্র

নিউ দিল্লী
১৭ই মার্চ ১৯৩৮

প্রিয় গান্ধীজী,

আপনার ৮ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। দেখলাম আপনি আমার পত্রের সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহেন না। 'আমি অসহায়' বলিয়া কেবলমাত্র দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া আমি নিরাশ হইলাম। যাহা হউক আপনি বলিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট যে 'আমি আপনার ইচ্ছাধীন'। ইহাতেই বুঝিতে পারি যে আপনি বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য সামান্যতম সুযোগ লইবেন। এই আশায় এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এ. জিন্নাহ্‌

ইহার পর কবে কোথায় সাক্ষাৎকার হইবে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মধ্যে পত্রালাপ হয়। জিন্নাহ্‌র-নিকট গান্ধীর শেষ টেলিগ্রামখানি ছিল নিম্নরূপ :

"যদি অসুবিধা না হয় তাহা হইলে ২৮শে এপ্রিল আপনার বাড়ীতে বেলা ১১-৩০ মিনিটে পৌঁছাইব।" (২০শে এপ্রিল।)

কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ধারিত তারিখে গান্ধীজী মিঃ জিন্নাহ্‌র বাড়ীতে আসিতে অক্ষম হন এবং পরেও উভয়ের আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

পত্র-সমীক্ষা

পত্রগুলির খুঁটিনাটি সমালোচনা করিতে চাহি না। তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয় দেশের রাজনৈতিক নেতারা সকল সময় জাতীয় স্বার্থ-রক্ষার্থে দল মতের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। আর ব্যক্তিগত

সম্ভ্রমকে তাহারা যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছিলেন। দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন বোধে জাতীয় সমস্যাকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা অপেক্ষা পাস কাটাইয়া যাওয়া অনেক সময় শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। মুসলিম লীগ সাধারণভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার্থে চেষ্টা করিলেও জাতীয় স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপেই বিসর্জন দিতে চাহে নাই। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছে। ইহার প্রথম এবং প্রধান কারণ যাহা পত্রগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায় তাহা হইল জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বার্থরক্ষার প্রতিকূল অবস্থার ভিত্তি। তাহা হইলেও মিঃ জিন্নাহ্‌র আবেদন সমূহ হইতে বোঝা যায় যে ভারতের এই সমস্যা সমাধানে গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবর্গ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা সমস্যাগুলির যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেন নাই। কংগ্রেস মৌলিক অধিকারের নামে এবং পৃথকভাবেও হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও মুসলিম লীগ মনে করিয়াছিল, যেখানে সমাধানের চেষ্টায় নিষ্ঠার অভাব থাকে সেখানে কোন সংগঠন কর্তৃক কেবল মাত্র প্রস্তাব গ্রহণই যথেষ্ট নয়।

এই মনোভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয় চেষ্টা হইয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। তাহার কারণ বহু মুসলমান কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে জাতীয়তাবাদীর ভূমিকায় কার্য করিতেন এবং কয়েকটি দলও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহারা সকল সময় কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিত। এই জন্যই কংগ্রেস মুসলিম লীগ সম্পর্কে উপযুক্ত জবাব দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই এবং মুসলমান জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব জানিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন মনে করে নাই। মুসলিম লীগকে সাম্প্রদায়িক দল বলিয়া বেশ কিছুটা ছোট করিবার এমনকি বিভিন্ন রূপে ধ্বংস করিবারও চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সকল সময়ই নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং মিঃ

জিন্নাহ্ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় দল হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং অন্যদিকে কংগ্রেসকে অপরাপর হিন্দুদের সংগঠন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। এই সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিত উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য :

"একথা বলিলে চলিবে না যে দেশে আরও অনেক মুসলমান প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা লীগের দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত না। যে সব জাতীয়তাবাদী মুসলমান এক এক সময়ে ভিন্ন নামীয় প্রতিষ্ঠানের দাবী আপনাকে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের কথাই ধরা যাউক। অহরার দল, যাহারা দুঃখবরণে দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন, জমিয়ত উল-উলেমা-ই-হিন্দ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বার বার অংশগ্রহণ করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মুসলমান ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতারূপে সমাজে তাঁহারা একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করিয়াছেন। সিয়া সম্প্রদায়েরও নিজস্ব সম্মেলন আছে।

তাহারা মুসলিম লীগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ দাবী করেন; মমিন সম্প্রদায় মুসলমান সমাজের সর্ববৃহৎ অংশ না হইলেও একটা বিরাট অংশ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের নিজস্ব পৃথক জমিয়ত আছে এবং মুসলিম লীগের দাবী মানিয়া লইতে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করেন; বেলুচিস্তানের খুদ্দম-ই-ওয়াতন নামক জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংঘ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খোদাই-খিদমত-গার দল, বাংলার কৃষক প্রজাপার্টি, সর্বশেষ আল্লামা মাসরেকির নেতৃত্বে পরিচালিত খাকসার দল লীগ দলের সহিত বহু বিষয়ে তাহাদের মতদ্বৈধতা পোষণ করেন। এই সমস্ত দলের শক্তির পরিমাণ ঠিকভাবে নির্ণীত না হইলেও তাহাদের সমর্থকগণ লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠতার দাবী অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকেই সংখ্যাগুরু দল রূপে সপ্রমাণ করিয়া থাকে।"

ইহাতে বোঝা যায় যে কংগ্রেস কেন মুসলিম লীগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নাই এবং প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস যে কেবল হিন্দুদিগের

এবং অপরাপর সম্প্রদায় ভুক্ত সদস্যদিগের সংগঠন সে কথাও স্বীকার করে নাই। কিন্তু যে সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনের উপর আস্থা রাখিয়া এবং নির্ভর করিয়া মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলিয়া কংগ্রেস মনে করিত, সেই সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনসমূহ ও দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী মিটাইবার একমাত্র উপযুক্ত সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস সংগঠনকে গ্রহণ করে নাই শুধু নয় কংগ্রেসের সহিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে একমত হইলেও একাত্ম হইতে পারে নাই, মিলিত হয় নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত সমস্যা

জীবনপ্রবাহ যেমন সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়; সেইভাবে সকল দেশের সকল সমাজের রাজনীতি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ সৃষ্টির আশায় ছুটিয়া চলে। বাধা-বিপত্তি ভাঙা-গড়া, উঠা-নামা সকল কিছুই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে। হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, জয়-পরাজয় সকল কিছুর মধ্যেই ইতিহাসের উপাদান লুকাইয়া থাকে। নতুন কিছু করিবার চেষ্টাও যেমন স্বাভাবিক তেমনি অবস্থানও স্বাভাবিক। আবার ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির সত্তা লুকাইয়া থাকে বলিয়া তাহাও সত্য এবং স্বাভাবিক। মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে, না স্বাভাবিক বিবর্তন ইতিহাস সৃষ্টি করে, যাহার ক্রীড়া-পুত্তলিকারূপে মানুষ কাজ করিয়া যায়? বস্তুতঃ মানুষ আর তাহার কার্যক্রম ইতিহাস সৃষ্টি করে; বিষয়টি বিতর্কিত কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথেই ইতিহাসের সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকে— ইহাই সত্য।

ভারতের ইতিহাসের যে অংশ আমরা আলোচনা করিতেছি এবং যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহা সর্বাপেক্ষা জটিলতম সময়। এক-দিকে ইউরোপের ভাগ্যাকাশে ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের চিহ্ন; অন্যদিকে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধন করিতে পারে তাহার সমস্যা।

কংগ্রেসের ধারণায় ভারতের রাজনীতি মঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার-সমাধান বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদের মতে সমস্যাগুলি কেবলমাত্র বাড়িয়া জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিমত অনুসারে দেখা গিয়াছে যে কংগ্রেসের মধ্যে এক লক্ষ মুসলমান সদস্য ছিল। অপরাপর মুসলিম

জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলিতে যে সকল মুসলমান সদস্য ছিল তাহাদের সংখ্যা সঠিকভাবে জানিতে না পারিলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম লীগ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা ছিল বেশী। অতএব ৩১ লক্ষ কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে এক লক্ষ মুসলমান সদস্য এবং অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্যের সংখ্যা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার আনুপাতিকহারে জাতীয়তাবাদী হিন্দু জনসংখ্যা যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মুসলমানদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে জাতীয়তাবাদী মুসলমান জনসংখ্যা মোটেই কম ছিল না; কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে কার্যকরী সভার সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে হিন্দুদের তুলনায় কম ছিল না; বরং বেশীই ছিল। সেদিক হইতে বিচার করিলে কোন প্রকারে একথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই। কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা হিসাব করিয়াই একথা বলিতে চাহি না কারণ মুসলিম লীগের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর অভিমত অনুসারে মুসলিম লীগও যে বৃটিশ সরকারবিরোধী এবং ভারতের স্বাধীনতাকামীদল হিসাবে কার্য করিতেছিল সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যাহারা আজও ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন প্রকার ত্যাগ নাই বলিয়া বর্তমান যুগের হিন্দু-মুসলমান ছাত্র, যুবক ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিভ্রান্ত করিতে চাহেন, তাহাদের উদ্দেশ্য যে সাধু হইতে পারে না, একথা দিবালোকের মতই স্বচ্ছ।

দেশ বিভাগের জন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায় দায়ী নহে

দেশ বিভক্ত হইয়াছে। আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে দেশ বিভাগের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টাকে অন্যায় এবং অনুচিত বলিয়া মনে করি। মুসলমানদের রাজনীতি সম্পর্কে অনেক সমালোচনা শুনা

যায়, অনেক লেখক, অনেক ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিনা স্বার্থত্যাগে, বিনা পরিশ্রমে অর্জিত স্বাধীনতার স্বত্বভোগী বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু ইতিহাসের ধারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় মুসলমানগণের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই আত্মত্যাগ ও আত্মদান পলাশীর আম্রকাননে সিরাজের পরাজয়ের পরমুহূর্ত হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল।

রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এই সম্প্রদায় বৃটিশ আমল আরম্ভ হইবার পর হইতে কিরূপভাবে এবং কত বেশী নির্যাতিত হইয়াছে ইতিহাসের প্রতিটি ছত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের নিকট নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অশুচী ও অস্পৃশ্য ছিল বলিয়া তাহারা কত আন্দোলন করিয়াছে। গান্ধীজীকেও হরিজন আন্দোলন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শাসনতন্ত্রে হরিজনদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধারা সংযোজন করিতে হইয়াছে। ডঃ আহ্মেদ করকে শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। আর মুসলমানরা সমগ্রভাবে বর্ণহিন্দু তপসিল এবং হরিজনদের মতই সামাজিক অবিচারের শিকার হইয়াও রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। ১৯২৯ সালে সকলেই মনে করিতেছিলেন যে সামাজিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দ্রুত সমাপ্ত হইবে, কিন্তু তখনও সকলের মত ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত হইতে না পারায় তাহা সম্ভব হয় নাই। মিঃ জিন্নাহ্ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ভারতে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা যাহাতে না থাকিয়া যায় তাহার জন্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা এবং

গুরুত্ব অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠন ও সংগঠকগণ অপেক্ষা যথেষ্ট ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতি কিংবা আদর্শ সংখ্যা গরিষ্ঠদের প্রয়োজনে যতখানি রচিত হয় তাহা ভারতের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সংখ্যা লঘিষ্ঠদল সমূহ বুঝিতে পারিতেছে।

পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে মুসলমানদের আর্থিক জীবন আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছি এবং ঐতিহাসিক মিঃ হান্টার স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃটিশ আমলে মুসলমানদের হাত হইতে জমিদারী, সরকারী বড় বড় চাকুরী ইত্যাদি চলিয়া যাইবার ফলে তাহাদের অবস্থা দিনের পর দিন হীন হইতে হীনতর হইতে থাকে। বৃটিশ আমলের আরম্ভ হইতেই তাহারা ইংরাজী শিক্ষা বয়কট করে; ইংরাজদের চাকুরী ঘৃণার বস্তু মনে করে, ইংরাজী শাসনাধীন দেশকে দারুল হারব আখ্যা দিয়া মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজ শাসনবিরোধী মতবাদ সৃষ্টি করে। ইংরাজরাও মুসলমানদের উপর নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে সরকারী দফতর হইতে সরাইয়া দেয়। কেবলমাত্র তাহাই নহে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা একেবারে নিম্নস্তরে আসিয়া পেঁাছায় এবং কৃষকশ্রমিক, ছোট ছোট ব্যবসা অবলম্বনে বাধ্য হয়। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহামদের চেষ্টায় যখন হইতে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহার পর হইতে নিছক জীবন ধারনের জন্য এক অংশ বৃটিশ সরকারের অধীনে অফিস আদালতে কেরানীর কাজ করিতে বাধ্য হয়—১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুসলমানরা সারা ভারতে এরূপ কার্যে শতকরা ৭/৮ জনের অধিক ছিল না। এমনকি বাংলা প্রদেশে মওলানা আজাদের মতে (ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম পুস্তক পৃঃ ২৩) দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক হইলেও (পিয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া হাকিম পর্যন্ত) সকল বিভাগেই মুসলমান চাকুরী জীবির সংখ্যা ত্রিশ জনেরও অধিক হয় নাই। অথচ সকল চাকুরী মুসলমানগণ পাইতেছে, ইংরাজগণ মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দুদিগকে

চাকুরী ক্ষেত্রে বঞ্চিত করিতেছে ইত্যাদি প্রচার, এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পেঁছায় যাহার ফলে সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদের হিন্দুদের স্বার্থহানীকর শত্রু বলিয়া গণ্য করে। ঐতিহাসিক বিনয়েন্দ্র চৌধুরীর "ভারতে মুসলিম রাজনীতি" (পৃ: ৪৮) হইতে ছোট্ট উদ্ধৃতি ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিবে। বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজভক্তির জন্য সকল সময় উদার হইতে থাকে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মুসলমানদের মনে এই ধারণা যোগাইয়াছিল যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে থাকিলে তাহাদের রুটি, আরও বেশী মাখনে পূর্ণ হইবে। কিন্তু নেহরু জিন্নাহর পত্রালাপে আমরা জানিতে পারিয়াছি, মুসলিম লীগ সকল সময় বৃটিশবিরোধী ছিল এবং ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিল। রাজনীতির বিষয় পরে আলোচনা করিব—যখনকার কথা শ্রী চৌধুরী উল্লেখ করিয়া মুসলমানদের সাধারণভাবে বৃটিশ রাজভক্ত সাজাইতে চাহিয়াছিলেন ঠিক তখনকার দিনের আর একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, (ভারতে মুসলিম রাজনীতি পৃঃ ৪৮) "লীগ বহির্ভূত জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাজনৈতিক দল সমূহ সকল সময় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে এবং যথেষ্ট বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় এবং ক্ষতি স্বীকার করে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সাধারণভাবে সকল মুসলমান কোন সময়ের জন্যই রাজভক্ত ছিল না।"

মুসলিমদের চাকুরী, সংখ্যাগুরুর প্রতিবাদ

মুসলমানরা যখন জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে চাকুরী পাইবার দাবী করিয়াছিল তখনই সারা ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মর্মভেদী চিৎকার করিয়া তাহার প্রত্যাহার দাবী জানান ও বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসও ইহাদের সহিত একমত হইয়া এইরূপ দাবীকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া বাধা দান করে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বলা হইয়াছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সরকারী চাকুরীর

ক্ষেত্রে যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে অপর সকল সম্প্রদায়ের জন্যও করিতে হইবে এবং তাহার ফলে সরকারী কর্মচারী-দের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অপর সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে যদি চাকুরী সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইত তাহা হইলে কি সত্যই দেশের কর্মশক্তির দায়িত্ব ও গুরুত্ব হ্রাস পাইত?

এ প্রশ্ন আজিও ভারত সরকারের সামনে রহিয়া গিয়াছে। এ সম্পর্কে পূর্বে ভারতের অন্যতম জাতীয় নেতা ও কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের অভিমত উল্লেখ করা হইয়াছে। যিনি মনে করি-তেন: "মুসলমানদিগকে যদি তাহাদিগের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গঠন করিবার সুযোগ দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণখোলাভাবে কংগ্রেসে যোগদান আশা করা যায় না।" (ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম)

এইরূপ মত তিনি কেবলমাত্র বাংলার জন্যই নহে, সারা ভারতের জন্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন "যখন বাংলাদেশে কংগ্রেস রাজত্ব করিবে, তখন সকল প্রকার নতুন চাকুরী প্রদানে শতকরা ষাটজন মুসলমানকে চাকুরী দেওয়া হইবে এবং যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে চাকুরীর সংস্থান হইতেছে, ততদিন এ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে। দেশবন্ধু মুসলমানদের বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তদের আর্থিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি-লেন। এবং সেই জন্যই সমাধান সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরীর মত অনুযায়ী: "ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে কেন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চারিপাশে জমায়েত হইতে লাগিল। (প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তি বলিতে তিনি নিশ্চয় মুসলিম লীগের কথাই বলিতে চাহিয়াছেন) কিন্তু অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংস্থা যথা: অহরর প্রজাপার্টী এবং সাধারণ মুসলমানগণ অর্থনৈতিক অভিযোগ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ভিন্ন রাস্তা বাছিয়া লন। তাহারা

কোন কোন সময় কংগ্রেস অপেক্ষাও সংগ্রামশীল মনোভাব গ্রহণ করিতেন।" (ভারতে মুসলিম রাজনীতি পৃঃ ৪৮)

দেখা যাইতেছে এ সম্পর্কে বিনয়েন্দ্রবাবু এবং পণ্ডিত নেহরু জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রায়ই একমত। চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাধা দিতে যাইয়া বিনয়েন্দ্র বাবু মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামী মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া আজাদী সংগ্রামের আরেক দিগন্ত উদ্ঘাটন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলেও তাঁহার মন্তব্য অনুযায়ী একথা বলা যায় তিনি মুসলমানের নিকট হইতে সংগ্রাম চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতি আশা করেনাই। কিন্তু তখনকার কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ হিন্দু মুসলমানের চাকুরী সংস্থান ব্যাপারে দেশবন্ধু দাসের মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, দেশবন্ধু দাস দেখাইয়াছিলেন যে মুসলমানগণ স্বায়ত্ত শাসন সংস্থাগুলিতেও চাকুরীর ব্যাপারে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করিতেছে না এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি না থাকে ততদিন বাংলায় সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েম হইতে পারে না। একবার অসমতা দূরীভূত করিতে পারিলে মুসলমানগণ সমানভাবে সকল সম্প্রদায়ের সহিত যোগ্যতার পরিচয় দিতেপারিবে এবং তখন কোন প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না।" (ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম)

দেশবন্ধু দাসের এই উক্তির সমালোচনা করিয়া মওলানা সাহেব লিখিয়াছেন যে শ্রীদাসের এইরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ঘোষণা বাংলাদেশের কংগ্রেস সংগঠনের ভিত্তিমূল ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। বহু কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু দাসের বিরোধিতা করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর বিরোধিতাকে বাস্তবে পরিণত করেন। মাওলনা আজাদ আরও লিখিয়াছেন যদি দেশবন্ধু দাসের অকাল মৃত্যু না হইত তাহা হইলে সারা দেশে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। কিন্তু দেশবন্ধু দাসের মৃত্যুর পর তাঁহারই অনুচরদের বিপরীত কার্যের ফলে বাংলার

মুসলমানরা কংগ্রেস হইতে দূরে চলিয়া যাইতে থাকে এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ রোপিত হয়।

প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ মুসলমানরা শুরু করিয়াছিল

আমরা যখনকার কথা লিখিতেছি, তখন পর্যন্তও ভারতীয় মুসলমানদের আর্থিক সমস্যা ছিল এবং তাহা যোগ্যতার ধুয়া তুলিয়াই হউক কিংবা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের কথা বলিয়াই হউক সমাধানের চেষ্টা হয় নাই বরং চাকুরী ইত্যাদি পাইতে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। এই বিঘ্ন অপসারণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সুরক্ষিত করিবার জন্য মুসলিম লীগের মতে রক্ষা কবজের প্রয়োজন ছিল। তখন হইতে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ প্রায় দশ বৎসর পরের কথা, আর স্বাধীনতা লাভের পর আজ পর্যন্ত প্রায় ৩২ বৎসরের অতীতের কথা। কিন্তু মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনের অসহায়তা ও অসচ্ছলতা, বিশেষভাবে তাহাদের যোগ্যতার প্রশ্ন তাহাদের আজও চাকুরীর ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার অস্ত্র হিসাবে আজও ব্যবহৃত হইতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বৃটিশ শাসন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের বৃহত্তর শিক্ষিত অংশ পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থাকে প্রভু বদল বলিয়া মনে করেন এবং সেইভাবে নতুন প্রভুর অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং বিশ্বস্ততার সহিত বৃটিশ আমলের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমূহের বিরোধিতা করিয়া নিষ্ঠার সহিত রাজভক্ত চাকুরীজীবীরূপে কার্য করিয়া যান। হিন্দু সামন্তগণ এবং রাজন্যবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের সত্তা বজায় রাখিবার জন্য বৃটিশ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যস্ত থাকেন। পলাশীর পর মুঙ্গের তারপর দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যেমন মুসলমান রাজারা বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন তেমনি সাধারণভাবে মুসলমান জনসাধারণ বৃটিশের অধীনে বাস করাকে দারুল হারব্ আখ্যা দিয়া ভারতকে বৃটিশ শাসন মুক্ত করিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এরূপ জেহাদী যুদ্ধ

দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রটি পাঞ্জাব এবং সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত হইলেও সারা ভারতের সকল জনপদ হইতে এমন কি পূর্ব আসাম, বাংলা এবং দক্ষিণে মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিটি গ্রাম হইতে মুসলমানরা ধন-জন যোগান দিয়াছিল। শিখরা এই যুদ্ধে বাধা দিলে তাহাদের সহিতও যুদ্ধ হয়। শিখরা ছিল তখন ইংরাজের বন্ধু। সেদিন মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ছিল না সত্য কিন্তু ছিল পরাধীনতার বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের অদম্য উৎসাহ। সেদিন হিন্দুরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। বৃটিশ আমলের শুরু হইতে যখন এক শ্রেণীর মুসলমান বৃটিশ শাসন মুক্ত করিবার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের এক অংশ হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, অন্যথায় বৃটিশ সরকারের সহযোগিতায় হিন্দু প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। সেদিন হিন্দুরা ছিল বৃটিশ সরকারের সহযোগী। স্বাধীন এবং করদ রাজ্যের নৃপতিগণও বৃটিশ সরকারের নিকট নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বন্ধুত্ব প্রয়াসী হন। ভারতীয়রূপে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কোনরূপ চিন্তা করিবার অবসরও তাহারা পান নাই। ভারতীয় জনসাধারণ বলিতে যে সকল মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানকে বুঝাইত তাহাদের মনে রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধিতে পারে নাই।

তাহার পর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী প্রভাব সংক্রামিত জাতীয়তাবাদ ভারতীয়গণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় নাই। দেশের জন্য যতখানি আত্মত্যাগ ও স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন ছিল তাহা করিতে জাতি কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। কংগ্রেস মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সংগঠন জনসাধারণকে সকল সময় উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে নাই। ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবোধের ইহা অপেক্ষা বড় রকমের পরাজয় আর বোধ হয়

কিন্তু হইতে পারে না। বৃটিশ আমলের মধ্যভাগে হিন্দু এবং মুসলমান একযোগে বিভিন্ন সময়ে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করিলেও ভারতীয় নেতৃবর্গ তাহাদিগকে ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ শূন্য করিয়া সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপ দান করিতে পারেন নাই।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাথে সাথেই রাজ্য পরিচালনা ব্যবস্থা ক্রমেই রাষ্ট্রীয় মতবাদ কেন্দ্রিক হইতে আরম্ভ করে এবং ধর্মীয় মতবাদ সমূহ রাষ্ট্রের পরিচালনা ব্যবস্থা হইতে ধীরে ধীরে নীতিগতভাবে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে; কিন্তু সংস্কার-মুক্ত হয় না। অপরাপর মহাদেশে এই প্রকার ব্যবস্থা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ঐ সকল রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনধারণের মানোন্নয়নই প্রধান এবং প্রাথমিক স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় উপ মহাদেশে এই ব্যবস্থা বারংবার কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত হইলেও বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় নাই। মুসলিম লীগকে কংগ্রেস উগ্র সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায় যে এই মুসলিম লীগ সংগঠন মঞ্চ হইতে কংগ্রেস অপেক্ষা বহু পূর্বে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন অধিকার তারপর পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দাবী উঠিয়াছিল।

কংগ্রেস সকল সময় নিজেকে জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে প্রচার করিয়াছে এবং সম্ভবপর কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দলে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিল। অর্থাৎ এই সকল মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল সমূহ কংগ্রেসের মত মনে করিত যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান প্রধান এবং প্রথম নহে, বিশেষ করিয়া যে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বাস করে। তাহা ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে

বিতাড়িত করিতে হইলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে কার্য করা বাঞ্ছনীয়। মুসলিম লীগের সহিত ইহাদের মতপার্থক্য যতটুকু ছিল নীতিগতভাবে কংগ্রেসের সঙ্গেও ততটুকু ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা কংগ্রেসের সহিত একীভূত হয় নাই। আর কংগ্রেসও তাহাদের অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই। অথচ দেখা যায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগকে প্রতিক্রিয়াশীল উগ্র সাম্প্রদায়িক দল বলিয়া তাহার সহিত কোন প্রকার সমঝোতা না করিবার কিংবা তাহার ধ্বংস কামনা করিবার কোনও কারণ থাকিলে এই সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলগুলিকে কংগ্রেসভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঐ সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিলেও এমন কোন কারণ ছিল যাহার জন্য তাহারা কংগ্রেসের সহিত সর্ব বিষয়ে একমত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক কার্যোদ্ধারের জন্য মতবিরোধ ক্ষেত্রে সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছিল। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে কংগ্রেসের মধ্যেও এমন দুর্বলতা ছিল যাহার জন্য মুসলিম লীগ ব্যতীত ঐ সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল সমূহকে কংগ্রেসী মতবাদে দীক্ষিত করিতে পারে নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলমান নেতৃবর্গ উভয়ই নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সত্তা বজায় রাখিয়া যেমন কার্য করিতেছিলেন তেমনি স্বার্থ সংরক্ষণও করিতেছিলেন—কেহই নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে কিছুমাত্র সরিয়া যাইতে চাহেন নাই, যদিও তাহাদের উভয়ের লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সরকারকে অপসারিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করা।

নেহরু-জিন্নাহ্ পত্রালাপের মধ্যে দেখা যায় নেহরুজী জিন্নাহ্ সাহেবকে তার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন সমস্যাগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতু সৃষ্টি হইয়াছে। জিন্নাহ্ সাহেবও এ বিষয়ে একমত হইয়া উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমাধান ব্যবস্থা করিতে আগ্রহী ছিলেন। দেশের পরিচালনা ব্যবস্থা যখন

রাজনৈতিক কেন্দ্রিক হইয়া থাকে তখন সকল সমস্যার সমাধান রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র-চালনা শক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। সেইজন্য উভয়ের মত প্রায় একই লক্ষ্য বিন্দুতে পতিত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা সমস্যার কথা মিঃ জিন্নাহ্‌র মত অনুযায়ী সত্যিকার সমস্যা বলিয়া পণ্ডিত নেহরু উল্লেখ করায় মিঃ জিন্নাহ্‌ একমত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ উল্লিখিত সমস্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সমস্যা হইতে পারে না। সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রূপে মৌলিক সমস্যার শাখা-প্রশাখা মাত্র। এইরূপ সমস্যাবলীর সমাধানের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাধানের অর্থে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসার শর্ত সম্বলিত চুক্তিপত্র। এইরূপ চুক্তিপত্রের উপরই মিঃ জিন্নাহ্‌ সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল এবং কংগ্রেসের সহিত একমত হইয়া এরূপ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পূর্বে বৃটিশ বিতাড়ন ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তি শর্ত নির্ধারিত হওয়া তো দূরের কথা উভয় পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে দাবী-আদায়ে প্রবৃত্ত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিক্রিয়া

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা আইনগতভাবে কার্যকর করিবার ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, প্রশাসনিক ব্যাপারেও নানা প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জায়গায় নানা প্রকারের সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যাহার প্রতিফলন শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির উপর আসিয়া পড়িতে থাকে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর তিক্ততা, বিভ্রান্তি ও মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সংশয় বৃদ্ধি করিতে থাকে; শ্রীনেহেরু, গান্ধীজী ও মিঃ জিন্নাহর মধ্যে সমাধানের ব্যবস্থা পত্রালাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাহার কারণসমূহ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুসলিম লীগও গত্যন্তর না দেখিয়া সর্বপ্রকারে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে এবং প্রকাশ্য-ভাবেই প্রচার করিতে থাকে যে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগের কোন দাবী সমর্থিত হইবে না। ১৯৩৮ সালে পাটনার অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগের সভায় মিঃ জিন্নাহ্ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, কংগ্রেস পূর্বে যে সকল আদর্শ লইয়া গঠিত হইয়াছিল সে সকল আদর্শ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে এবং ক্রমেই একটি হিন্দু-সংগঠনে প্রবর্তিত হইতেছে। ইহারা ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু-রাজ সৃষ্টি করিতেছে। সেইজন্য মুসলিম লীগ কংগ্রেস কর্তৃক একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রথা প্রবর্তনের বিরোধিতা করিতে স্থির করে। এই বৎসরই অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন আহূত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বিবেচিত হয়। "পাকিস্তান পরীক্ষিত" পুস্তকে (পৃঃ ১১৫) জনাব রেজাউল করিম প্রস্তাবটি সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল :

"ভারতের শান্তি রক্ষার্থে, বিনা বাধায় কৃষি উন্নয়নে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য হিন্দু এবং

মুসলমানদের দুইটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষকে দুইটি যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা: মুসলিম যুক্তরাষ্ট্র এবং হিন্দু যুক্তরাষ্ট্র।"

এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণের পর হইতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে মতভেদ না থাকিলেও ভারতে রাষ্ট্র গঠন ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়; এবং উভয় সংগঠন বিচ্ছিন্ন হইবার অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা: সুভাষ ও জিন্নাহ্

ইহার পরেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত মিঃ জিন্নাহ্‌র আলোচনা চলিতে থাকে। এই আলোচনার মধ্যে মিঃ জিন্নাহ্ একথা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হইতেছে মুসলিম লীগ এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতেছে কংগ্রেস এবং ভারতের প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রূপে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিতে পারে। এইরূপ অবস্থা মানিয়া লইলে মিঃ জিন্নাহ্ তথা মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত সমস্যা সমাধানের আলাপ আলোচনা করিতে পারে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সভা এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাহাতে উল্লেখ করে: "মুসলিম লীগই একমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় কেবলমাত্র এই স্বীকৃতির ভিত্তি ভিন্ন অন্য কোন চুক্তিতে কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের পক্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ আলোচনা সম্ভবপর নহে।"

এইরূপ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য যে কেবলমাত্র কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে কোন প্রকার চুক্তি-সাধনের অধিকার অস্বীকার করিতেছে তাহাই নহে, কংগ্রেসের

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতেছে। স্বভাবতই কংগ্রেসের পক্ষে এরূপ অবস্থা মানিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-সদস্যগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুয়ানী মনোভাবের সমালোচনা করিয়া তাহাদের বক্তব্যের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে কংগ্রেস যতই দ্বিধাগ্রস্ত হইতে লাগিল ততই কংগ্রেসী মুসলমানরাও অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম দলসমূহের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। ইহার পর ১৯৩৮ সালের ২রা আগস্ট মিঃ জিন্নাহ্ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে লেখেন, "লীগ কাউন্সিল এই মত পোষণ করে যে, যেহেতু কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হইবে সেই কারণে উক্ত কমিটিতে অন্য কোন মুসলমান সদস্য গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে, মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসকে যথাক্রমে মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত না করিয়াই ১৯১৮ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং দীর্ঘদিন একযোগে সকল আন্দোলন পরিচালিত হয়। তখন কংগ্রেস যেমন জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কার্যক্রম উল্লেখ করিয়া মুসলিম লীগকে উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে প্রচার করে নাই, তেমনি মুসলিম লীগও কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু-মহাসভার বিশেষ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে নাই। তখনকার দিনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তিশালী উপদল ছিল, যাহারা হিন্দু কিংবা মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষাকে জয়-পরাজয়ের মানদণ্ডে বিচার করিত না। কিন্তু তাহার পর হইতে হিন্দু স্বার্থরক্ষার প্রতি যেমন কিছু সংখ্যক বর্ণহিন্দু ও শিল্পপতি যত্নবান হন এবং তপশীল সম্প্রদায় উপেক্ষিত হইতে থাকে, তেমনি মুসলিম লীগের মধ্যেও কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মুসলমান স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে দেখাইয়া মুসলিম লীগের কার্য-সূচীকে সাম্প্রদায়িক ও হিন্দু স্বার্থবিরোধী বলিয়া কংগ্রেসের ভিতরে

বাহিরে যথেষ্ট আলোড়ন বৃদ্ধি পায়। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ১৯১৮ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির সহিত ১৯২৮ সালের মিঃ জিন্নাহ্ কর্তৃক উত্থিত চৌদ্দ দফা দাবী, যাহার পরিসমাপ্তি ১৯৩৫ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে ঘটে, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য ছিল না; বরং জাতীয়তাবাদী স্বার্থরক্ষার প্রস্তাব যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন যে মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই তাহা কেবলমাত্র ভারতীয়দের ভাগ্য বলিতে পারে।

হিন্দু-মহাসভার উপর নির্ভর

যাহা হউক সাম্প্রদায়িক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপস্থিত হয় যখন মুসলিম লীগ কংগ্রেস ব্যতীত হিন্দু-মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দু-মহাসভার উপর নির্ভর করিত চাহে। তাহার প্রমাণস্বরূপ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের "খণ্ডিত ভারত" (পৃঃ ১৭৭) হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন, "১৯৩৫ সালের তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতির সহিত এই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে সে দাবী উপস্থাপিত হয় নাই (কংগ্রেস ভারতীয় হিন্দুদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন) বরঞ্চ মিঃ জিন্নাহ্ এই কথা বলেন যে, হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যদি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করেন তাহা হইলে একা কংগ্রেসের সহিত চুক্তি সম্পাদনে তিনি অসমর্থ। মিঃ জিন্নাহ্‌র এইরূপ দাবীর ফলেই আলোচনা-প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। কারণ হিন্দু মহাসভার সমর্থন লাভের প্রস্তাব কংগ্রেস সভাপতি মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না।"

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধান : ব্যর্থতার কারণ

এই অবস্থা একটু বিশ্লেষণ করিলে ইহাই বোঝা যায় যে কংগ্রেস সংগঠন হিন্দু-পক্ষ হইতে সমাধান শর্ত মানিয়া লইলে ভারতীয় হিন্দুদের কোন আপত্তি থাকিবে না—এইরূপ প্রভাব কংগ্রেসের ছিল।

যদি এরূপ প্রভাবকে সাম্প্রদায়িকতা-গন্ধ-শূন্য জাতীয়তাবাদী প্রভাব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে মুসলিম লীগের সহিত আলোচনা বন্ধ করিবার কোন প্রকার ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের নিরপেক্ষ নীতি সকল সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই জাতীয়তার আসল উদ্দেশ্য সাধন হইত কিন্তু তাহা না হইয়া বারংবার মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে মুসলিম লীগের সহিত আলোচনা ও সমাধান চুক্তি করিবার প্রয়াস স্বভাবতই তখনকার দিনে কংগ্রেসের মতবাদ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই কারণে বোধহয় ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের এরূপ অবস্থা আরও পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্যই মিঃ জিন্নাহ্ দাবী করেন যে, কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে তাহা কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে আর তাহার পক্ষ হইতে কোন মুসলমান সদস্য আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন না। এইরূপ শর্ত কংগ্রেস স্বীকার করিতে অস্বীকার করায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সন্দেহ ও বিভ্রান্তি

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যখন বিভিন্ন পথ ও মত অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে, তখন দেশে কেবলমাত্র বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ অনুসরণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। সেদিন হইতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমেই সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলাকার ধারণ করিতে থাকে। কোথাও 'বন্দেমাতর'ম গান, কোথাও গরু জবেহ, কোথাও-বা মসজিদের সম্মুখে বাজনা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ইতস্ততঃ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য কিংবা বিবদমান দলগুলির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কংগ্রেস কিংবা জাতীয়তাবাদী

দল সমূহ সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ চেষ্টা করেন নাই। কেবলমাত্র নীতির দোহাই দিয়া এরূপ সংঘর্ষ নিন্দনীয় ও অসামাজিক ঘোষণা করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্বেই ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্ধৃতি দিয়া কংগ্রেসের মনোভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কংগ্রেসের নিরাসক্তি ও তার কারণ

কংগ্রেসের ভয় ছিল। এইরূপ সংঘর্ষ মীমাংসা করিতে গেলে তাহাদের ভুল বুঝিয়া কোন দলের কংগ্রেসবিরোধী হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী এরূপ সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য অনশন করেন এবং পরেও অনশন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও সংঘর্ষ-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস লেখা হইতেছে এবং যখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলিতে থাকে তখন কংগ্রেসের এই সকল নেতাও শান্তি রক্ষার জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই। কখনও এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কখনও বা মিথ্যা রটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল সংঘর্ষ বাধিত এবং তখন জাতীয়তাবাদী যে কোন নেতা একটু চেষ্টা করিলেই অবস্থা শান্ত হইতে পারিত এবং মুসলমানদের মনোভাব কংগ্রেসের অনুকূল হইত। এই কারণেই স্বভাবতই মুসলমানদের মনে কংগ্রেস সম্বন্ধে সংশয় জাগিতে থাকে।

মুসলিম লীগকে যদি কংগ্রেসের মত অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল দল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এবং হিন্দু মহাসভাকে সম পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়, আর তাহাদিগের উস্কানী এবং কৃতকর্মের ফলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সমূহ ঘটিতে ছিল এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র সাময়িক শান্তি রক্ষার জন্য নহে, বরং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি দৃঢ়ভিত্তিক এবং দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য, অন্যদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার

মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য কংগ্রেসের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল এইরূপ ঘটনা সমূহের পটভূমিকা উদ্‌ঘাটন করা এবং এই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা; কিন্তু সেরূপ কার্য কোন দিনই কংগ্রেস মহল হইতে করা হয় নাই। বলা হইতে থাকে যে, এই সকল সংঘর্ষ বৃটিশের ভেদনীতির ফলেই ঘটিতেছে এবং বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ইহার সমাপ্তি ঘটিবে। প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে বৃটিশ শাসনের অবসান হইয়াছে কিন্তু আজিও ভারতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির শেষ হয় নাই। তখন বলা হইত যে, মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং অশিক্ষিত হইলেও বৃটিশশক্তির সাহায্যে পুষ্ট বলিয়া সংখ্যাগুরুর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইবার সাহস রাখে। আর এখন বলা হয় যে, সংখ্যালঘু মুসলমান দেশবিভক্তির পর সংখ্যায় আরও কম হইয়া গেলেও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বদনাম করিবার জন্য পাকিস্তানের সহযোগিতায় সংখ্যাগুরু সদস্যদের সহিত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতেছে। এই সকল ঘটনা বিশেষ করিয়া পুজা-পার্বণের সময় ঘটিত এবং মুসলমানদের "বকরা-ঈদের" সময় আশংকা বৃদ্ধি করিত। আর ইহার অন্তরালে যাহারা এরূপ অবাঞ্ছনীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিত তাহারা কোন দোষে দোষী নয় বলিয়া পরিত্রাণ পাইত। কংগ্রেস পক্ষ হইতে বৃটিশ শাসন অবসানের পর সকল অশান্তির বিলোপ ঘটিবে, বর্তমানে কংগ্রেসের পক্ষে কিছু করার নাই, কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করিলে কোন পক্ষ ভুল বুঝিতে পারে ইত্যাদি ঘোষণা ও ব্যবস্থা যে মুসলিম লীগেরও সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সুযোগ করিয়া দিত সে কথা কংগ্রেস পক্ষ জানিয়াও কিছু করিতে পারিত না। কারণ কংগ্রেসের বহু হিন্দু সদস্য এরূপ অবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়াইয়া পড়িত। বৃটিশ সরকার এইরূপ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী একথা বলিলেও শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের এক অংশ কংগ্রেসের নিরপেক্ষতাকে মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক কার্যকলাপ বলিয়া মনে করিতেন না।

জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুসলিম লীগে যোগদানের কারণ

কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা এবং বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা অবসানের পর এই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে, কংগ্রেসের এরূপ মতবাদ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যেও যথেষ্ট সংশয় ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে বলা হয় যে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর এই সকল অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হইয়া যাইবে না, কারণ গণতান্ত্রিক ভারতে কিম্বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হিন্দু প্রাধান্য বজায় থাকিবে। সে ক্ষেত্রে শতকরা ১০/১২ জন মুসলমানের সমস্যা কোন প্রকারেই বিবেচনার বিষয় হইতে পারিবে না। এই রূপ দুঃসহ অবস্থায় সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে সব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রবর্তিত হইয়াছিল সে সব প্রদেশেও মুসলমানদের চাকুরীর ব্যাপারে যে অবস্থা দেখা যাইত—কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা পরিচালিত প্রদেশ সমূহেও হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস সংগঠন ও হিন্দু সাধারণের বিরোধিতার ফলে উপযুক্ত সংখ্যার মুসলমান প্রার্থী চাকুরী পাইত না। এক্ষেত্রে মুসলমানদের জাতীয়তা-বাদী কিংবা মুসলিম লীগ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পৃথক করা সম্ভবপর হইত না। ইহার ফলে বাস্তব অতি স্পষ্ট রূপেই প্রকটিত হইত।

যৌথ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা

এই জন্যই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে অবস্থার চাপে মুসলিম লীগের নিকটবর্তী হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে ভারতের রাজনীতি যখন দোদুল্যমান তখন সকল প্রদেশেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেন। ১৯৩৯ সালে মিরাট অধিবেশনে মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির এক সভায় ভারতীয় মুসলমান-দিগের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কোন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনার জন্য একটি কমিটি

গঠন করে। এই কমিটি ভারতের যৌথ রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা বিবেচনা করেন। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখিয়া ভারতে "যৌথ রাষ্ট্র" গঠনের পূর্ণ বিবরণ সহ মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির সম্মুখে পেশ করেন। যাঁহারা এই পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের জনৈক রাজনীতিবিদ অন্যতম। তিনি ভারতবর্ষকে সিন্ধু অঞ্চলস্থ যুক্তরাষ্ট্র, হিন্দু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, রাজস্থান যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বঙ্গদেশীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিভক্ত করেন। সকল ক্ষেত্রেই তিনি হিন্দু এবং মুসলমান জনসংখ্যার প্রাধান্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্দেশ করেন।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ জাফরুল হাসান ও মহম্মদ আফজাল হোসেন কাদ্‌রী ভারতকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এবং আত্মরক্ষা বিষয়ে সকল রাষ্ট্রকেই একত্রিত হইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এরূপ উল্লেখ করেন। তৃতীয় পরিকল্পনা করেন চৌধুরী রহমত আলি, চতুর্থ পরিকল্পনা করেন ডঃ এম, এ, লতিফ, পঞ্চম পরিকল্পনা করেন স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ এবং শেষ পরিকল্পনা করেন স্যার আব্দুল হারুনের কমিটি। এই পরিকল্পনাগুলিতে ভারতবর্ষকে প্রায় ছয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়। এবং "যৌথরাষ্ট্র" পরিচালনা ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই সালে পরিকল্পনার মধ্যে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে এবং চাকুরী ক্ষেত্রে তাহাদের কিরূপ হার হইতে পারে, তাহাও উল্লিখিত হয়, কিন্তু দেখা যায় যে মুসলিম লীগের একাংশ যেমন এই সকল পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন অপর অংশ ততখানি গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেন এবং অনেকেই খোলাখুলি বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাহারা

এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইবে বলিয়া মনে করেন। এমন কি মিঃ জিন্নাহ্ও পরিকল্পনা সমূহ সম্পর্কে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে সম্মত হন না; বরং তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার মতামত দেওয়ার পূর্বে সামগ্রিকভাবে ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায় পরিকল্পনাগুলি আরও বিবেচনার বিষয়।

কংগ্রেস সব সময় হিন্দু সংগঠন ছিল

এই সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিতে চাহি না। কারণ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন বর্তমানে ঐ সকল পরিকল্পনা একমাত্র ভারতীয় যৌথরাষ্ট্র (কন্ফেডারেশন) সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা মাত্র, তাহার বেশী আর কিছুই নহে। এই সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথমে বিশেষ আলোচনা কিংবা আন্দোলন হয় নাই কিন্তু ১৯৪০ সালের পর হইতে ইহা লইয়া আলোচনা হইতে থাকে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ইহাতে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও এরূপ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। দুঃখের বিষয় হইলেও উল্লেখ করিতে হয় যে সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম লীগ কর্তৃক এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতে থাকে। সেই সকল মূল সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মিলিত চেষ্টা হয় না। বরং কংগ্রেস যে কোন প্রকারেই কেবলমাত্র হিন্দু সংগঠন সৃষ্টি করে এবং ইহা যে হিন্দু-মুসলমানের সংযুক্ত সংগঠন এই মতবাদ জোরদার করিবার জন্য মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করে। একথা সত্য যে কংগ্রেসের প্রথম ও মধ্যজীবনে বহু মুসলমান সদস্য ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন, ১৯৩৯ সালে পুনরায় একজন

মুসলমান সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং কার্যকরী সভার প্রথম তালিকায় চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ চারজন ছিলেন মুসলমান সদস্য। ইহাতেই বোঝা যায় যে, কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের সহযোগিতা কোন সময়ের জন্যই কম ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস যে সকল সময় হিন্দু প্রভাবান্বিত ছিল ইহা সকলে স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা মনে প্রাণে চাহিতেন বলিয়াই দলমত নির্বিশেষে সকল সংগঠনে যোগদান করিয়াছেন ইহাও সর্বজন স্বীকৃত।

আজাদ-গান্ধীর মত পার্থক্য

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং খুব অল্পদিনের মধ্যে জার্মান শক্তি ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রকে পরাজিত করে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সক্রিয় অভিযান চালায়, ভারতবর্ষও ঔপনিবেশিক রাজ্য হিসাবে পরোক্ষভাবে যুদ্ধের সহিত জড়াইয়া পড়ে। বৃটিশ সরকার ভারতের সকল সংগঠন এবং সামন্ত রাজ্যগুলির নিকট হইতে সাহায্য আশা করে। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ এবং গান্ধীজীর মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশের সহিত সহযোগিতার প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দেয়। গান্ধীজী ভারতের অহিংসনীতির মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া মনে করেন, আর কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ ব্যক্ত করেন যে বৃটিশ সরকার যদি ভারতের স্বাধীনতা দাবী স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেস সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে। এই মতপার্থক্যের জন্য কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এমন কি অনেক সদস্য সভাপতি মওলানা আজাদের পক্ষ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী মত পরিবর্তন করেন এবং মাওলানা আজাদের মত সমর্থন করেন ইহার ফলে কংগ্রেসের দলীয় ভাঙন রক্ষা পায়।

সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনই লক্ষ্য, এবং এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যাচার ও বৃটিশ সরকারের সকল প্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংসা কার্যক্রম অস্ত্র মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধে সহযোগিতা সম্ভবপর হয় না; কারণ বৃটিশ সরকার এরূপ বিপর্যয়ের দিনেও ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা দানের অঙ্গীকার করিতে সম্মত হয় না। কংগ্রেস বৃটিশের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা স্থির করে; এবং সরকারও শেষ পর্যন্ত নেতাদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করে।

মুসলিম লীগের সন্দেহ

মুসলিম লীগও খোলাখুলি যুদ্ধে যোগদান করিতে সম্মত হয় না। তাহারাও শর্তসাপেক্ষে যোগদানে মত প্রকাশ করে। কংগ্রেস ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল, আর মুসলিম লীগ এই বৎসরের মাঝখানে বিরাট সম্মেলনে ভারতবর্ষকে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া যৌথরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এখন তাহাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হইল যে, বৃটিশ সরকার হয়তো বা অবস্থার চাপে পড়িয়া কংগ্রেসের সহিত একতরফা চুক্তি করিতে পারে। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড় লাট ঘোষণা করেন যে কোন যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের প্রশ্নই উঠুক না কেন, তাহা যুদ্ধকালীন সময়ের মধ্যে বিবেচিত হইবে না। এরূপ ঘোষণার পরেই মুসলিম লীগ দাবী করে যে ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের ভারত আইন পুনরায় বিবেচনা করিতে হইবে এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোন ঘোষণা তাহা মতবাদাদর্শক অপর যে-কোন বিষয় সম্পর্কেই হউক না কেন; মুসলিম লীগের তথা ভারতীয় মুসলমানদিগের সমর্থন ব্যতিরেকে সরকার পক্ষ হইতে করা চলিবে না।

১৯৩৯ সালের ১৮ই অক্টোবর ভারতের বড় লাট সরকার পক্ষ

হইতে ঘোষণা করেন যে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র প্রয়োজনবোধে পুনরায় পরীক্ষা এবং বিবেচনা করা হইবে, এবং ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তনের স্থায়িত্ব ও স্বার্থকতা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের ইচ্ছা পূরণের গুরুত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে সম্রাটের সরকার কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন না। সুতরাং আপনাদের সমাজের ভারতীয় জনমতের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার কিছুমাত্র লাঘব হইবে, এরূপ আশংকা আপনারা মনে স্থান দিবেন না।) কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। মিঃ জিন্নাহ্, মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৪০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বড় লাটকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন :

"অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার ঘোষণা মুসলিম লীগের দাবীর পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, কারণ ইহা দ্বারা নয় কোটি জনসংখ্যা সম্বলিত একটা সমাজকে কেবলমাত্র মন্ত্রণা ও পরামর্শ দানের পর্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়া বৃটিশ ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব ও অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আপনার সরকার অযথা অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থচিন্তা করিতেছেন। ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে হয়তো বৃটিশ সরকার অপর শক্তিশালী সংগঠনের নিকট নতি স্বীকার করিতে পারেন, সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হইবে তাহাই নহে ভারতের মুসলমানদের জন্য ভবিষ্যৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইতে পারে।"

লাহোর প্রস্তাব

সরকারকে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখিয়াই মুসলিম লীগ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই সাংগঠনিক ব্যাপারেও তাহারা তৎপর হইয়া উঠে। তাহার একমাত্র কারণ একদিকে কংগ্রেসের সহিত হিন্দু

মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে অনিশ্চয়তা। তাহার সহিত কংগ্রেস কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা কয়েকটি শর্ত সম্পর্কে কঠোর বিরোধিতা। যাহার ফলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিকট হইতে কোন প্রকার মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের কোনরূপ সহযোগিতা পাইবে না বলিয়া ধারণা করিতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে যুদ্ধের গতি এবং বৃটিশ সরকারের বিপর্যয় যেভাবে তখন ঘটিতেছিল, হয়তো কার্যোদ্ধারের জন্য সরকার ভারতের বৃহত্তম সংগঠনের সহিত মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া নিজেদের দাবীকে আরও জোরদার করিবার জন্য ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব বলিয়া সর্বজন বিদিত। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক।

১। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি ও কাউন্সিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট, ১৭/১৮ই সেপ্টেম্বর, ২২শে অক্টোবর ও ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের গৃহীত প্রস্তাবক্রমে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এই সভা তাহা সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে, এবং এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অঙ্গীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এ দেশের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অচল; এবং মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণের একেবারে অযোগ্য।

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যে নীতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত ভারতের সমস্ত দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শক্রমে তা পুনর্বিবেচিত হইবে বলিয়া সম্রাটের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বড়লাট ১৯৩৯ সালে ১৮ই অক্টোবর তারিখে ঘোষণা প্রচারিত করেন; এই সভা তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমগ্র শাসনতান্ত্রিক

পরিকল্পনাটি যদি নূতন করিয়া আদ্যন্ত পরীক্ষিত না হয় তাহা হইলে মুসলিম ভারত সন্তুষ্ট হইবে না এবং তাহাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিকল্পনা তাহাদের পক্ষে বিবেচিত হইবে না।

৩। প্রস্তাব করিতেছে যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বর্তমান অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত নয়—এমন কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী ও মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ভৌগোলিক দিক দিয়া সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস দ্বারা এরূপভাবে পৃথকীকৃত ও গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম, ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে লইয়া এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় যে তাহার অন্তর্ভুক্ত উপাদান সমূহের প্রত্যেকটি হইবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

৪। এই সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের ধর্মগত কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন বিভাগীয় ও অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শ ক্রমে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে যথোপযুক্ত কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষাব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল সমূহের মুসলমানরা যেখানে সংখ্যালঘু, সে স্থানেও বিশেষ করিয়া মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও ক্রমে যথোপযুক্ত কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষা ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে।

এই সভা মৌলিক নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া এমন এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামো রচনার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে অধিকার দিতেছে; যাহার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পক্ষে দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র, যানবাহন, শুল্ক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বিধান থাকে।

মুসলিম লীগ কর্তৃক এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ভারত সচিব 'হাউস অব লর্ডস'-এ এক বিবৃতি দেন। ভারতের বড় লাট এ বিবৃতিটি পত্রাকারে ১৯শে এপ্রিল মিস্টার জিন্নাহ্‌র নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতে উল্লেখ করেন, ভারতের সমস্ত দল ও স্বার্থের প্রতিনিধিবর্গের সহিত পরামর্শক্রমে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সমগ্র ক্ষেত্রটি পুনরায় পর্যালোচনা করিবার পক্ষে সম্রাটের গভর্ণমেন্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার মর্ম নির্দেশাত্মক নহে, বরং আপোষ আলোচনামূলক। অখণ্ড যে স্বপ্ন শত শত ভারতীয় ও ইংরেজগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা যদি স্বার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সংগতি প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস হয় না যে, এদেশের গভর্ণমেন্ট অথবা পার্লিয়ামেন্ট কোন সম্প্রদায়ের উপর, যথা : আট কোটি মুসলমান সমাজের উপর, বলপূর্বক এরূপ শাসনতন্ত্র আরোপ করিতে পারেন—যাহার মধ্যে তাহাদের শান্তি ও মনোজ্ঞপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

লাহোর প্রস্তাব ঃ প্রতিক্রিয়া

মুসলিম লীগ কর্তৃক পূর্বোল্লেখিত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে পাকিস্তান দাবীর প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা দেখা দেয়। হিন্দু এবং মুসলমান যাহারা রাজনীতিকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ভারতের নৈতিক এবং ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েক মাসের ব্যবধানে মুসলিম লীগ কর্তৃক পরপর দুইটি প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী হইয়া উঠেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মুসলিম লীগের নেতাদের এ বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে থাকেন কিন্তু কোন প্রকার ব্যাখ্যা না পাইয়া এইরূপ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হন এবং মনে করেন যে ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে বোঝাপড়া করিবার পন্থা হিসাবে জনমত এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অপেক্ষা তাহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও দলীয় আদর্শ অনুযায়ী নানা প্রকার রাজনৈতিক সংঘাতে লিপ্ত হইয়া পড়েন। কেহ কেহ মুসলিম লীগের এই সকল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়া ইহার ভিত্তিহীন অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করিবার জন্য নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন সমূহ নতুন উদ্যমে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করিয়া একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইহারা ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ২৭ শে এপ্রিল সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্সের সভাপতিত্বে দিল্লীতে একটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন আহবান করে। (মুসলিম রাজনীতি পৃঃ ৫৭)

শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, এই সভার সভাপতি মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ব এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা ও অসারত্ব ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে ভারতের নয় কোটি মুসলমান ভারতের আদি অধিবাসীদের বংশধর ও উত্তরাধিকারী এবং তাহারা এই মাটিরই সন্তান। তিনি আরও বলেন যে ধর্মান্তর কোনক্রমে জাতীয়তা পৃথক করিতে পারে না। মুসলিম লীগের দাবী 'মুসলিম লীগই একমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠন'—এই মতের তিনি বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলেন, ইহার পরে মুসলমানদের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইবে।

বর্তমান অবস্থায় হিন্দু মহাসভা সম্পর্ক সরকারের দায়িত্ব পালন সম্ভবতঃ শেষ হইয়াছিল। তাই হিন্দু মহাসভাকে সরকার পক্ষ বিশেষ আমল দিবার প্রয়োজন মনে করে নাই। হিন্দু মহাসভার প্রস্তাব-গুলিও আর সরকারের নিকট বিবেচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সাংগঠনিক শক্তি প্রসারিত না হইলে তাহারা ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া মুসলিম লীগ ক্রমেই কংগ্রেস সংগঠনের নিরপেক্ষ নীতির প্রতি আরও বেশী সন্দিহান হইয়া উঠে। কংগ্রেসের এই সকল নেতারা খোলাখুলিভাবেই প্রচার করিতে থাকেন যে, মুসলিম লীগের দাবীগুলি হিন্দুদের আরও সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহারা বুঝিতে চান না যে, ইহার পূর্ব হইতেই কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। ফলে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী পটভূমিকা গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্র-দায়ের চাপের মুখে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনে প্রবর্তিত হই-য়াছে। সরকারও কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের সংগঠন হিসাবে কতখানি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়া চলে তাহা লক্ষ্য করিতে থাকে। কারণ হিন্দু মহাসভাকে সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে গ্রহণ করিলেও হিন্দুদের

স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে কংগ্রেসের বক্তব্য সমূহকে সরকার উপযুক্ত এবং অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে এবং এক শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে মুসলিম লীগ কথিত হিন্দুদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বক্তব্য অনেকখানি সমর্থন পায়।

কংগ্রেস যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করলেও সরকার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কংগ্রেসের বিরোধিতা মুসলিম লীগের টালবাহানা সত্ত্বেও ভারতের অসংখ্য শিক্ষিত বর্ণহিন্দু, তফসীল, পাঞ্জাবী শিখ গুর্খা ও করদ এবং সামন্ত রাজ্যগুলির অধিবাসীরা যুদ্ধে যোগদান করিতে থাকে। কংগ্রেসও অবস্থা বুঝিয়া যুদ্ধবিরোধী গণআন্দোলন অপেক্ষা ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলন করা শ্রেয় মনে করে। সরকারও আইনের আওতায় সুযোগ লইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলনকারীদের কারাপ্রাচীরে অন্তরালে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ বড় লাটের ১৯শে এপ্রিল তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী সন্তুষ্ট হয় না এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিবে তাহাও বলে না। এ বিষয়ে 'ভারতের মুসলিম রাজনীতি' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭) শ্রীবিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "লীগের কার্যকরী সমিতি বড়লাটের ঘোষণায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে না এবং যে সকল প্রদেশে ক্ষমতা প্রাধান্য ছিল সেই সকল প্রদেশে বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য কোন প্রকার বাধা দেওয়া হয় না। যদিও নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুসলিম লীগ সরকারের যুদ্ধকালীন সাহায্য ব্যাপারে সহযোগিতা করে নাই তাহা হইলেও লীগ মন্ত্রীদের মাধ্যমে সাহায্যে বাধা দেয় নাই। সংগঠন সমূহ ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল জনগণ দারিদ্র্যের চাপে ভাত-রুটির বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাহারও বাধা-বিপত্তি মানিবে না।

কংগ্রেস নেতৃবর্গের অনেকেই তখন কারাগারে, মুসলিম লীগ সাংগঠনিক প্রস্তাবের মাধ্যমে যুদ্ধে সাহায্য না করিলেও পরোক্ষভাবে একদিকে সহযোগিতা করিয়াছে অন্যদিকে সরকারের সহিত পত্রালাপ

করিয়া নিজেদের দাবী সমর্থনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বৃটিশ সরকার অবস্থা বুঝিয়া ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট বড় লাটের মাধ্যমে আর একটি বিবৃতি প্রচার করেন। 'খণ্ডিত ভারত' হইয়াছে "১৯৩৫ সালের সমগ্র ভারত শাসন আইনটি ভারতীয় গঠনতান্ত্রিকতার দিক হইতে পুনঃ পরীক্ষা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে ঘোষণা প্রচার করেন তাহার উল্লেখ করিয়া বড় লাট বলেন, ভারতের জাতীয় জীবনের একটি বিরাট ও বলশালী অংশ যে শাসনব্যবস্থার বিরোধী তাহার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা কিংবা অনিচ্ছুক জন সমষ্টিকে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করার কথা গভর্ণমেন্ট কল্পনাও করিতে পারে না। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ভারতীয় শাসন যন্ত্রের কাঠামো রচনার জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান অংশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে।" (পৃঃ ৮০)

যে সামরিক পরামর্শ পরিষদ গঠনের কথা মুসলিম লীগ জানাইয়াছিল, সে সম্পর্কে বড় লাট উল্লেখ করেন, "সামরিক পরামর্শ পরিষদ' গঠনের উদ্দেশ্যে বড় লাটের শাসন পরিষদে যোগ দিবার জন্য কতিপয় প্রতিনিধি স্থানীয় ভারতীয়কে আহ্বান করিবার সরকারী ইচ্ছাও তিনি জ্ঞাপন করিলেন।"

হাউস অব কমন্সে বড় লাটের এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে-আলোচনা কালে মিঃ আমেরি ভারতীয় মতবিরোধের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার জন্য ঐক্যবাদ, বিভিন্ন বিরোধী দলগুলির সহিত গভর্ণমেন্টের সংঘর্ষ ততখানি দায়ী নয় যতখানি দায়ী ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান অংশগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ। কাজেই এই অচল অবস্থার সমাধান ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সহিত সম্রাটের গভর্ণমেন্টের চুক্তি সম্পাদনের সহজ পন্থার দ্বারা সাধিত হইবে না। তাহার জন্য এমন বহু বিভিন্ন দলের ভিতর চুক্তি সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হইবে, সম্রাটের গভর্ণমেন্ট যাহাদের মধ্যে অন্যতম সংশ্লিষ্ট পক্ষ মাত্র।" অন্যান্য পক্ষ সমূহের মধ্যে তিনি নাম উল্লেখ করিলেন, "মুসলমান ও তপশীল ভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের।"

সম্প্রীতির ব্যাপারে কংগ্রেসের ধারণা

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বৃটিশ সরকার অতি বড় দুর্দিনেও যখন জার্মান সৈন্যের নিকট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত হইতেছিল, তখনও সামরিক সাহায্য বা ভারতীয়গণের পূর্ণ সহযোগিতার আশা করা অপেক্ষা ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ভারতীয়দের নিকট হইতে যুদ্ধের সাহায্য কিংবা সহযোগিতা সম্পর্কে কোন প্রকার বাধা থাকে নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতের অন্তর্বিরোধে নানা প্রকার পরস্পরবিরোধী ঘটনার দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ জটিল অবস্থা করিয়া তোলে তাহার সুযোগ, তৃতীয়তঃ যুদ্ধের প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেলেও জয়-পরাজয়ের পালা কোন পর্যায়ে পেঁছাইতে পারে সে বিষয়ে সরকার পক্ষে অনিশ্চয়তা। তখনও কংগ্রেস পক্ষ হইতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান ব্যবস্থা না করিয়া বলা হইতে থাকে যে অন্তর্বিরোধ যাহা কিছু আছে তাহা বৃটিশ শাসন অবসানের পরেই শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু একদল হিন্দু নেতা মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব এবং হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি এই তত্বের প্রতি সমর্থন জানান। ইহার ফলে জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হইয়া উঠে, কিন্তু বড় লাট এবং মিঃ আমেরির ঘোষণার পর ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্নাহ্‌ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "বৃটিশ গভর্নমেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার কোন ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হইতেছে না; তাহারা নয় কোটি সভ্য মানুষ সম্বলিত বিরাট মুসলমান জাতির ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন।"

এইরূপ বিবৃতির ফলে মিঃ জিন্নাহ্‌ ভারতের স্বাধীনতা এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাহেন তাহা ; মালোচনা চলিতে থাকে।

বিংশ অধ্যায়

before July, 1940

মুসলিম লীগের দাবী ।

পূর্ববর্ণিত অবস্থার মধ্যে যখন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করিতেছিল সেই সময় মিঃ জিন্নাহ্ বড় লাটের সহিত আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেন।

১। ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মুসলিম অধিকৃত অঞ্চল গঠন করিবার যে প্রস্তাব মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে গ্রহণ করিয়াছে তাহার মূল নীতির বিরুদ্ধে কোন ঘোষণা অথবা বিবৃতি সম্রাটের গভর্নমেণ্ট প্রচার করিবেন না।

২। মুসলিম ভারতের সম্মতি ও সমর্থন পূর্বাহ্নে সংগ্রহ না করিয়া ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্তবর্তীকালীন অথবা চূড়ান্ত কোন পরিকল্পনা গৃহীত হইবে না। সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

৩। কেন্দ্রে ও প্রদেশ সমূহে গভর্ণমেণ্ট মুসলিম নেতৃত্বকে যদি কংগ্রেসের মত সমপর্যায়ের মর্যাদা ও সমান সহযোগীরূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে যুদ্ধোদ্যম দ্রুততর, তীব্রতর করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সমর্থন ও সঙ্গতি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব।

৪। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাময়িকভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে।

ক। বর্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে বড় লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করিতে হইবে, উল্লেখ থাকে যে কংগ্রেস যদি শাসন পরিষদে প্রবেশ করে তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধি সম সংখ্যক হইবে। আর কংগ্রেস যদি না আসে তাহা হইলে অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যার মধ্যে মুসলমান সদস্যই হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেননা সে ক্ষেত্রে শাসন কার্য পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে মুসলিম লীগের উপর।

খ। অন্যান পনেরো জন সদস্য লইয়া একটি সমর পরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং তাহার সভাপতি হইবেন বড় লাট স্বয়ং। ঐ ক্ষেত্রে কংগ্রেস আসিলে হিন্দু মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হইবে সমান সমান এবং কংগ্রেস না আসিলে মুসলমান প্রতিনিধিও হইবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গ। সর্বশেষ প্রস্তাবিত সমর পরিষদে, বড় লাটের শাসন পরিষদে ও বড় লাটের অতিরিক্ত উপদেষ্টাগণের মধ্যে যে সকল মুসলমান সদস্য লওয়া হইবে তাঁহারা মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

মুসলিম লীগ এই সকল দাবীর মাধ্যমে কংগ্রেসের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন মতবাদ প্রচার করিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে পরোক্ষভাবে সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন হিসাবে স্বীকার করাইয়া লইতে চাহে। এইসব প্রস্তাবগুলি একটি সাম্প্রদায়িক দল কর্তৃক উত্থিত এবং আর একটি সাম্প্রদায়িক দলের (কংগ্রেস) সম মর্যাদা পাইতে চাহে এবং এগুলি হইলেও পরবর্তীকালের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করিবার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

•

মুসলিম লীগের দাবী সম্পর্কে রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তব্য

উপরি উক্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "বড় লাটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এরূপ দাবীর অর্থ মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্য ১৯৪০ খৃস্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে মিঃ জিন্নাহর নোটের উত্তরে তিনি জানাইলেন, মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু দায়িত্ব হইবে সমষ্টিগতভাবে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের। বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য রূপে কে কে গৃহীত হইবেন বড় লাটের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত সচীব তাহা স্থির করিবেন। ইহাই

হইল প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার প্রথা। কাজেই তাহারা কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইতে পারেন না—সে রাজনৈতিক দল যত বৃহৎ ও বলশালী হউক না কেন। তিনি আরও বলিলেন, আমি একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিতে চাহি যে, বড় লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদের অথবা উহার বেসরকারী উপদেষ্টারূপে যেসকল মুসলমান সদস্য গৃহীত হইবেন, তাঁহাদের মনোনয়নের দায়িত্ব মুসলিম লীগের উপর অর্পণ করা নিয়মতান্ত্রিক দিক দিয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রয়োজনবোধে কাহারো নাম যদি আপনি প্রস্তাব করেন তাহা যথাযোগ্য গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে না, এইরূপ আশংকা করিবার কোন হেতু নাই।" (খণ্ডিত ভারত, ১৮০ পৃঃ)

পাকিস্তান অর্জনের শপথ

ইহার পর মুসলিম লীগ বুঝিতে পারে যে, বৃটিশ সরকারের সহিত দর কষাকষি করিয়া আর বিশেষ কোন ফল হইবে না। সেই জন্য ১৯৪১ খৃস্টাব্দে লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে পাকিস্তান অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবার শপথ গ্রহণ করা হয়। ইহার পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া যায়, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। ইতিমধ্যে ভারত হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অন্তরীণ অবস্থায় পলায়ন করেন এবং প্রথমে রাশিয়া তাহার পর জার্মানী হইতে রেডিও মারফৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কিছুদিন পর জাপান কর্তৃক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে জাপানের অগ্রগতি সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তোলে। ভারত সরকারও নূতন করিয়া ভারতের ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করিয়া আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

চিয়াং কাইশেকের ভারতে আগমন

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীনের একচ্ছত্র নেতা জেনারেল চিয়াং কাইশেক এবং তাঁহার স্ত্রী ভারতে আসেন। তিনি কংগ্রেসের

নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং যাহাতে সকলেই যুদ্ধকার্যে যথোপযুক্ত সাহায্য এবং সহযোগিতা করেন তাহার জন্য অনুরোধ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সহযোগীরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা আজাদ পরিষ্কারভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করা হইবে, বৃটিশ সরকার এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে ভারতীয়দের পক্ষে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করিবার কোন প্রকার বাধা নাই। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিকতার পক্ষে থাকিতে চাহেন কিনা ? জেনারেল চিয়াং কাইশেকের এই রকম প্রশ্নে মওলানা আজাদ বলেন যে, যুদ্ধ শেষে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় কংগ্রেসকে সর্ব বিভাগে স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দিলে বর্তমান ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন মানিয়া লইয়া সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে জেনারেল চিয়াং কাইশেক বৃটিশ সরকারকে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান ত্বরান্বিত করিবার আবেদন জানান। জার্মানী কর্তৃক পার্লহারবার আক্রান্ত হইবার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট ও ভারতীয় নেতাদের সহিত সহযোগিতার জন্য ইংরাজ সরকারের উপর চাপ দেন। ক্রমশঃ যুদ্ধের যেরূপ অবনতি ঘটিতেছিল, তাহাতে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া সকলে উপলব্ধি করেন।

বিপন্ন বৃটিশের দ্বিধা

কিন্তু বৃটিশ সরকার বিপন্ন হইলেও ভারতের সহিত এত শীঘ্র মীমাংসা করিতে চাহে না। সেইজন্য নানা কারণ দর্শাইয়া গড়িমসি করিতে থাকেন এবং মিঃ আমেরী ও ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্বের ধুয়া তুলিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটি এড়াইয়া যান। কিন্তু

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যহ নানা প্রকার বিপর্যয় ঘটিতে থাকে। সকল অবস্থা এবং সহযোগী শক্তিগুলির মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের সহিত রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা কল্পে নূতন করিয়া আলোচনা চাহে। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস, লর্ড পেথিক লরেন্স এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজান্ডার ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন এবং নেতাদের সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের দূত হিসাবে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। উল্লেখ থাকে যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস বৃটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন মন্ত্রী-সভার সদস্য ছিলেন এবং রাশিয়াকে মিত্রপক্ষের সহিত যোগদান করিতে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন; রাশিয়ার সঙ্গে কৃতকার্য সম্পাদনে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ইহার পূর্বেও তিনি কিছুদিনের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন ওয়ার্ধায় থাকিয়া কংগ্রেসের নেতৃবর্গের সহিত পরিচিত হন এবং রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। তিনি দূত হিসাবে পুনরায় ভারতে আসিতেছেন শুনিয়া কংগ্রেস মহলে যেমন উৎসাহিত হয়, মুসলিম লীগ মহলে তেমনি সন্দেহ জাগে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স ও তাঁর প্রস্তাব

স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে পেঁাছাইবার পর ভারত সরকার কংগ্রেস এবং মুসলিম নেতৃবর্গকে স্যার স্টাফোর্ডের সহিত মিলিত হইবার এবং আলোচনা করিবার নিমন্ত্রণ জানান। এই সঙ্গে রাজন্য বর্গের প্রতিনিধি হিন্দু মহাসভার এবং সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবক্সকেও নিমন্ত্রণ জানানো হয়। খান বাহাদুর আল্লাবক্স কেবলমাত্র সিন্ধু প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াই নহে ১৯৪০ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ব এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তাহার

সভাপতি এবং সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেতা স্বরূপ। ২৯শে মার্চ নূতন দিল্লীতে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্যার স্টাফোর্ড একটি প্রস্তাব পেশ করেন, তাহাতে দেখা যায় ভাইসরয়ের বর্তমান একজিকিউটিভ কাউন্সিল ভাঙিয়া দিয়া ভারতীয়গণ কর্তৃক নূতন একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হইবে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও বিবেচনা করিবে—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে সরকার প্রস্তুত আছে। ভাইসরয় নবগঠিত কাউন্সিল সভাপতিরূপে কার্য করিবেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সেক্রেটারী স্টেট ফর ইন্ডিয়া অপরাপর ঔপনিবেশিক সম্পাদকের মতই কার্য করিবেন। ইহার পরিবর্তে ভারতীয়দের সর্বতোভাবে যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে হইবে। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ ভারতীয় রাজনৈতিক দল সমূহ কর্তৃক মনোনীত হইবে না।

আজাদীর আশা

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনের পক্ষ হইতে হঠাৎ প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু উভয় সংগঠনই স্বীকার করে যে এতদিন পর বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে বেশ কিছুটা মনোভাব পরিবর্তন করিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ক্রীপস প্রস্তাবের মধ্যে ভারতীয়দের কাউন্সিলে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি আছে বলিয়া মনে করে। উভয় পক্ষ হইতেই প্রশ্ন জাগে যে এই কাউন্সিলের মধ্যে ভাইসরয় সর্বেসর্বা থাকিবেন এবং কাউন্সিল সদস্যদের কথিত পরিবর্তন যথেষ্ট দায়িত্ব এবং স্বাধীনভাবে কার্য করিবার উপযুক্ত হইবে না। তাহা বুঝিতে পারিয়া ক্রীপস প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইতস্তত করে। কংগ্রেস পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর প্রদেশ সমূহকে ইউনিয়ন সদস্যরূপে থাকিবার কিম্বা বাহিরে থাকিবার

স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। তিনি এ কথাও জানান হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধান হইলেই ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে। এইভাবে রাজন্যবর্গকেও যুদ্ধাবসানের পর ইউনিয়ন কিম্বা ইউনিয়নের বাহিরে থাকিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত দেশরক্ষা সম্পর্কে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কমান্ডার ইন চীফ যুদ্ধ ব্যাপারে সর্বেসর্বা থাকিবেন। এই সকল বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কোন পক্ষই প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় না।

মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

মুসলিম লীগ মহল হইতে বলা হয় যে মিঃ আমেরির ঘোষণা ক্রীপস প্রস্তাব রূপে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাতে কেবল যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে জনানো হইয়াছে। ইহা ব্যতীত হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধান বিষয়ে কোন প্রকার প্রস্তাব কিম্বা শর্ত নাই, এমন কি স্বাধীনতা দিবারও প্রতিশ্রুতি নাই। স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস দৌত্যের সঙ্গে কংগ্রেস পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং তাঁকে সাহায্য করেন কার্যকরী সমিতির সদস্য আসফ আলী। স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস এবং অন্য সদস্যগণ বুঝিতে পারেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই যুদ্ধ ব্যাপারে সর্বাত্মক সাহায্য করিবে না এবং কাউন্সিলে যোগদান করিবে না। মুসলিম লীগের পক্ষে যদিও স্যার স্টাফোর্ড কিছুটা সমর্থন জানাইয়া বলেন যে যুদ্ধ শেষে যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভারত ইউনিয়নের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকিতে পারিবে, তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন অবস্থায় একা মুসলিম লীগের উপর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানে সরকার বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারিবে না একথা জানিতে পারিয়া মুসলিম লীগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

সমূহ বুঝিতে পারে ভারতের স্বাধীনতা ব্যাপারে তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেও তাহাদের উপর সরকার বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয় নাই।

মাওলানা আজাদের বক্তব্য

মওলানা আজাদ তাঁহার "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" পুস্তকে ক্রীপস দৌতের আলোচনা সভা চলাকালীন কংগ্রেস সংগঠন এবং কংগ্রেসী নেতাদের মনোভাব সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি। কারণ ইহা হইতে তখনকার দিনে ভারতীয় সমস্যার সহিত আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা আভাস এবং নেতাদিগের দৃষ্টিভঙ্গীর মোটামুটি অবস্থা বুঝা যাইতে পারে— মওলানা আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন এবং ক্রীপস মিশন ভারতে আসিয়া আলোচনা সভা ডাকিলে তিনিও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভা ডাকিয়া প্রত্যহ কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া কার্যক্রম স্থির করেন। গান্ধীজী প্রথম হইতেই এইরূপ মিশনের সহিত আলোচনার বিরোধী ছিলেন। তাহার প্রধান কারণ তিনি সকল সময় অহিংসনীতি মানিয়া চলিতেন। সেই কারণেই কোন প্রকার অস্ত্র সংঘর্ষের বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সহিত সহযোগিতা নীতি বিরোধী মনে করিতেন। ইহা ব্যতীতও যখন তিনি জানিতে পারেন যে, সরকার যুদ্ধ শেষে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে পার্থক্য মিটাইবার পর ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং কোন প্রদেশের পক্ষে ভারত ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থান করা তাহাদের ইচ্ছাধীন তখন তিনি আরও বিরোধী হইয়া উঠেন। স্যার স্ট্যাফোর্ডের সহিত আলোচনা কালে তিনি বিশেষভাবে নিরামিষ ভোজনের কথাই বেশী আলোচনা করেন; কিন্তু ইহার পূর্বে যখন স্যার স্টাফোর্ড ওয়ার্ধায় থাকিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া একটি স্মারক লিপি লিখিয়াছিলেন সে কথাও তিনি ভুলিয়া যান।

একথা জানিতে পারিয়া স্বাভাবতঃই স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস "দুঃখের বিষয়" বলিয়া অভিহিত করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই যুদ্ধ সকল গণতন্ত্র বিনষ্টকারী বলিয়া গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি কংগ্রেস কর্তৃক ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবার পরও তিনি ভারতবাসীকে যুদ্ধে সহযোগিতা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বেতার মারফৎ একটি ভাষণ দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদের সতর্কতায় তাহা বন্ধ হয়। পণ্ডিত নেহরু এই যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে কতখানি জড়িত থাকতে পারে সে কথা চিন্তা করেন নাই। কেবলমাত্র মওলানা আজাদ যুদ্ধ অবস্থার অবনতি এবং বৃটিশ সরকারের বিপন্ন অবস্থার সুযোগ লইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার চেষ্টায় থাকেন। কিন্তু দেখা যায় তিনি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সমর্থন লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের নিকট হইতে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে অসমর্থ হন এবং ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। যখন এই সকল ঘটনা জনসাধারণ জানিতে পারেন তখন অনেকেই মনে করেন যে ক্রীপস দৌত্য বিফল হইবার অন্যতম কারণ কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সম্মিলিত দাবী উত্থাপনের দুর্বলতা এবং গুরুত্বের অভাব।

গোপালাচারীর প্রচেষ্টা

কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীরাজা গোপালাচারী মনে করিতে থাকেন যে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধান হইলেই ভারতের স্বাধীনতা দান সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের আর কোন অজুহাত থাকিবে না। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির মধ্যে মনে হয় শ্রীগোপালচারী সকল সদস্য অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বেশী করিয়াছিলেন এবং এই কারণেই তিনি গান্ধীজী এবং অপর অপর কংগ্রেসের নেতৃবর্গের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। মিঃ আমেরির ঘোষণার পর তিনি

কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাদের নিকট এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং ক্রীপস দৌত্য অবসানের পর কংগ্রেসের উপর এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। শেষে কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টি'তে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন, "মাদ্রাজের কংগ্রেস লেজিসলেটিভ পার্টি' গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে, বর্তমান বিপদের মোবাবিলা করিবার জন্য ভারতের জাতীয় সরকার গঠনে অকৃতকার্য হইবার ফলে জাতীয়তাবাদী ভারত এক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। কোন একটি শত্রুদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সময় নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকিবার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া আত্মরক্ষার সক্রিয় ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। বর্তমান অবস্থায় সরকার প্রতিষ্ঠায় জন্য সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করা কংগ্রেসের একমাত্র জরুরী কর্তব্য। অতএব মুসলিম লীগ যে কোন সীমানা ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরাইয়া রাখিবার অধিকার স্বীকারের দাবী করিতেছে—যাহা সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী শর্ত; এবং এইরূপ জাতীয় দুর্দিনে যৌথ জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য এই পার্টি' মনে করে এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট সুপারিশ করিতেছে যে, এইরূপ বিপদের দিনে সন্দেহজনক সুযোগের আশায় যুক্ত ভারত গঠনে কলহমূলক পরিস্থিতি রক্ষা করিয়া চলা নিতান্ত ন্যাকামীর নীতি। সেই জন্য কম ক্ষতিকারক কর্মকে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন এবং মুসলিম লীগের বিভক্তি দাবীকে স্বীকার করিয়া লওয়াই উত্তম। যখন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার সময় আসিবে তখন এই বিষয়ে সকল সন্দেহ ও ভয় কাটিয়া যাইবে, তখন একটা যুক্তি পরামর্শের জন্য মুসলিম লীগকেও আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে যাহাতে বর্তমানের জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য একটি যুক্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়।"

শ্রী রাজা গোপালচারীর অভিমত পরে লিপিবদ্ধ করিব; কিন্তু

বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ পার্টি'র প্রস্তাবে প্রকাশ পাইয়াছে "সন্দেহজনক সুযোগের আশায় বিবদমান পরিস্থিতিকে দীর্ঘস্থায়ী করা করা উচিত নহে।" এবং একথাও বলা হইয়াছে, "এইরূপ অবস্থা অবসানের পর লীগের সকল ভয় সংশয় কাটিয়া যাইবে।"

কংগ্রেসের পাশ কাটাইবার নীতি

এই অবস্থাটির বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একদিকে লীগের ভয় এবং সন্দেহ অন্যদিকে সন্দেহজনক সুযোগ অর্থাৎ বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব একা কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করিবার আশা, এই দুইটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস যে বিবদমান পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী করিতেছিল তাহার কারণ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ পার্টি'র প্রস্তাবের জের টানিয়া কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমত, যাহা তিনি 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' পুস্তকে লিখিয়াছেন তাহার উদ্ধৃতি, হইতে অবস্থা পরিষ্কার হইতে পারে। মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে রাজা গোপালাচারী আমার সহিত পরামর্শ করেন নাই কিম্বা তিনি অপর কোন সহকর্মীর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন বলিয়াও জানিতাম না। সংবাদপত্র মারফৎ এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করি। আমাদেরই একজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং সহকর্মী যদি কংগ্রেস কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন তাহা হইলে ইহা কেবল সংগঠনের নিয়মানুবর্তিতা দুর্বল করিবে তাহা নহে; বরং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবে এবং শাসকগোষ্ঠীকে শক্তিশালী করিবে, সেইজন্য আমি বিষয়টি কার্যকরী সমিতির আলোচনার যোগ্য মনে করি এবং রাজা গোপালচারীকে বলি যে, মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ পার্টি'র এই প্রস্তাব কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী। কার্যকরী সমিতির

একজন দায়িত্বশীল সদস্য হইয়া এইরূপ প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত থাকা ঠিক নহে। যদি তিনি সত্যই এই বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব অনুভব করিয়া থাকেন তাহা হইলে এইরূপ মত প্রকাশ করিবার পূর্বে তাহার সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। যদি কার্যকরী সমিতি তাহার সহিত একমত হইতে না পারিত তাহা হইলেই তিনি সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রচার করিতে পারিতেন। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রকৃতি এবং বাস্তব দিকটি দীর্ঘ-দিন যাবৎ পাশ কাটাইয়া যাইবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে যাহার জন্য দেশের রাজনীতি যথেষ্ট বিপর্যস্ত হইয়াছিল এবং জনগণও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা গোপালচারীর বিরুদ্ধে মওলানা সাহেবের উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করিবার ফলে রাজা গোপালচারী মওলানা সাহেবকে একখানি পত্র পাঠান, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি: "এইরূপ মতবাদ আমি কতখানি গভীর ও দৃঢ়ভাবে অনুভব করি তাহা পূর্বেই আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি আমি যে ভাবে চিন্তা করি এবং যে লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য করি তাহা আমার বিশ্বাস কর্তৃক পরিচালিত হয় তাহা যদি জন সাধারণের নিকট প্রকাশ না করি, তাহাদিগকে আমার পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি কর্তব্যভ্রষ্ট হইতেছি বলিয়া মনে করি। আমি অনুভব করি যে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে মিঃ শান্তিরাম কর্তৃক প্রচারিত প্রস্তাব আমি নিশ্চয়ই উত্থাপন করিব। সেই জন্য আমি কার্যকরী সমিতি হইতে আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসার ব্যাপারে কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ যে আমার বেরোধিতা করিবেন সে কথা আমি পূর্বেই জানিতাম।" (ভারতের স্বাধীনতা লাভ: পৃঃ ৬১)

দেশের রজেনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ দোদুল্যমান তখন দেশের অন্তর্বিরোধ মীমাংসা অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ

তখনও সমস্যা সমাধান অপেক্ষা দলীয় মত ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য ব্যাস্ত ছিলেন। ইহা যে কোন রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে লজ্জা-জনক। ১৯২৭ খৃস্টাব্দ হইতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলিম লীগ কর্তৃক চৌদ্দ দফা শর্ত ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেস বিবেচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদিও ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে মীমাংসা নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মুসলিম লীগের পক্ষে কিছুটা উদারতা প্রকাশ করিবার জন্য মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মানিয়া লয় আর কংগ্রেস বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিলেও কুইনাইন বড়ি সেবনের মতই সরকারী আদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু করিতে পারে না। এমন কি এইরূপ শর্ত সাপেক্ষ নীতিকে ভিত্তি করিয়াই কংগ্রেস পরবর্তী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং মন্ত্রীসভা গঠন করে।

এই সময় হইতে মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু এবং মুসলমান রাষ্ট্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ের যথেষ্ট সমালোচনা চলিতে থাকে। এই সকল সমালোচনার মধ্যে উভয় সংগঠনের মতবাদ আক্রান্ত হয় এমনকি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্ম সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা পায় না। এই সকল ঘটনা বর্তমানের সকল আলোচনার বাহিরে। সেইজন্য তখনকার দিনের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল তত্ত্ব এবং তথ্য বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে চাহি না। কারণ এই দুইটি বিষয় এই উপমহাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ অধিকার করিয়া আছে। তাহা সকলের নিকট দিবালোকের মতই সত্যই। সেদিন যাহারা দ্বিজাতি তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকর প্রধান। আর যাহারা ভারতবর্ষকে খণ্ডিত পরিবার ও মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিবার নামে পাকিস্তানের সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রাজা গোপালাচারী, ডঃ আম্বেদকর ও মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার রেডিক্যাল পার্টি এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টী অন্যতম।

পাকিস্তান সম্পর্কে মুসলিম লীগের দ্বিধা

যখন সমস্ত দেশব্যাপী উল্লেখিত তত্ত্বগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছিল তখনও মিঃ জিন্নাহ্ ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয় দুইটি সম্পর্কে কোন প্রকার আলোকপাত করেন নাই বরং চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয় মনে করেন এবং আবহাওয়ার গতি লক্ষ করিতে থাকেন। এই সম্পর্কে ভারতে মুসলিম রাজনীতি পুস্তকে শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিয়াছেন, "মিঃ ফজলুল হক কর্তৃক মুসলিম লীগ অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবকে কার্যকরী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের সত্যকার চিত্র পাওয়া যায় না, এমনকি অনেক সময় বিশেষ ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নাহ্‌র নিকট হইতে এইরূপ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা চাহিলে তিনিও জনসাধারণকে পাশ কাটাইয়া যান। ১৯৪৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিম সাংবাদিকগণ মিঃ জিন্নাকে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, এই বিষয় দুইটি অনুধাবন করিতে আরও সময়ের প্রয়োজন। তাহার পূর্বে আমার পক্ষে পাকিস্তানের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে। পরবর্তী কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও মিঃ জিন্নাহ্ আর কিছুই বলেন না।" (পৃঃ ৬২)

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পাকিস্তানের বাস্তবতাএবং গুরুত্ব সম্পর্কে তখনও মুসলিম লীগ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এবং হয়ত হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস সংগঠন এবং সরকারের উপর চাপ দিবার এক বিশেষ অস্ত্ররূপে এই প্রস্তাব দুইটিকে ব্যবহার করিতেছিল।

এই প্রস্তাব দুইটি অনুধাবন করিতে হইলে কিছুটা পূর্ব ইতিহাস উল্লেখ প্রয়োজন। সে সম্পর্কে খণ্ডিত ভারতের উক্তিটি অনেকখানি আলোকপাত করিতে পারে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দে শাসন সংস্কারের আয়োজন চলিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে দেখা গিয়াছিল সরকার একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে

যখন তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে চলিতেছিল সেই সময়ে জো হেণ্টম্যান সি, আই, এ, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি লেখেন, সমগ্র বৃটিশ ভারত, সমস্ত দেশীয় রাজ্য এবং সমস্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সীমান্ত প্রদেশকে (ভারতকে একজাতিতে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে ভারতের মধ্যে ধরিয়া লওয়া একেবারেই অত্যাবশ্যক) একত্রিত করিয়া একটি বলশালী অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়িয়া তোলা হইবে এই স্বপ্ন উত্তোরত্তর অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে ইহার পরিবর্তে কার্যত সৃষ্টি হইবে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে একটি শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্র। ইহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে ভারতবর্ষের প্রতি নয়, বাহিরের যে মুসলমান জগতের সীমানায় ইহার অবস্থান তাহার প্রতি। ওদিকে দক্ষিণ ও পূর্বভারতে গঠিত হইবে কি? একটি হিন্দুভারত এক ধর্মীয় ও অখণ্ডিত? হয়তো তাই। অথবা হয়তো দেখিব সেখানে একটি বিরাট ভূখণ্ড, প্রাচীন ভারতের অসংখ্য নৃপতি ও পরস্পরবিরোধী জাতীয় বাসস্থান, ইহারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত। অতীতকালে ইহারা এইরূপেই কাল কাটাইয়াছে, ভবিষ্যতেও অতি সহজেই আবার সেই নীতিই ইহারা অবলম্বন করিতে পারিবে।"

বিদেশী চিন্তাশীল রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তখনও ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ছিল গবেষণার বস্তু।

খুব সম্ভবত এই সকল পরিকল্পনা প্রথমে কয়েকজন তরুণ মুসলমান যুবকের মনে উদয় হয়। তাহারা ছিলেন নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরোধী। তাঁহাদের ধারণা ছিল শাসনতন্ত্রের যে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা কোনদিনই কার্যকরী হইবে না। হিন্দুদের জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে মুসলমানদের বলি দেওয়া হইবে। তখন মুসলমানদের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী রহমত আলী (কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট) নামক একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রথম এই

মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি জাতি বলিয়া অভিহিত করিলেন। আন্দোলনটিকেও তিনি একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিলেন। তিনিই এই মত প্রচার করিলেন যে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে একত্র করিয়া একটি পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হউক, ইহার নাম হইবে পাকিস্তান। ডাঃ মুহম্মদ ইকবাল রচিত প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাব এক নয়। ইকবাল বলিয়াছিলেন এই প্রদেশগুলি একত্রে একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং সেই রাষ্ট্রটি নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। চৌধুরী রহমত আলী বলিলেন, এই প্রদেশগুলি একত্রে তাহাদের নিজস্ব একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবে। চৌধুরী রহমত আলী পাকিস্তানের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়া বহু পুস্তিকা বাহির করিলেন এবং পার্লামেন্টের সভ্যদের মধ্যেও গোল টেবিল বৈঠকের সভ্যদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করিলেন। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান কোন ভারতবাসীই এই পুস্তিকাকে কিছুমাত্র আমল দিলেন না। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি যে মুসলমানদের স্বাক্ষর লইলেন তাহারা পাকিস্তান পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদ ব্যক্ত করেন :

এ. ইউসুফ আলী—

"আমি যতদূর জানি এটি একজন ছাত্রের কৃত পরিকল্পনা মাত্র, কোন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা রচনা করেন নাই।"

চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান—

"আমরা যতদূর জানি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে ইহাকে একটি আজগুবি এবং অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছে।"

ডাঃ খলিফা সুজাউদ্দীন—

"সম্ভবত এইটুকুই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, জনসাধারণের প্রতি স্থানীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত এইরূপ কোন পরিকল্পনার কথা ভাবেন নাই।"

গোল টেবিলের এই বৈঠকে পাকিস্তান সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া বড় কথা এই আলোচনা প্রধানতঃ তুলিয়াছিলেন বৃটিশ সভ্যগণ। বৈঠকের বিবরণী দেখিয়া মনে হয় তাঁহারাই এই বিষয়ে বারংবার প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিরা ইহা আলোচনা করিতে কিছুমাত্র আগ্রহ না। দেখাইয়া পরবর্তী সমস্যার আলোচনায় চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কেহ এখনও পাকিস্তানের নামও শুনে নাই, জানে নাই বৈঠকের মুসলমান প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছুমাত্রও উৎসাহ দেখাইলেন না। অথচ ওদিকে বিলাতের রক্ষণশীল দলীয় নেতৃগণ ইহার প্রশংসায় একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহারা অতি মূল্যবান ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাইলেন। ফলে বৃটিশ পার্লামেণ্টে একাধিকবার ইহা লইয়া আলোচনা উত্থাপিত হইল। (শওকতউল্লাহ আনসারী : পাকিস্তান ভারতের সমস্যা, পৃঃ ৪-৭) "ভারতকে খণ্ডিত করার বুদ্ধি মূলতঃ যেখানেই উদ্ভূত হইয়া থাকুক এবং যেরূপ পরিবেশের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকুক, ডঃ আনসারীর এই কথাটি নিঃসংশয়ে সত্য যে ইহার বীজ উর্বর ক্ষেত্রেই পড়িয়াছে এবং সকলের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়াছে।"

সাধারণ ব্যক্তিদের বক্তব্যও একই প্রকারের। পরিবেশ এবং ক্ষেত্র উভয়ই বিষয়টিকে বিস্তৃত এবং ফলে ফুলে সাজাইয়া তুলিতে থাকে। যে প্রস্তাব মুসলিম লীগ দীর্ঘ ছয় বৎসর পর ঘোলাটে চিত্রের মত দেশবাসীকে দেখাইয়াছিল তাহাই ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের গবেষণা-কর্মের মাধ্যমে কিছু দিনের মধ্যে ছকে আঁকা পরিষ্কার সবল একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রে পরিবেশিত হয়। মোহম্মাদ নোমান লিখিয়াছেন, "মুসলমানদের সংখ্যালঘু আখ্যা দেওয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক হইয়াছে। লাহোর প্রস্তাবে তাহা সংশোধিত হয় এবং দুনিয়ার সম্মুখে ঘোষণা করা হয় যে তাহারা একটি জাতি।" (মুসলিম ভারত, ৪০২) কিন্তু তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে মিঃ জিন্নাহ্ কিছুই বলিতে চাহেন না।

মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি

তাহার পর ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে মিঃ জিন্নাহ্ যাহা বলিয়াছিলেন সে বিষয়ে শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, 'ভারতের মুসলমানগণ যে একটি স্বতন্ত্র জাতি সে বিষয়ে বহু অসংযত আলোচনা ১৯৪০ সাল হইতে থাকে। লাহোর মুসলিম লীগ অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ্ সভাপতির ভাষণে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা এবং তাহা ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বলেন যে মুসলমানগণ যে একটি পৃথক জাতি সে বিষয়ে তর্ক না করিয়া বলা যায় যে ভারতের বাস্তব ও বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয় যে, আমাদের হিন্দুগণ কেন যে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের সম্পর্কে সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না তাহা বুঝিয়া উঠা কষ্টের ব্যাপার। ধর্ম-বাক্যটির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমস্যা সকল মোটেই ধর্মীয় নহে, বাস্তবে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র এবং হিন্দু-মুসলমান যে কখনও একটি সাধারণ জাতি সৃষ্টি করিতে পারে তাহা স্বপ্নমাত্র। এইরূপ একটি ভারতীয় জাতির অসত্য ধারণা সকল চিন্তার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং আমাদের সকল দুঃখের কারণ হইয়াছে। যদি বর্তমানে তাহার সংশোধন না হয় তাহা হইলে ভারতের পক্ষে ধ্বংসের পথ বাছিয়া লওয়া হইবে। হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মীয় আদর্শ, সামাজিক ব্যবস্থা ও ভাষা দুইটি পৃথক মতবাদ প্রসূত। তাহারা একসঙ্গে যায় না, বিবাহ করে না। এমন কি তাহাদের জীবনের সভ্যতাও পরস্পরবিরোধী মতবাদ ও চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও জীবনধারা পৃথক। ইহা স্পষ্ট যে হিন্দু ও মুসলমানের আশা-আকাংক্ষা ইতিহাসের বিভিন্ন উৎস হইতে উত্থিত। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাহাদের বীরগণও পৃথক তাহাদের উত্থান পতনও বিভিন্ন। এক সম্প্রদায়ের বীর অন্য সম্প্রদায়ের শত্রু। ইহাদের এক অংশ সংখ্যালঘু এবং অপর অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের এক যোয়ালে জুড়িলে কলহ ও পার্থক্য সকল সময় ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। (ভারতের রাজনীতি ঃ পৃঃ ৬৫)

মিঃ জিন্নাহ্ গান্ধীজীকে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার শেষে উল্লেখ করেন যে মানুষের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক জীবনধারা সকল সময় তাহার জাতীয়তাবাদের প্রমাণ নহে। কিন্তু কোন জাতি ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের সৃষ্ট অপর সরকারের অধীনে দল বাঁধিয়া থাকিতে পারে যদি তাহারা কোন স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কেউ কেউ বলেন বিশেষ করিয়া লীগ মহল হইতে, এইরূপ উক্তির দ্বারা মিঃ জিন্নাহ্ তখনও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কংগ্রেস পক্ষ হইতে কোন প্রাকার মীমাংসার সাড়া পাওয়া যায় না। গান্ধীজীকে এইরূপ পত্র লিখিবার পর মুসলিম লীগ মহল হইতে বলা হইতে থাকে যে, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তাহা দেখাইয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের প্রশাসনিক ব্যাপারের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য। ইহা অপেক্ষা মিঃ জিন্নাহ্‌র পক্ষে আকুল আবেদন আর কি হইতে পারে ?

জনগণের মত

যতদিন যাইতে থাকে ভারতের বিভিন্ন সমাজে নানাভাবে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে এবং জনসাধারণেরও এক বিরাট অংশ যথেষ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া বলিতে থাকেন যে উভয় সংগঠনের মধ্যে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন একটি শ্রেণীর নেতা মীমাংসা চাহেন না তখন লীগের লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। গান্ধীজী এই বিষয়ে কংগ্রেসের এক অংশের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া দেশ-বিভাগ প্রস্তাব মানিয়া লন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ 'খণ্ডিত ভারতে' লিখিয়াছেন, "লীগের ইচ্ছা একটা অস্পষ্ট তত্ত্ব ও অবস্থা পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সকলে সম্মতি প্রদান করুন তাহার তাৎপর্য ও বিশেষ ব্যাখ্যা সমস্ত তাহার পর প্রকাশিত হইবে। তাহার ফল হইবে যে ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন অগ্রিম সম্মতি রাখিবার

দরুণ তখন তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন এবং যদি তাহা না করেন তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি লংঘন ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন। লীগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ অনুদার ধারণা লোকে পোষণ করুক ইহাই তাহার কাম্য।" (পৃঃ ২৫৫)

এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মিঃ জিন্নাহকে এবং লীগ সম্পাদক নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে নিরুত্তর ও নির্বাক থাকিতে দেখিয়া উভয় প্রস্তাবের কার্যকারিতা সম্বন্ধে পরোক্ষ সংশয় বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহার আর একটি কারণ ভারতকে খণ্ড করিয়া যৌথ রাষ্ট্র গঠন, যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও পাকিস্তান হিন্দুস্থান গঠন সম্পর্কে লীগ মহলে বহু পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু শেষোক্ত পরিকল্পনা ব্যতীত কোনটাই গৃহীত হয় না। কিন্তু পাকিস্তান কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সেইজন্য জনসাধারণের অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন যে আগে প্রস্তাব দুইটি হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চাপ ব্যতীত কিছুই নহে। এইরূপ মনোভাব মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাইত, এমন কি তাঁহারা অনেক সময় বলিতেন যে হয় কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসায় আনিতে হইবে নতুবা দেশ বিভক্ত করিয়া সমাধান করিতে হইবে। সেই জন্যই লীগ সভাপতিও সকল সময় ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থাকে নীতিরূপে স্বীকার করাইয়া লইবার উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন, "লীগ সভাপতি বলেন ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থাকে নীতিরূপে সর্বাগ্রে মানিয়া লইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের পৃথক হইবার ধারা ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন সে ক্ষেত্রে পৃথক হইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগে, কিভাবে সে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নির্ধারিত হয় তাহার পর। কিন্তু আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি ও সমর্থন অনুযায়ী শ্রীরাজা গোপালচারী এমন একটি পরিকল্পনা মিঃ জিন্নাহর নিকট উপস্থিত করেন যাহার দ্বারা শ্রীরাজা গোপালচারীর মতে লীগের লাহোর

প্রস্তাবের সকল শর্ত পালিত হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ অজস্র নিন্দায় সেই প্রস্তাবকে বিকৃত করেন। অবস্থা যে কিভাবে পরিবর্তিত হইল তাহা এখানে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ব্যক্তিগত দায়িত্বে হইলেও ভারত বিভাগের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। এখন কবে ও কিভাবে সে ব্যবচ্ছেদ কার্য নিষ্পন্ন হইবে ইহাই হইল প্রশ্ন।" (খণ্ডিত ভারত: ২৫৬ পৃঃ)

পাকিস্তান পরিকল্পনা

এই ঘোষণার পর জনসাধারণ আশা করিল বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার পূর্বে যে নীতি গ্রহণের উপর মিঃ জিন্নাহ্ এতদিন জোর দিয়া আসিতেছেন তাহা যখন স্বীকৃত হইল তখন মিঃ জিন্নাহ্ তাহার তাৎপর্য ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন এবং একটি সুনিশ্চিত প্রস্তাব পরিকল্পনা করাইয়া দেখাইবেন। রাজা গোপালচারী রচিত বিকৃত বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট পরিকল্পনার সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়? কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাহর মধ্যে সুদীর্ঘ পত্রালাপের মধ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও সমগ্র লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে আরও নূতন নূতন দাবী উত্থাপিত হইল, পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রচনার কার্য আদৌ অগ্রসর হইল না। মিঃ জিন্নাহ্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধী ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব নীতিগতভাবে মানিয়া লইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও মিঃ জিন্নাহ্ পুনরায় ধুয়া তুলিলেন ভারত বিভাগীয় সম্বন্ধীয় নিরাভরণ ও নিরলংকার সাধারণ নীতি ও প্রস্তাব সর্বাগ্রে কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবকে নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইবার দাবী পূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু তাহার ফলে বিশদ বিবরণ রচনার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপিত হইল না।"

উদ্ধৃতিটিও তখনকার দিনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া অনেকেই মনে করেন যে রাজনীতি ক্ষেত্রে

মুসলিম লীগের নিকট কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, আর দেশের ও জনসাধারণের হয় সর্বাধিক ক্ষতি। লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাহ্ দীর্ঘ দিন চুপ করিয়াছিলেন একান্ত অপর সকলের অংযত এবং অরাজনৈতিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা লালিত পালিত করিয়া গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবটি স্বীকার করাইয়া লইবেন এবং শ্রীরাজা গোপালাচারী কর্তৃক পাকিস্তানের একটি পরিকল্পনাও তৈয়ারী হইল। অর্থাৎ ১৯২৪ খৃস্টাব্দ হইতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান একবার সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার মধ্যে দেখা গেল এবং আর একবার ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীরাজা গোপালাচারী কর্তৃক মুসলিম লীগের প্রস্তাবগুলি স্বীকৃতির মধ্যে পাওয়া গেল। মুসলিম লীগ মহল হইতে বার বার এই প্রশ্ন হইতে থাকে যে রাজনীতির সকল আন্দোলন সকল প্রকার কার্য চালাইবার জন্য যথেষ্ট সময় কংগ্রেসের আছে কিন্তু মুসলিম লীগের সহিত বৈঠক করিয়া সমস্যা সমাধানের সময় নাই। অথচ লীগের বিরুদ্ধে সমালোচনার মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করিবার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে।

একবিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা

ক্রীপস্ দৌত ব্যর্থ হইবার পর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ সংগঠনের ভিতর এবং বাহিরে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেয় দেখা এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে নূতন করিয়া কোন প্রকার আলাপ আলোচনা চলিতে পারে তাহাও একপ্রকার চিন্তা-বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে থাকে। ইতিপূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ভারত হইতে অন্তর্ধান করেন। জানা যায় যে তিনি প্রথমে রাশিয়া যান এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তিনি জার্মানী চলিয়া যান। তিনি শেষ পর্যন্ত জাপানে উপস্থিত হন। জাপান তখন জার্মানীর পক্ষেও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। জার্মানী যেমন তড়িৎ গতিতে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে জয় লাভ করিয়াছিল, জাপানও সেইরূপ তড়িৎ গতিতে পূর্ব এশিয়া রণাঙ্গনে জয়লাভ করিতে থাকে এবং ভারতে গুজব শুনিতে পাওয়া যায় যে সুভাষ বোস জাপানে পৌঁছিয়াছেন জাপান সরকারের সহিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। জাপান দ্রুত-গতিতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত দখল করিবরে পর ভারতীয়গণ চিন্তা করিতে থাকেন যে ভারত হইতে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ সরকার পালাইয়া যাইবে এবং সুভাষ বোস জাপানের সহযোগিতায় ভারতকে স্বাধীন করিবেন। ভারতবাসী মাত্রই জানিত জাপানের অধিবাসীগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, আর এই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইজন্য জাপানীদের সহিত ভারতবাসীর কোন প্রকার সংঘর্ষ হইতে পারে না। মোটের উপর সাধারণ ভারতবাসীর মনোভাব অনেকখানি জাপানীদের পক্ষে উদার হইতে দেখা যায়। এইরূপ মনোভাব কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যেও যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে; কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস কার্য-করী সমিতি এইরূপ চিন্তার বিরোধিতা করে এবং জাপানকে ভারতের

শত্রুদেশ বলিয়া প্রচার করা হয়। জাপানীরা ভারতে আসিলে রাজনীতি একটি সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, এই আশংকা মুসলিম লীগ মহলেও প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং তাহারাও বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতার সূত্র আরও বিস্তৃততর করিতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজীর মনে সহসা এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ লইবার একটি বিশেষ পরিকল্পনার উদয় হয়। প্রথমে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া মওলনা আজাদ কংগ্রেস সভাপতিরূপে ক্রীপস্ দৌত্যের সম্মুখে যুদ্ধে সহযোগিতা করিবার বিনিময়ে যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ক্রীপস্ মিশন ভারতে আসিবার পূর্বে কংগ্রেস বৃটিশ সরকার বিরোধী কোনরূপ গণ-আন্দোলন করিতে সাহস করে নাই। এবারে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেইরূপ আন্দোলন করিবার পরিকল্পনা করিতে থাকে। স্থির হয় যদিও এইরূপ আন্দোলন অহিংসভাবে পরিচালিত হইবার কথা বলা হইবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্দোলন অহিংসার পথ অতিক্রম করিলেও কোন প্রকার বাধা আরোপ করা হইবে না। এইরূপ আন্দোলন যে গান্ধীজীর অহিংসনীতি বিরোধী এবং কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতি বিরোধী তাহাও জানিতে পারিয়া বাংলা প্রদেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যায়। একদিন গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশ সন্ত্রাসবাদী বাঙালী যুবকদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেসের এই নীতি অনুসরণ অনেকখানি পূর্ববর্তী বিপ্লবীদের আদর্শের অনুসরণ।

যুদ্ধ সহযোগিতায় কংগ্রেসের প্রস্তাব

কংগ্রেসের মধ্যে মওলানা আজাদ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের সহিত গান্ধীজী এবং তাঁহার অনুবর্তীগণের মধ্যে প্রথমে মতবিরোধ দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত একমত হন এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"পরাধীন ভারতবর্ষ কোন প্রকারেই বর্তমান ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু ভারত যে মুহূর্তে স্বাধীনতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করিবে তখনই সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে পারে। ক্রীপস দৌত্যের ফলস্বরূপ বোঝা গিয়াছে বৃটিশ সরকার ভারতের উপর যে কর্তৃত্ব আছে তাহা কোন প্রকারেই আলগা করিবে না। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিম্নতম প্রতিশ্রুতি আদায়ে বিফল হইয়াছে, ফলে ভারতের অধিবাসীরা জাপানের কর্তৃত্বে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ মনোভাবের বিস্তৃতি যদি এখনই বন্ধ করা না যায় তাহা হইলে পরোক্ষভাবে আক্রমণ মানিয়া লওয়া হইবে। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি মনে করে যে এইরূপ আক্রমণ অনতিবিলম্বে বন্ধ করা এবং জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করা উচিত। বর্তমানের বৃটিশবিরোধী মনোভাবকে কংগ্রেস বৃটিশের পক্ষে বন্ধু-সুলভ মনোভাবে পরিবর্তন করিতে এবং যৌথভাবে দেশের এবং পৃথিবীর জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সকল ঝুঁকি লইতে চাহে। ইহা কেবলমাত্র স্বাধীনতা লাভের আশার উপর নির্ভর করিতেছে।

কংগ্রেসের সদস্যরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সকল চেষ্টাই করিয়াছে কিন্তু বিদেশী শক্তির ভেদনীতির জন্য মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই। এইরূপ বিভেদ সৃষ্টিকারী শাসন ব্যবস্থার অবসানের পর সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতের সকল দায়িত্বশীল পুরুষ এবং মহিলা সাময়িক সরকার গঠনের জন্য মিলিত হইবে। দায়িত্বশীল সকল বিভাগের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া ভারত এবং বৃটেনের মধ্যে সর্ববিষয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক স্থির করিবেন এবং মিলিতভাবে যুদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করিবেন।

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা অবসান অর্থে কংগ্রেস গ্রেট বৃটেনের কিম্বা মিত্রশক্তি সমূহকে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকারে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে চাহে না, যাহাতে ভারত কিম্বা চীনের উপর জাপানী কিম্বা অপরাপর শত্রু শক্তির চাপ অধিকতর হইতে পারে। এই অবস্থাও সৃষ্টি করিতে

পারে না। কংগ্রেস প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহে না। বৃটিশ সরকারের অবসান অর্থে বৃটিশ বা সকল ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে এইরূপ বুঝায় না। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সকল ইংরাজ ভারতের অপরাপর নাগরিকের মত নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে পারিবেন।"

এইরূপ প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর হইতে সারা ভারতে যে খুব বেশী চাঞ্চল্য দেখা যায় তাহা নহে, কিন্তু কংগ্রেসের পরবর্তী কার্যক্রম ও আন্দোলন কিরূপ বাস্তব অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে তাহা অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়া ওঠে এবং বৃটিশ শক্তি যেভাবে সকল রণাঙ্গণে পরাজয় স্বীকার করিতে ছিল তাহাতে ভারতের সহিত বোঝাপড়া করা অপেক্ষা আন্দোলন দমন করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে পারে কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয় হয়। একদিকে আন্দোলনের বাস্তবরূপ অপরদিকে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ। তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহা লইয়া যখন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া জনগণের একাংশ দ্বিধা ও সংশয়গ্রস্ত তখন ক্রমেই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের তারিখ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

ভারত ছাড় প্রস্তাব

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবটি "ভারত ছাড় প্রস্তাব" বলিয়া খ্যাত।

"সারা ভারতে কংগ্রেস কমিটি গত ১৯শে জুলাই তারিখে কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব বিবেচনার সাথে সাথেই পরবর্তী ঘটনাসমূহ, যুদ্ধ পরিস্থিতি, বৃটিশ সরকারের দায়িত্বপূর্ণ মুখপাত্রগণের উক্তিসমূহ, যাহার আলোচনা ও সমালোচনা দেশ ও বিদেশে হইয়াছে তাহাদিগকে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছে। এই কমিটি উক্ত প্রস্তাব

এবং পরবর্তী ঘটনা সমূহ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া বলিতেছে যে ভারতের জন্য এবং মিলিত জাতি সমূহের স্বার্থ ও কৃতকার্যের জন্য ইহা স্পষ্ট যে ভারত হইতে বৃটিশ সরকারের ও শাসনের অবসান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে একমত ও তাহা অনুমোদন করিতেছে, এইরূপ শাসন ভারতকে অপমানিত ও দুর্বল করিতেছে এবং ক্রমেই তাহার আত্মরক্ষা ও পৃথিবীর স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কে সাহায্য ব্যাপারে অক্ষম করিয়া তুলিতেছে। এই কমিটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবনতি লক্ষ্য করিয়া রাখিয়া এবং চীনের অধিবাসীদের আত্মরক্ষা এবং স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের সহযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। এইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষতিসমূহ সকল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং মিত্রশক্তির যে নীতি পুনঃপুনঃ অকৃতকার্যের জন্য দায়ী তাহার ভিত্তি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করে। এইরূপ লক্ষ্য, নীতি এবং কর্মপন্থা, যাহা অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী তাহাকে কৃতকার্যতায় পরিবর্তিত করিতে পারিবে, তাহার সহিত সংযুক্ত নহে। কারণ অতীত অভিজ্ঞতা তাহাদের অকৃতকার্যতা যে স্বাভাবিক তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ নীতি যতখানি ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের জনগণের উপর শাসন করিবার ভিত্তিমূলক ততখানি তাহাদের স্বাধীনতার জন্য নহে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঐতিহ্য এবং কর্মপন্থা শাসক শ্রেণী ও শক্তি বৃদ্ধি অপেক্ষা একটি সাম্রাজ্যকে দখলে রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। ভারত বর্তমান সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ স্বরূপ। ভারতের স্বাধীনতার মাধ্যমে বৃটেন এবং রাষ্ট্রসংঘের বিচার হইবে। এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মনে আশার সঞ্চার হইবে। সেইজন্য এই দেশ হইতে বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি প্রধান এবং জরুরী ব্যাপার এবং তাহার উপরই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের কৃতকার্যতা নির্ভর করিতেছে। স্বাধীন ভারত নাজী, ফ্রান্স এবং সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহার সকল সম্পদ লাগাইবার প্রতিশ্রুতি দিবে। ইহা কেবলমাত্র যুদ্ধের ভাগ্যকে

বাস্তবে আঘাত দিবে না বরং সকল নির্যাতিত মানবতাকে সম্মিলিত জাতির পক্ষে আনিবে এবং ভারত যাহার বন্ধু হইবে তাহাকে পৃথিবীর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিবে। পরাধীন ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের উদাহরণ স্বরূপ।

আজিকার দুর্যোগে ভারতকে স্বাধীনতা দান এবং ভারত হইতে বৃটিশের শাসনের অবসান একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন প্রকার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি বর্তমান দুর্যোগে কার্যকরী হইবে না। তাহারা জনগণের মনে উপযুক্ত মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র স্বাধীনতার রশ্মি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মধ্য হইতে শক্তি এবং উদ্যম বাহির করিতে পারে এবং যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তন করিতে পারে।

সেইজন্যই সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনরায় ভারত হইতে বৃটিশ শাসন অপসারণের সর্বাধিক দাবী জানাইতেছে, ভারতে স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে স্বাধীন সরকার গঠিত হইবে এবং ভারত সম্মিলিত জাতি সমূহের বন্ধু হইবে। তাহাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মিলিত কার্য-ক্রমের সহিত সকল পরীক্ষায় অংশ লইবে। দেশের মধ্যে দল-উপদল সমূহের সহযোগিতায় অস্থায়ী সরকার গঠিত হইতে পারে। ইহার প্রাথমিক কার্য হইবে ভারতের আত্মরক্ষা করা; দেশের সর্বপ্রকার সহিংস এবং অহিংস সৈনিক দ্বারা আক্রমণের বাধা দান করা; মিত্রশক্তির সহিত যৌথভাবে দেশের কৃষক এবং শ্রমিকরা, যাহারা দেশের সত্যকার শক্তি এবং মালিক, তাহাদের উন্নতি সাধন করা। সকল শ্রেণীর মানুষের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবার পরিকল্পনা স্থির করাই হইবে অস্থায়ী সরকারের কর্তব্য। এইরূপ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্রের অনুরূপ হইবে এবং ইহাতে সকল রাষ্ট্রের অধিকতর স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়াই কংগ্রেসের লক্ষ্য পারস্পরিক সুবিধা ও সহ-যোগিতা এবং শত্রুর আক্রমণে বাধাদান বিষয়ে ভারতের সহিত মিত্র শক্তিবর্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উক্ত দেশ সমূহের প্রতিনিধিরা সামঞ্জস্য রক্ষা করা স্থির করিবেন। স্বাধীনতা সকল মানুষের যৌথ প্রচেষ্টা এবং

শক্তি দ্বারা ভারতকে শত্রু আক্রমণ হইতে বাধা দিতে কার্যকরী ব্যবস্থা করিবে। ভারতের স্বাধীনতা এশিয়ার অপর সকল পরাধীন জাতিকে গহণ স্বাধীনতা লাভে উৎসাহিত করিবে। বার্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরান, ইরাকও নিশ্চিতভাবে স্বাধীনতা লাভ করিবে। ইহা স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন এই সকল দেশের মধ্যে যাহারা বর্তমানে জাপানের অধীনে আছে, শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে কোন শক্তির কিম্বা ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে থাকিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ বিপদের সময় ভারতের স্বাধীনতা এবং আত্মরক্ষা করাই প্রাথমিক কর্তব্য। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি মনে করে যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা এবং ক্রমোন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে একটি বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অপর কোন উপায়ে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা সমাধান সম্ভব নহে। গ্রেট বৃটেন এবং জাতিসংঘের নিকট কার্যকরী সমিতির আকুল আবেদনের উত্তরে এখনও পর্যন্ত কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই, বহু বিদেশী বর্তমানে ভারত এবং পৃথিবীর প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। যে জাতি তাহার নাগরিকদের শক্তি এবং বিচার-বুদ্ধি সম্পর্কে গর্ব অনুভব করে, তাহার পক্ষে ঐরূপ মনোভাব সহ্য করা যায় না।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর স্বাধীনতার স্বার্থে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি বৃটেন এবং জাতিপুঞ্জের নিকট পুনরায় আবেদন জানাইতেছে, কিন্তু কমিটি মনে করে যে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব সম্পন্ন সরকার, যাহা ভারতের এবং মানবতার স্বার্থে কাজ করিতে বাধা দান করে, এবং শাসন করে, তাহার বিরুদ্ধে জাতিকে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনে বাধা দান করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কমিটি প্রস্তাব করিতেছে যে, অতএব জাতির অধিকার ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অহিংস উপায়ে ভারতের সকল অধিবাসী কর্তৃক সম্ভাব্য সর্বাধিক উপায়ে আন্দোলনের বিধান দিতেছে। যাহাতে গত বাইশ বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণভাবে অহিংসা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহার সবটুকু

যেন কাজে লাগাইতে পারে। এইরূপ আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত হইবে এবং এই কমিটি জাতিকে এই বিষয়ে পথ-প্রদর্শনের জন্য গান্ধীকে নেতৃত্বভার লইতে অনুরোধ করিতেছে। কমিটি ভারতের সকল ব্যক্তির নিকট আবেদন করিতেছে তাহারা যেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিয়মানুবর্তী সৈনিকরূপে তাহাদের ভাগ্যে আপতিত সকল দুঃখ কষ্ট যেন ধৈর্য এবং সাহসের সহিত গ্রহণ করে। তাহারা নিশ্চিতরূপে মনে রাখিবে যে এইরূপ আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অহিংসা ভিত্তিক। এমন সময় আসিতে পারে যখন কোন কংগ্রেস কমিটি কার্য করিতে পারিবে না এবং আমাদের লোকের নিকট আদেশ-নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না বা পেঁছাইবে না। যখন এইরূপ ঘটনা ঘটিবে তখন প্রত্যেকে, যাহারাই এই আন্দোলনে যোগ দিবে, তাহারা যেন (সকল নারী ও পুরুষ) যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারাই চতুর্দিকে শান্তির জন্যই কার্য করে। প্রত্যেক ভারতীয় যিনি স্বাধীনতা লাভের বাসনা করেন এবং তাহার জন্য চেষ্টা করেন তিনি এইরূপ দুর্গম পথে তাহার নিজের পথপ্রদর্শক হইবেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই পথে বিশ্রাম নাই ... ... এইরূপ যুদ্ধ কংগ্রেস কর্তৃক নিজস্ব শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নহে, যখন ক্ষমতা পাওয়া যাইবে তখন সেই ক্ষমতা ভারতের সকল লোকের জন্যই রক্ষিত হইবে।"

বৃটিশ শাসন-বিরোধী সংগ্রাম

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ঐ রাত্রি হইতে কার্যকরী সমিতির সকল সদস্যদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হয়। আর সারা দেশে বৃটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যায়। প্রদেশ ও জেলা সমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপতার চলিতে থাকে। আর ভারতবাসীগণ কর্তৃক যুদ্ধ-সংক্রান্ত কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা হিসাবে টেলিগ্রাফের তার

কাট', রেল-লাইন ধ্বংস করা, রাস্তার পুল নষ্ট করা ইত্যাদি কার্য সুদূর পল্লী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে আন্দোলনের তীব্রতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থানে স্থানে পুলিশ এবং সামরিক শক্তির সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ বাধে। বহু সহস্র ব্যক্তি হতাহত হয়, জেলে নিক্ষিপ্ত হয়, নির্যাতিত হয়। তখন ভারতে বিশেষ করিয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ ও আমেরিকার সৈন্য ও সমরাস্ত্রে পূর্ণ ছিল। আন্দোলন ব্যাহত ও দমন করিতে দীর্ঘদিন সময় লাগে নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আন্দোলন চলিতে থাকে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে বেশ কিছুদিন কাটিয়া যায়।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দমিত হইবার কারণ

এই আন্দোলনে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আন্দোলন কংগ্রেস কর্তৃক আরম্ভ করা হইলেও কেবলমাত্র কংগ্রেসের সদস্যগণই অংশগ্রহণ করেন নাই। ছাপমারা মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট সদস্যগণ এইরূপ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করিলেও নীতিগত আন্দোলনের সহিত অনেকখানি সহযোগিতা করেন। স্থান বিশেষে আন্দোলনের তীব্রতা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও নীতির সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অতি শীঘ্র আন্দোলন দমিত হইবার কারণসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম ঃ

১। যুদ্ধকালীন অবস্থা ও সামরিক আইনের ভীতি,

২। সারা ভারতে বিদেশী সৈনিকের আধিক্য,

৩। যুদ্ধে যোগদানকারী ভারতীয়গণের সংখ্যাধিক্য,

৪। সরকারী কর্মচারীগণের শাসকশ্রেণীর প্রতি আসক্তি,

৫। জমিদার এবং শিল্পপতিগণের সরকারের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন প্রবণতা এবং কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণা পোষণ,

৬। দেশীয় ও করদ রাজ্য সমূহের নৃপতিগণের বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা।

৭। অপরাপর রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের সাংগঠনিক নীতি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনের প্রতি নিরপেক্ষতা ও ঔদা-সীন্য প্রদর্শন।

তখন পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করিয়া মণিপুর, আসাম, বাংলা প্রদেশে যুদ্ধে "পোড়ামাটিনীতি" অবলম্বনের ফলে এই অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ বিসর্জন দেয়। সেই জন্যও এই আন্দোলন পূর্বাঞ্চলে অনেকখানি স্তিমিত হইয়া পড়ে। আন্দোলন চলাকালে বৃটিশ সরকার বুঝিতে পারে যে আন্দোলন অহিংস হইবে; কংগ্রেস কর্তৃক এমত উল্লিখিত হইলেও আসলে অহিংসনীতি অনুসৃত হয় নাই এবং কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ববর্তী আন্দোলন সমূহের মত বিনা দ্বিধায় কেহ কারাবরণ করিতে চাহে নাই এবং এক বিরাট জনসংখ্যা বৃটিশ বুলেটের গুলিতে কারা প্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরে আত্মাহুতি দেয়। ইহা যে শান্তিপ্রিয় অহিংস আন্দোলনের শেষ অধ্যায় তাহা বুঝিতে বৃটিশ সরকারের বিলম্ব হয় নাই।

অরুণা আসফ আলীর ভূমিকা

এই সময় একজন মহিলা কংগ্রেস কর্মী ভারতের বিভিন্ন শহরে সরকারী গোয়েন্দার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া আন্দোলনকে সক্রিয় রাখিবার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন, তিনি হইতেছেন আহমেদ নগর কোর্ট জেলে বন্দী কংগ্রেস কর্মকরী সমিতির সদস্য আসফ আলীর স্ত্রী অরুণা আসফ আলী। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা থাকিলেও তিনি যেভাবে সারা ভারতে আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা ভারতীয় নারী জাতির গর্ব স্বরূপ। দীর্ঘ দুই বৎসর কারান্তরালে থাকিবার সময় মওলানা আজাদের স্ত্রী এবং ভগ্নীর মৃত্যু হয় এবং

সরকারের নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও মওলানা সাহেবকে তাঁর স্ত্রীর মৃতশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ

এই সময়ে বাংলা প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী সকল রাজনৈতিক দলকে লইয়া প্রদেশের খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে মুসলিম লীগ দলের প্রতিও জনগণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। ওদিকে জাপানের অগ্রগতি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজগণের সংবাদ ও তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সৈনিকদের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা সংবাদ সকল মানুষের মনে অতি দুঃখের দিনেও চাপা আনন্দের সৃষ্টি করে। এই সময় কলকাতা ও মাদ্রাজের উপকূলে জাপান বোমা নিক্ষেপ করে এবং তাহার কয়েকদিন পরেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এবং তাঁহার সহকর্মী হাবিবুর রহমান, কর্ণেল শাহানওয়াজ, মোহনসিং প্রমুখ যুদ্ধবিদদের নেতৃত্বে পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজ মনিপুর এলাকায় বৃটিশ ফৌজের উপর আক্রমণ করেন এবং ইম্ফলের কিয়দংশ দখল করিয়া লন। ভারতে বৃটিশ সরকারের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতের প্রান্তদেশ বৃটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন হইয়াছে এই সংবাদ ভারতবাসী সকলকে অভিভূত করে।

হিন্দু মুসলমানের মিলিত সময় সংসদ

তখন ইউরোপের সকল যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত হইয়াছে; জার্মান শক্তির পতন হইয়াছে, মিলিত সর্বশক্তি জাপানের অগ্রগতি রোধ করিতে কৃত সংকল্প কিন্তু যুদ্ধ তখন ভারতের বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, এই অবস্থায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও মিত্রশক্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে মুক্তি দান করে। এইরূপ মুক্তি দানের কারণ কাহারও অজানা ছিল না। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ

যে হিন্দু মুসলমানের সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই সেই সমস্যা সম্বন্ধে গুজব চলিতে থাকে। জাপান বেতার মারফৎ শোনা যায় যে সুভাষ বোস উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমর সংসদ গঠন করিয়াছেন এবং মেজর জেনারেল হাবিবুর রহমান তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ আর ঐ সংসদে হিন্দু-মুসলমান সদস্য সংখ্যা সমান সমানভাবে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সদস্য সংখ্যা লইয়া মতভেদই সমাধান ব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু সুভাষ বোসের সদস্য সংখ্যার হার জানিতে পারিয়া ভারতবাসী প্রতিবাদ করেন নাই বরং হিন্দু-মুসলমানের ভারতে কে বড় কে ছোট এইরূপ চিন্তা অনুচিত বলিয়া অনেকে মন্তব্য করিতে থাকেন। সেদিন শোনা যায় যে, কর্ণেল শাহানওয়াজ নিজে মনিপুর রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন সেদিন সকলের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কোন দিন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল তাহা যেন সকলেই ভুলিয়া যায়।

সিমলায় গোল টেবিল বৈঠক

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন মিঃ এল. এম. আমেরী ভারতের স্টেট সেক্রেটারী হাউস অব কমন্সকে এক ঘোষণায় জানান যে, ভারতীয়দের স্বাধীন জাতিরূপে যুদ্ধে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হইবে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক সরকার গঠন করিবার জন্য তাহাদিগকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে। ইহার পর ভারতের বড় লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের সিমলায় একটি গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হইবার এবং যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করিয়া দেশ শাসন করিবার আহবান জানান। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। হিন্দু মহাসভা এইরূপ বৈঠকে অংশগ্রহন করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। বৈঠকের সময় কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করিবার

সুযোগ লাভ করিবার জন্য সিমলায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন। ভারতীয়দের দ্বারা সংসদ গঠন করা স্থির হয়, সদস্য সংখ্যাও স্থির হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সদস্য নির্ধারণ ব্যাপার লইয়া কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বিবাদ বাধে। মুসলিম লীগ দাবী করে মুসলিম লীগ প্রতিনিধি মনোনীত করিবার অধিকার একমাত্র মুসলিম লীগের; কিন্তু কংগ্রেস এই দাবীর বিরোধিতা করে। তাহাদের বক্তব্য হইল যে, দুইটি সংগঠন সরকার গঠন করিবার দায়িত্ব লইয়াছে। সদস্য নির্ধারণ তাহাদের কর্তব্য। সদস্যদের ধর্মগত অধিকার হিসাবে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস সকল সময় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় সংগঠন হিসাবে কার্য করিতেছে—কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্য আছে। অন্য দিকে বাহিরে যে কয়েকটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম সংগঠন আছে তাহারাও কংগ্রেসের অনুরাগী। অতএব কংগ্রেস কাহাকে মনোনীত করিবে সে অধিকার কংগ্রেসেরই আছে। কিন্তু ইহাতেও মুসলিম লীগ তাহার দাবী প্রত্যাহার করে না এবং বড় লাটও দাবী প্রত্যাহার করিতে তাহাদের সম্মত করাইতে ব্যর্থ হন। এইভাবে সিমলা কনফারেন্স ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও বৃটিশ সরকারকে সাহায্য দান ব্যাপারে কংগ্রেস যথেষ্ট আলগা হইয়া যায়।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট কর্তৃক সুভাষকে সমালোচনা

জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পর কমিউনিস্টগণ এই যুদ্ধকে "গণযুদ্ধ" বলিয়া আখ্যা দেয়। রাশিয়া তখন মিত্রশক্তির পক্ষে। ভারতেও কমিউনিস্টরা স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কার্য করিবার সুযোগ পায়। জাপান শত্রুপক্ষ এবং নেতাজী সুভাষ বোস যেহেতু তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মীকে জাপানের সহযোগিতায় বন্দী ভারতীয় সৈনিক দ্বারা গঠিত এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারত আক্রমণের নামে বৃটিশ তথা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিতেছিল সেই জন্য কমিউনিস্টরা আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সুভাষ বোসকে সমালোচনা করে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নেতাজী সুভাষ বোস ও জাপানকে আক্রমণকারী বলিয়া আখ্যা দেয়, বিশেষ করিয়া গান্ধী-পন্থীরা সুযোগ পাইয়া আর একবার সুভাষ বোসের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ সকল সংগঠনের বাহিরে থাকিয়া নেতাজী সুভাষ বোসকে অভিনন্দন জানাইবার সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে—আর বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে থাকে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অবসান

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যাইবার ফলে পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ যুদ্ধের গতি রাতারাতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। তখন প্রতি মুহূর্তে মনিপুর সীমান্ত হইতে দুঃসংবাদ আসিতেছিল। কলিকাতা নগরী হইতে প্রায় সকল সরকারী অফিস অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। লোক সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। কারণ বোমার আঘাতের ভয়ে অনেকেই শহর ছাড়িয়া দূর গ্রামাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল। এই সময় আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে; ইহার ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জাপান যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে। জাপানের পরাজয়ের সাথে সাথে নেতাজী সুভাষ বোসের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনটি ভাঙিয়া যায় ও উক্ত সংগঠনের অফিসারগণ পুনরায় মিত্রশক্তির হস্তে বন্দী হন। আর নেতাজী সুভাষ বসু সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাইবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বৃটিশের নতুন তৎপরতা ও সাধারণ নির্বাচন

ইউরোপ রণাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এত দ্রুত এশিয়া রণাঙ্গনেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা কেহ চিন্তাও করেন নাই। কিন্তু তাহাই বাস্তব ও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সারা পৃথিবী যুদ্ধোত্তর গঠন কার্যে মনোনিবেশ করে। ইংল্যান্ডে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার কার্যকাল সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার অর্থাৎ মিঃ চার্চিলের মন্ত্রীসভার পতন হয়। শ্রমিক দল জয়ী হয় এবং মিঃ এটলী নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা প্রকার পরিবর্তন ও বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছিল এবং অপরাপর মিত্রশক্তির সদস্যগণ ভারতের সহিত একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য বৃটিশের উপর চাপ দিতেছিল, তখন বৃটিশ পার্লামেন্ট ও শ্রমিক দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও সরকার পক্ষকে ভারতের সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে সমঝোতা করিবার জন্য চাপ দেয় এবং অনেক সময় কংগ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। সেই জন্য শ্রমিক দলের জয়লাভ সংবাদে ভারতে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ভারত নহে সারা পৃথিবী ইংরাজের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যায়—তখনও যুদ্ধের শান্তি, ক্লান্তি, ক্ষয় ও ক্ষতি, বেদনা ও বীভৎসতা সমস্ত জাতির সকল অনুভূতিকে জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধাবসানের কয়েক মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন, নূতন মন্ত্রীসভা গঠন, যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার জাঁদরেল মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের পতাকা যে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য সাধনের তৎপরতা ও প্রেরণা যোগাইবার

উদাহরণ তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার অবকাশ রাখে না।
ভারতের অন্যতম রাজনীতিবিদ মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সময় এবং সুযোগ বুঝিয়াই নবগঠিত এটলী মন্ত্রীসভাকে সম্বর্ধনাসূচক তারবার্তা প্রেরণ করেন। এইরূপ তারবার্তা প্রেরণে কংগ্রেসমহলের, বিশেষ করিয়া গান্ধীজীর, সমর্থন ছিল না। কিন্তু তারবার্তার উত্তরে মিঃ এটলী ও স্যার ক্রীপস্ মওলানা সাহেবকে জানান যে ভারতের সহিত বৃটিশ সরকারের সকল সমস্যা সমাধানে শ্রমিকদল যথোপযুক্ত ও ন্যায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহার কিছুদিন পরই ভারতের বড়লাট ঘোষণা করেন যে ভারতেও আগামী শীতকালে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অংশগ্রহণ

প্রথমে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এইরূপ সাধারণ নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনের প্রচারকার্য এবং জনসাধারণের ভাব প্রকাশের ধারা এমনভাবে পরিচালিত হয় যাহাতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ জয়যুক্ত হইতে পারে। নির্বাচনের ফলাফলও সেই রায় দেয়। ইহার ফলে প্রায় সকল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ সমান সংখ্যা আসন লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম অধিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও কংগ্রেসই সর্বোচ্চ আসন দখল করে। ইহা যে জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল গফ্ফার খান ও তাঁহার ভ্রাতার প্রতি-পত্তির কারণে সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অপরাপর প্রদেশে কংগ্রেসী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থীগণ মুসলিম লীগ প্রার্থীদিগের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ১৯৭৩

খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের যে অবস্থা ছিল তাহা অপেক্ষা ১৯৪৫—৪৬-এর এই নির্বাচনের ফলাফল তাহাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের প্রমাণ ঘোষণা করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেসী ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা নূতনভাবে সাংগঠনিক কার্য চালাইতে থাকে। জমিয়ত-উল-উলেমা দল এবারও নিজস্ব প্রার্থী দেয় নাই। তাহারা ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল এবার সর্বত্র তাঁহারা কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন জানান। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মুসলমান জনসাধারণ এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনগুলির দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে যেখানে প্রায় দুই বৎসর কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা কার্যকরী ছিল সেই সকল প্রদেশেই মুসলমানরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করে আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে (বাংলা ব্যতীত) কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল সমর্থন করে। এমনকি বাংলা প্রদেশে তখন জনাব ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করিয়া কৃষকপার্টি সৃষ্টি করেন। তিনি দুইটি কেন্দ্র হইতে নির্বাচন-প্রার্থী হন এবং উভয় কেন্দ্রের মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করেন।

মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নহে

সকল মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া আখ্যা দেওয়ার পূর্বে এই বিশেষ অবস্থাটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনগুলিকে নিজের মধ্যে মিলিত করিতে পারে নাই এবং জাতীয়তাবাদীগণের মনোভাব যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে তাহাদিগের সহিত রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যতীত সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে মুসলমানদের মুসলিম লীগকে ভোট দিবার পূর্বে তাহাদের মনোভাব সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে সেদিন তেমন ধরনের চিন্তা করা হয় নাই।

যাহার ফলে আজিও সাম্প্রদায়িকতা সমস্যার সমাধান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে স্বভাবগতভাবে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহের অবস্থাকে ব্যতিক্রম বলিতে হইবে কিন্তু ইহার সহিত কংগ্রেসে অবস্থিত মুসলমান সদস্য এবং জাতীয়তাবাদীদের মিলিত মনোভাব লক্ষ্য করিলে মুসলমনাদের কোন প্রকারেই স্বভাবগত বা ধর্মগতভাবে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না; ভারতের অতীত ইতিহাসও সেরূপ সাক্ষ্য দেয় না। যদি তাহারা স্বার্থের খাতিরে সাম্প্রদায়িক হইয়াছিল বলিয়া বলা হয় তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এই বিষয়ে বাড়িয়া যায়; কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্টদের। কিন্তু দেখা যায় নির্বাচনের পরে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান অপেক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখানো হয় যথেষ্ট।

কংগ্রেসের শো-বয়

নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা ও অপরাপর দল কোথাও সাংগঠনিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে না অর্থাৎ কোন প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয় না। সেই কারণে হিন্দু মহাসভার অবস্থা দুর্বল হইয়া গিয়াছিল কিংবা সাংগঠনিক শক্তি হারাইয়াছিল, এইরূপ চিন্তা করিবার কারণ নাই। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করানো অপেক্ষা কংগ্রেসপন্থীদের সমর্থন জানানো যুক্তিযুক্ত মনে করে এবং তাহার জন্য মুসলিম লীগ মহল হইতে কংগ্রেসী ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে থাকে। কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কংগ্রেসের "শো-বয়' আখ্যা দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক আন্দোলনের পরও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সমাপ্তি ঘটে না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নির্বাচনে দুইটি পৃথক ও স্বাধীন সংগঠনরূপে জয়ী হয়। নির্বাচনের ও মন্ত্রীসভা গঠনের অবস্থা দেখিয়া সারা দেশব্যাপী সকল মানুষের মধ্যে এরূপ ধারণা জন্মে যে, যখন

সংগঠনগুলি নিজেদের কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করিতে পারিয়াছে এবং কংগ্রেসের আপত্তি থাকিলেও দুইটি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার শর্তসমূহ মানিয়া লইয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছে তখন উভয় সংগঠনের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে আপোষ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং বৃটিশ সরকার বর্তমান রাজনীতিতে যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেছে তাহাতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ বিলম্বিত হইবে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারে না, পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী সভা গঠিত হয়। এইবার সর্বপ্রথম পাঞ্জাবে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে।

নৌ-সেনাদের ধর্মঘট

এই সময়ে কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বোম্বাই এবং করাচীতে নৌ-সেনাগণ ধর্মঘট করে। তাহাদের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তাহারা সকল সময় ভারতীয় এবং ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে ভিন্নরূপ ব্যবহার করিত, যাহার মধ্যে জাতি হিসাবে তাহারা সর্ব ব্যাপারে উৎকৃষ্টতর তাহাই ফুটিয়া উঠিত। যখন ভারতীয় সৈন্যগণ প্রতিবাদ করিয়া কোন প্রকারে ব্যবহারিক ক্ষেত্র বৈষম্যভাব দূর করিতে পারে না তখনই ধর্মঘট করে। এইরূপ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন মিসেস অরুণা আসফ আলী, কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদের হস্তক্ষেপে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। বৃটিশ সরকার এইরূপ ধর্মঘটে উদ্বেগ প্রকাশ না করিলেও সৈন্য বিভাগের ধর্মঘট তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে ধর্মঘটিরা যে বিনা শর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে তাহাও তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

ইহার সাথে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মী অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজ, যাহারা বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য মনিপুর এলাকায় যুদ্ধ করিয়াছিল, জাপানের পতনের পর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ভারত লইয়া আসা হয় এবং তাহাদের বিরুদ্ধে

দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার আরম্ভ হয়। মওলানা আজাদের তৎপরতা এবং হস্তক্ষেপের জন্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং মামলাগুলি কোনক্রমে শেষ হইয়া যায়।

কাশ্মীরের মহারাজার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন

ঠিক এই রকম সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে কাশ্মীরের রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া তখন শেখ আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলন কর্তৃক কাশ্মীরের মহারাজার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। শেখ আবদুল্লাহ দাবী করেন যে, রাজতন্ত্র শেষ করিয়া কাশ্মীরের জনগণকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। মহারাজা জাতীয় সম্মেলনের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করেন।

গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং জনাব আসফ আলী কাশ্মীর যান, মহারাজা তাহাদিগকেও নজরবন্দী করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মওলানা আজাদ এবং ভারতের বড় লাট বাহাদুরের হস্তক্ষেপে পণ্ডিত নেহরু এবং আসফ আলীকে মুক্ত করিয়া ভারতে ফিরাইয়া আনা হয়। এ ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের কার্যাবলী প্রশংসিত হয়। ইহার পর মিঃ জিন্নাহ্ শেখ আবদুল্লাহ্‌কে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু শেখ আবদুল্লাহ্ কংগ্রেসের অনুকূলে থাকিবার মত দেন। মিঃ জিন্নাহ্ অতঃপর এই বিষয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন না। ঘটনা পরম্পরায় যখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ রাজনীতি ক্ষেত্রে শক্তি আহরণ করিতেছিল তখন তপশীল সম্প্রদায় এবং শিখগণও মুসলিম লীগের সহিত সহযোগী হিসাবে যথেষ্ট নিকটবর্তী থাকে।

বৃটিশ কেবিনেট মিশনের ভারতে আগমন ও মাওলানা আজাদের গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি

এই রকম সময়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ কেবিনেট মিশন ভারতের এই বিষয়ে সমঝোতা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। যখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, কিন্তু কোন প্রকার নির্দিষ্ট

ফলাফল জানা যায় নাই তখন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ ১৯৪৭ সনের ১৫ই এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেন।

"আমি একজন ভারতীয় এবং একজন মুসলমান হিসাবে মুসলিম লীগ কর্তৃক কল্পিত পাকিস্তান পরিকল্পনাটি সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়াছি এবং ইহার ফলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য কিরূপ হইতে পারে তাহাও চিন্তা করিয়াছি। আমার বিবেচনায় ইহা সাধারণভাবে ভারতের বিশেষ করিয়া মুসলমানদের ক্ষতির কারণ হইবে, সমস্যার সমাধান অপেক্ষা আরও সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে। ইসলামের বিধানে এমন কোন কথা নাই যে এক অংশ পবিত্র এবং অন্য অংশ অপবিত্র। রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালা সারা পৃথিবীকে মসজিদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।' আমার মনে হয় পাকিস্তান পরিকল্পনা পরাজিতের প্রতীক। ইহা ইহুদীদের মাতৃভূমির দাবীর মত। ভারতীয় মুসলমানরা সারা ভারতকে নিজের করিতে পারে না, সেই জন্য একটি কোণকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া সুখী হইতে চাহে। ইহুদী এবং ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা এক নয়। মুসলমানরা সংখ্যায় নয় কোটি। ভারতের সকল নীতি নির্ধারণে এবং রাজ্য পরিচালনার জন্য সংখ্যা এবং গুণ বিশেষ প্রয়োজন। কয়েকটি এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান দাবী অর্থহীন। একজন মুসলমান হিসাবে সারা ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি স্থির করিবার জন্য ভারতের উপর আমার দাবী এক মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। আমার পিতৃভূমির সমস্ত কিছু ত্যাগ করিয়া অংশ বিশেষ লইয়া সুখী থাকা আমার নিকট ভীরুতা বলিয়া মনে হয়। মিঃ জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান পরিকল্পনা দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক। তাঁর এই তত্ত্বে জাতিসমূহ ধর্মের পার্থক্য হেতু সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি বৃহৎ জাতি হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি ভিন্ন রাজ্য প্রয়োজন। ডঃ এডওয়ার্ড টমসন মিঃ জিন্নাহ্‌কে ভারতের হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘদিন ধরিয়া শহরে গ্রামে

কুটিরে পাশাপাশি বাস করিতেছে দেখাইয়া তাহারা কিরূপে পৃথক জাতি হইতে পারে এই প্রশ্ন রাখেন? মিঃ জিন্নাহ, তথাপি হিন্দু-মুসলমানকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করেন না।

আমি অপর সকল দিক বিবেচনা বহির্ভূত মনে করিতে প্রস্তুত আছি এবং কেবলমাত্র মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কেই বিচার করিতেছি। আমি আরও বলিতেছি যে আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দেন যে পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলমানদের উপকার সাধন করিবে তাহা হইলে আমি নিজে সে প্রস্তাব করিব এবং অপরকে গ্রহণ করিতে বলিব। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি ইহা মুসলমানদের উপকার করিবে না এবং আইনসঙ্গত ভয় দূর করিবে না। পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে হিন্দুস্থানে সাড়ে তিন কোটি মুসলমান চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিবে এবং বর্তমান সময় অপেক্ষা আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে। একদিন হঠাৎ তাহারা বুঝিতে পারিবে যে তাহারা বিদেশী হইয়া গিয়াছে। তখন নির্ভেজাল হিন্দু-রাষ্ট্রের অনুগ্রহে শিল্পে, শিক্ষায় এবং আর্থিক অবস্থায় অনুন্নত হইবে এবং পাকিস্তানেও তাহারা নিজেদের দুর্বল বোধ করিবে। কারণ হিন্দুস্থানে হিন্দু সংখ্যাধিক্যের নিকট কোন সময়ই তুলনায় তাহারা উপযোগী হইবে না। বাস্তবে তাহাদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এত কম হইবে যাহার জন্য আর্থিক, শিক্ষা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানরা খুব বেশী কিছু ভোগ করিতে পারিবে না। এইরূপ যদি না হয় এবং পাকিস্তানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকে এরূপ অবস্থাতেও তাহারা হিন্দুস্থানের মুসলমানদের কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। দুইটি রাষ্ট্রই সকল সময় উভয়েরই বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হইবে এবং তাহাদের সংখ্যালঘুদের কোন সমস্যার সমাধান হইবে না। এই ভাবেই পাকিস্তানের পরিকল্পনা মুসলমানদের কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। যেখানে তাহারা সংখ্যালঘু সেখানে তাহাদের অধিকার রক্ষার নিরাপত্তা দিতে পারিবে না। এমনকি পাকিস্তানের নাগরিক হইয়াও ভারতে কিম্বা

বিশ্ব ব্যাপারে কোন সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহা ভারতের মত বৃহৎ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভোগ করিতে পারে।

যদি পাকিস্তান মুসলিম স্বার্থের এতই প্রতিকূল হয় তাহা হইলে এত বেশী সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে ছুটিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুদিগের মধ্যে কতকাংশের চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক মনোভাবই প্রধান কারণ। যখন মুসলিম লীগ পাকিস্তানের কথা বলিয়াছিল তখন তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের সহিত ভারতের বাহিরে অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের প্যান ইসলামিক ষড়যন্ত্রের ভয় করিতেছিল, এবং সেইজন্যই বাধা দিয়াছিল। এইরূপ বাধায় মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদিও সহজ তথাপি এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। যখন তাহারা বলে যে, হিন্দুরা পাকিস্তানের এত বেশী বিরোধিতা করিতেছে তখন পাকিস্তান মুসলমানদের উপকার করিবে। বর্তমান আবহাওয়া এইরূপ ভাবাবেগপূর্ণ; বিশেষ করিয়া যুবকদিগের মধ্যে; যাহার ফলে যুক্তি-তর্কের স্থান হইতেছে না। কিন্তু যখন এইরূপ ভাবাবেগ কাটিয়া যাইবে এবং লোকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিবে তখন আমার বিশ্বাস আজ যাহারা পাকিস্তানের সমর্থন করিতেছে তাহারাই পাকিস্তান যে মুসলিম স্বার্থবিরোধী তাহা স্বীকার করিবে।

কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যে সূত্র গ্রহণ করিতে আমি কৃতকার্য হইয়াছি, তাহার মধ্যে পাকিস্তান পরিকল্পনার সকল গুণাবলী রক্ষিত হইয়াছে এবং যে সকল বাধা-বিপত্তির কারণ হইয়াছে তাহা বর্জন করা হইয়াছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপের ভয়ের কারণেই পাকিস্তানের ভিত্তি। কংগ্রেস প্রদেশ সমূহকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এইরূপ ভয়ের অবসান করিতে চাহে। কেন্দ্র মাত্র কয়েকটি বিষয় পরিচালনা করিবে। কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে তাহাদিগকে ইচ্ছামত সকল উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে এবং সাথে সাথে সারা ভারতের

স্বার্থ জড়িত বিষয় সমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে। ভারতের অবস্থা এমনই যে এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা অমঙ্গল হইতে বাধ্য। সমভাবেই ভারতকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টাও অকৃতকার্য হইবে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে কংগ্রেসের সুত্র প্রদেশ সমূহের এবং সামগ্রিকভাবে সারা ভারতের উন্নতি করিতে পারিবে। এইভাবে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে এলাকা সম্পর্কে সকল প্রকার ভীতি দূরীভূত হইতে পারে, এবং যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, যাহার জন্য পাকিস্তান পরিকল্পনা, সেই সকল স্থানে সম্পূর্ণ হিন্দু সরকারের দোষত্রুটি হইতে রক্ষা পাইবে। যাহারা ভারতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে করেন, আমি তাহাদের একজন। ভারতের লক্ষ্য স্থলে পেঁছাইলে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিলে এসকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে। ভারতের স্বাধীনতা আসিলে মত পার্থক্য থাকিবে, কিন্তু তাহা কখনই সাম্প্রদায়িক হইবে না। রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে বিরোধিতা থাকিবে কিন্তু তাহা কেন্দ্রিক হইবে না, হইবে অর্থকেন্দ্রিক এবং স্বার্থযুক্ত। যদি বলা যায় ইহা কেবল আমার বিশ্বাস এবং বাস্তবের সহিত ইহার সংযোগ নাই, তাহা অবহেলা করিতে পারে। তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা যথেষ্ট শক্তিশালী।"

কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা

মওলানা আজাদের উপরিউক্ত বিবৃতি হইতে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণ অনেকখানি পরিষ্কার হইয়াছে। এই বিবৃতিটি মুসলিম লীগ মহলেও নূতনভাবে চিন্তার খোরাক জোগায়। কেবিনেট মিশনের আলোচনা চলিতে থাকে এবং মিশনও খোলাখুলিভাবে লীগকে জানাইয়া দেয় যে তাহারা লীগের দুই জাতি তত্ত্ব ও ভারতকে বিভক্তি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন না। ভারতের দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা চাহে এবং কোনক্রমেই তাহাদিগের বিরুদ্ধে

শাসন ব্যবস্থা চাল্ রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ শাসন করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন বর্তমান ব্টিশ সরকার সেইর্প শক্তি প্রয়োগ করিতে অক্ষম। ম্সলিম লীগও ভারতকে বিভক্ত করা অপেক্ষা হিন্দ্ম্সলমানের সমস্যা সমাধানের উপর বিশেষ গ্রুত্ব দেয় কিন্তু তাহা স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্বেই লিখিতভাবে এবং উভয় সংগঠন দ্বারা চুক্তিনামা ভিত্তিতে করিতে হইবে বলিয়া দাবী করে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সমাধান-সর্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি কিম্বা ন্তনভাবে পরিষদ প্র্ব শর্তর্পে হইতে পারে না, এইর্প মত প্রকাশ করিবার ফলে মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু মিশনের সদস্যগণ যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে প্নরায় আলোচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬ই মে তারিখে মিঃ এটলী হাউস অব কমনসে বলেন যে মিশন তাঁহাদের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। অতঃপর তাহা প্রকাশ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে অবস্থিত মিশন ১৬ তারিখে তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করে যাহাতে আলোচনার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

এই পরিকল্পনায় ভারতকে তিনটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়—পাঞ্জাব, সিন্ধ্ প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে "খ" এলাকাভুক্ত করা হয়। বাংলা এবং আসামকে "গ' এলাকাভুক্ত করা হয় এবং বাকী সকল প্রদেশকে "ক" এলাকাভুক্ত করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য 'খ' এবং 'গ' এলাকাভুক্ত ম্সলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার ম্সলমানরা তাহাদের ইচ্ছামত গণতান্ত্রিক ধারায় রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে এবং হিন্দ্রাও 'ক' এলাকাভুক্ত প্রদেশ সম্হে তাহাদের ইচ্ছামত রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে। ইহার ম্ল উদ্দেশ্য ছিল সকল এলাকার জনসাধারণ সর্বাধিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইবে এবং কেবলমাত্র কেন্দ্রের উপর, দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার এবং যোগাযোগ দপ্তরগ্লি ন্যস্ত থাকিবে। এইর্প ব্যবস্থা চাল্ হইলে কোন পক্ষই নিজস্ব অধিকার রক্ষা করিতে এবং কর্তৃত্ব করিতে বাধা পাইবে না।

কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ

এই পরিকল্পনাটির মধ্যে দেখা যাইতেছে কংগ্রেসের যুক্তরাষ্ট্র গঠন ও মুসলিম লীগের ভারতকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি লইয়া যৌথ রাষ্ট্রগঠন ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। সেইজন্য পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইবার পর ভারতীয় জনসাধারণ মনে করিতে থাকে যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের কোন প্রকার বাধা থাকিতে পারে না। গণতান্ত্রিক মতে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে নির্বাচন এবং এলাকাগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দান কোন সংগঠনের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কোন প্রকার অন্তরায় থাকিতে পারে না। প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার কয়েকদিনের মধ্যে প্রথমে মুসলিম লীগ কর্তৃক পরিকল্পনাটি গৃহীত হয় এবং মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বলেন "ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মারফৎ যতদূর সম্ভব রাজনৈতিক দাবী তিনি আদায় করিতে পারিয়াছেন।" সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিতে থাকে যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবীর চাপ দিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য হইয়াছে। "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" পুস্তকে মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "আমি যখন মুসৌরিতে ছিলাম তখন মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের বীতশ্রদ্ধ এবং আশ্চর্যান্বিত হইবার ভাব দেখা যায়। তাঁহারা খোলাখুলিভাবে বলেন যে, মুসলিম লীগ যখন কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে তখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলিয়া মুসলমানদের বিভ্রান্ত করিবার কারণ কি? আমার সহিত তাঁহাদের আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা স্বীকার করেন যে মুসলিম লীগের মনোভাব বা লক্ষ্য যাহাই থাকুক না কেন, ভারতীয় মুসলমানরা ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু আশা করিতে পারে না।" (পৃঃ ১৫০)

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় ভারতকে এইরূপ বিভক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন প্রস্তাব সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সদস্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সারা ভারতের হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করে এবং দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা চলিতেছিল তাহা যেন ভুলিতে থাকে। কিন্তু গোপনে নানা প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে চাপা আন্দোলন চালাইয়া যায়। মওলানা আজাদ "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" পুস্তকে লিখিয়াছেন "কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কর্তৃক কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। ইহার অর্থ এই যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের একটি কঠিন প্রশ্ন হিংসা এবং দ্বন্দ্বের মাধ্যমে মীমাংসা না হইয়া আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা হইয়া গেল। দেশের সমস্ত লোক যে স্বাধীনতার দাবীতে একতাবদ্ধ তাহা আমারও আন্দাজ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও জানিতাম না যে ইহা অপরিপক্ক এবং ভবিষ্যতে হতাশা অপেক্ষা করিতেছে।" (পৃঃ ১৫১)

মওলানা আজাদের দুঃখ

ইতিহাসের বুকে কখনই একটানা, শান্তি, আনন্দ, জয় প্রভৃতি রক্ষিত হয় না। দুঃখ, অশান্তি, পরাজয় ও সমালোচনাও রক্ষিত থাকে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহা যেন প্রকাশ পাইবার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। ভারত এবং কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমান নেতৃবর্গের কর্তৃত্ব বেশ কিছুদিন যাবৎ অনেকেই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে শেখ আবদুল্লাহ, কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্রে মওলানা আজাদ এবং তাঁহার সঙ্গী বা সহকারী আসফ আলী, হুমায়ুন কবীর ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির মধ্যে আরও কয়েকজন মুসলমান সদস্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে মিঃ

জিন্নাহের নেতৃত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহারা মনে করিতেছিলেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের পর আবার বোধ হয় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের হস্তে কর্তৃত্ব আসিতেছে। হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক আলোচনা ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ সরকার দায়ী হইলেও তাহারা মনে করিতে থাকেন যে মুসলমানদের প্রভাবেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। কংগ্রেস দলের মধ্যেও যে সকল হিন্দু মহাসভা ভাবাপন্ন সদস্য ছিলেন তাঁহারাও বেশ কিছুটা চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে অপসারণের জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় বোম্বায়ে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে, যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠনের নীতিকে কেন্দ্র করিয়া মওলানা আজাদের কার্যের তীব্র সমালোচনা করেন। উল্লেখ থাকে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ও ইউনিয়নিস্ট পার্টি নির্বাচনে সমসংখ্যক আসন দখল করে; কিন্তু মওলানা আজাদের হস্তক্ষেপ মুসলিম লীগ ও ইউনিয়নিস্ট পার্টি মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারে না—মন্ত্রীসভা গঠন করে ইউনিয়নিস্ট ও কংগ্রেস। ইহাতে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ যথেষ্ট ব্যাহত হয়, এবং কংগ্রেস এই প্রথম বার মন্ত্রীসভায় আসন লাভে কৃতকার্য হয়। এই বিষয়ে "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" পুস্তকের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হইতে প্রকৃত অবস্থা জানা যাইবে। মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন:

"পাঞ্জাব সরকারের মধ্যে কংগ্রেসের স্থান লাভ এইবারই প্রথম। রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিশেষ ক্ষমতা লাভেও তাহারা সক্ষম হয়। আমি পাঞ্জাব মন্ত্রীসভা গঠনে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছি তাহা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য হইলেও একটি ঘটনাতে আমি যথেষ্ট দুঃখিত হই। কংগ্রেসের কার্যকলাপের সহিত আমি জড়িত হইবার পর হইতে জওহরলাল এবং আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, সকল সময় উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভর করিতাম। আমাদের মধ্যে কখনই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব দেখা দেয় নাই। বাস্তবে পণ্ডিত মতিলাল

নেহরুর জীবনকাল হইতেই এই পরিবারের সঙ্গে আমার সখ্যতা সৃষ্টি হয়। প্রথমে আমি জওহরলালকে ভ্রাতার পুত্রের মত দেখিতাম এবং তিনিও আমাকে পিতার বন্ধুর মত শ্রদ্ধা করিতেন।

জওহরলাল সহৃদয় ও উদার ছিলেন এবং কখনো ব্যক্তিগত হিংসা তাহার মনে স্থান পায় নাই। যাহা হউক তাহার কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করিতেন না। জওহরলালের কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যবহার কিম্বা অবাস্তব চিন্তার প্রতি দুর্বলতা ছিল এবং আমার বিরুদ্ধে তাহারা সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন যে মুসলিম লীগ ভারতীয় জনসাধারণের একটি সংগঠন। তাহার সহিত মিলিত না হইয়া পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির সহিত মিলিত হওয়া নীতিগতভাবে কংগ্রেসের অন্যায়। তাহারা আরও বলিতে থাকেন যে এই ব্যাপারে আমার প্রতি দেশবাসীরা যে শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইতেছে তাহাও অপর সকল কংগ্রেস নেতৃবর্গের অবমাননা স্বরূপ। তাহারা তাহার উদার মনোভাবের কথা জানিতেন, সেই জওহরলাল নিজের কথা বলিয়া অপর সকল নেতাগণ কি ভাবিতেছে তাহাই বেশী করিয়া বলেন এবং জওহরলালের পত্রিকা "ন্যাশন্যাল হেরল্ড"-এ আমার প্রতি যে উচ্চ প্রসংসা নিত্য প্রকাশিত হইতেছে তাহার ফলস্বরূপ অচিরে আমি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইয়া যাইব এবং তাহা গণতান্ত্রিক কংগ্রেসের জন্য উত্তম নহে তাহাও বলা হয়।

আমার মনে হয় ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ তাহার মনে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই; তবে আদর্শগত কূটনীতি তাহাকে প্রভাবান্বিত করে। আমি লক্ষ্য করি যে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সভায় জীবনে সর্বপ্রথম তিনি আমার সকল কর্মপন্থার কঠোর সমালোচনা করেন।" (পৃঃ ১২৮-৩০)

উদ্ধৃতিটি কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্যদের মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী কর্তৃক মওলানা সাহেবের কর্মের সমর্থনে সকল সমস্যার অবসান হয়।

পাকিস্তান দাবীর জন্য হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দায়ী

মওলানা আজাদের পূর্বপ্রকাশিত বিবৃতি যাহাতে তিনি বলেন যে "পাকিস্তানের দাবীর জন্য হিন্দুদিগের কতক অংশের চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবই দায়ী।" ইহাতে কংগ্রেসের ভিতরেও বহু সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কেবিনেট মিশনের সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া যাইবার ফলে হিন্দু মহাসভা বুঝিতে পারে যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহাদের যদি কোন প্রকার অবদান থাকিত তাহা হইলে কেবিনেট মিশন স্বীকৃতি দিত; কিন্তু তাহা হয় নাই। বুঝিতে পারিয়াও তাহারা চুপ থাকে না, যে, কোন প্রকারে মুসলমানদের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে এবং তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে স্বয়ং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ। আর যাঁহারা সংগঠনের বাহিরে থাকিয়া তাহাদের প্রতি সমর্থন জানাইতেন তাঁহাদের কার্য হয় কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণার ভাব জাগরিত করা এবং কংগ্রেসের উপর হইতে তাহাদের সকল প্রভাব নষ্ট করা। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোলাখুলি সমস্ত কিছু সম্ভবপর না হইবার জন্য তাহারা সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে।

কংগ্রেসের ভিতর মহলের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম

সারা দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে তখন যথেষ্ট আনন্দ দেখা দিয়াছে। মুসলিম লীগের স্বয়ংক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে যেন কিছুটা ভাটা পড়িয়াছে; তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিতেছিলেন যতটুকু পাইবার তাহার সবটুক পাওয়া গিয়াছে। কারণ মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবী উত্থিত হইলেও সাধারণ মুসলমানরা দেশ-বিভাগের পরিকল্পনা খুব ভালো চোখে দেখেন নাই ও চাহেন নাই। কিন্তু নানা কারণে এমন এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার ফলে এইরূপ দাবী না চাহিলেও মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এখন মুসলিম লীগ ভবিষ্যতে সরকার গঠন কিরূপ হইবে এবং কাহারা সরকার গঠনে অংশ-

গ্রহণ করিবেন তাহা লইয়া নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছিল। এমন সময় কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হওয়া সম্ভবপর হয় নাই; তাহার কারণ গত ১১৩৯ সালে নির্বাচনের পর দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কংগ্রেস কর্তৃক ব্যক্তিগত যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং নেতৃবর্গ কারাবরণ করেন। পুনরায় ভারত ছাড় আন্দোলন, তাহার ক্রীপস দৌতের ভারত আক্রমণ, শিমলা গোল টেবিল বৈঠক ও সাধারণ নির্বাচন এবং কেবিনেট মিশনের ভারত আগমন ও আলোচনা প্রভৃতির জন্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন বন্ধ থাকে। বর্তমানে সকল বিষয়েই সমাধান প্রায় হইয়া আসিয়াছে এবং উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্বাচন কার্য চলিতে থাকে। কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মওলানা আজাদের পক্ষে পুনর্নির্বাচনের মনোভাব প্রকাশ করে। তাঁহারা মনে করিতেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করিবার জন্য মওলানা আজাদের মত স্পষ্টভাষী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কার্যোদ্ধারের জন্য কূটনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তখনও কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবার প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়াও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সরকারের কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত যেভাবে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চ স্থানীয় এবং ভিতর মহলের নেতৃবর্গের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম, কেহ সর্দার প্যাটেলের, কেহবা আচার্য কৃপালনির নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করিতে চাহেন। মহাত্মা গান্ধীজী হয়তো সর্দার প্যাটেলের পক্ষ নিতে পারেন এইরূপ গুজব চলিতে থাকে, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া মওলানা আজাদ নির্বাচন ক্ষেত্র হইতে নিজে সরিয়া দাঁড়ান এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নাম প্রস্তাব করেন এবং গান্ধীজীও এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান। এই ব্যাপারে 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' পুস্তকে মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন।

"বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহারের এবং উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস সদস্যগণ প্রকাশ্যভাবে মত দেন যে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব কার্যকরী

করিবার দায়িত্ব আমারই থাকা উচিত। বাংলার শরৎ বোসও আমাকে পুনরায় সভাপতি হইবার জন্য চাপ দেন। কিন্তু আমি কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত কিছুটা বিভক্ত তাহা লক্ষ্য করি। আমি দেখিয়াছিলাম সর্দার প্যাটেলের বন্ধুগণ সর্দার প্যাটেলকে সভাপতি করিবার জন্য মত দিতেছেন। এইরূপ অবস্থা আমার জন্য যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত হইবার কারণ হইয়া উঠে। এবং প্রথমে আমার কর্তব্য স্থির করি যে ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সাত বৎসরের সভাপতি থাকিবার পর আমার অবসর গ্রহণ করা কর্তব্য। অতএব আমার নাম প্রস্তাব করিবার অনুমতি উপযুক্ত হইবে না বলিয়া স্থির করি। স্থির করি যে জওহরলালেরই সভাপতি হওয়া উচিত এবং সেই জন্যই ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৬ তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করি। এবং সকল কংগ্রেস সদস্যদের জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি নির্বাচন করিতে অনুরোধ করি। গান্ধীজীর হয়তো সর্দার প্যাটেলের প্রতি কিছুটা টান ছিল; কিন্তু জওহরলালের নাম প্রস্তাব করাতে তিনি প্রকাশ্যে আর কিছুই বলেন নাই। কেহ কেহ সর্দার প্যাটেল এবং আচার্য কৃপালনির নাম প্রস্তাব করেন কিন্তু জওহরলালকে সভাপতিরূপে গ্রহণ করিতে সকলেই একমত হন।"

কংগ্রেসের নতুন পরিকল্পনা : মুসলমানদের অসমর্থন

এই বৎসরের ৭ই জুলাই কংগ্রেস অধিবেশনে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গৃহীত হয়, এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতিরূপে ১০ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, স্বাধীনভাবে সকল অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য "কংগ্রেস শাসন পরিষদে ঢুকিতেছে এবং চুক্তির মধ্যেও এইরূপ স্বাধীনতা আছে।" সাংবাদিকদের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কংগ্রেস শাসন পরিষদে অংশগ্রহণ করিতে এইজন্য রাজী হইয়াছে যে প্রয়োজন বোধে কংগ্রেস স্বাধীনভাবে কেবিনেট মিশনের পরিবর্তন

ও সংস্কার করিতে পারিবে।' এইরূপ উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবার পর মুসলিম লীগ সভাপতি আশ্চর্য হইয়া যান, এবং অনতিবিলম্বে মুসলিম কাউন্সিলের এক জরুরী সভা আহ্বান করেন। এই সভায় পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করিয়া বলেন, "সরকার তাহাদিগকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনাই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার ভিত্তি হইবে। এবং কংগ্রেসও এই শর্তে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'প্রয়োজন বোধে কংগ্রেস স্বাধীনভাবে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার পরিবর্তন ও সংস্কার করিতে পারিবে'; অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ভারতে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে।"

"লীগ কাউন্সিলের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া সারা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে পুনরায় একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এবং জনসাধারণ মিশন পরিকল্পনাটির এই অংশ সম্পর্কে সত্যকার অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহলী হয়। কিন্তু ২৭শে জুলাই লীগ কাউন্সিলের সভায় পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর অর্থাৎ কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতির অংশ বিশেষের বিরোধিতা করা হয় এবং এরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইলে মুসলমানরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িবে ইহা উল্লেখ করিয়া কেবিনেট পরিকল্পনা মুসলমানরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এবং প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ও সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান পরিকল্পনার দাবী কার্যকরী করিবার জন্য প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

কংগ্রেসের পরিবর্তিত প্রস্তাব

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস মহল বর্তমান সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি যে দেশের অনিষ্ট সাধন করিবে তাহা চিন্তা করিয়া ৮ই আগস্ট কার্যকরী

সমিতির এক জরুরী সভা আহ্বান করে। এই সভায় কংগ্রেস সভাপতি ১০ই জুলাই তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত বিবৃতি এবং ২৭শে জুলাই তারিখে লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং, নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে সারা ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল তাঁহাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়াছেন এবং শাসন পরিষদে অংশ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বর্তমানে পরাধীনতা হইতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত পরিবর্তন কালীন সময়ে যখন দেশের বিরাট এবং গূঢ় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তখন ভারতের সকল লোকের এবং সকল প্রতিনিধি স্থানীয় সংগঠনের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজনীয় যাহাতে পরিবর্তন ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

কমিটি অনুধাবন করিতেছে যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাহা সত্ত্বেও তাহারা দেশের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চায় ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার্থে সকলের সহযোগিতার জন্য আবেদন করিতেছে। কংগ্রেস কেবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব শর্তাধীনে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মুসলিম লীগ যে সমালোচনা করিয়াছে এই কমিটি তাহাও লক্ষ্য করিয়াছে। কমিটি ইহা পরিষ্কারভাবে বলিতে চাহে যে প্রস্তাবের সকল শর্ত কংগ্রেস যদিও অনুমোদন করে নাই, তথাপি পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে যে পরিকল্পনাটি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিস্বরূপ এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে-কোন এলাকায় ইহাতে যোগদানের অধিকার আছে। কংগ্রেস তাহাদের প্রতিনিধিকে প্রস্তাবে যেইরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে সেইমত সকল কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া শাসন পরিষদে সকল কর্তব্য সাধন করিতে উপদেশ দিবে।

কমিটি শাসন পরিষদের স্বাধীন চরিত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেছে এবং কমিটি ঠিক করিয়াছে ইহা বাহিরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ ও অধিকার ব্যতীত সকল কার্য করিবে এবং শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। কিন্তু পরিষদ স্বাভাবিকভাবে অন্তর্বর্তী সীমার মধ্যে কার্য করিবে এবং সেইজন্য সকলের ন্যায্য দাবী এবং স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকতর স্বাধীনতা দিয়া শাসনতন্ত্র রচনায় সকলের সহযোগিতা আশা করে। এইরূপ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য লইয়া শাসন পরিষদে কার্য করিবার ও ইহাকে কৃতকার্য করিবার জন্য কার্যকরী সমিতি গত ২৬শে জুন তারিখে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাহাও ৭ই জুলাই তারিখে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুমোদন করে। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসন পরিষদে সকল কার্য হইবে।

কমিটি আশা করে যে, মুসলিম লীগ এবং আর সকলে তাহাদের নিজেদের এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য একত্র মিলিত হইবে।"

প্রস্তাব সম্বন্ধে আজাদের অভিমত

কংগ্রেস সভাপতিরূপে জওহরলালের বিবৃতিকে কেন্দ্র করিয়া এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলেও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবটি পাঠক মনে কিছু বিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে মনে করিয়া "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি। মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "আমি নিশ্চয়ই ইহা লিখিতভাবে রাখিতে চাই যে, জওহরলালের বিবৃতি ভ্রমাত্মক। কংগ্রেস ইচ্ছামত পরিকল্পনার পরিবর্তন বা সংস্কার করিতে পারে এইরূপ উক্তি করা ঠিক হয় নাই। বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে তাহা আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম। তিনটি বিষয় যাহা কেন্দ্র পরিকল্পনা করিবে তাহা অপরিবর্তনীয় এবং অবশ্যপালনীয় কর্মসূচীভুক্ত থাকিবে, এবং বাকী বিষয়গুলি পরিচালনা করিবে প্রাদেশিক সরকার সমূহ,—তাহাও তিনটি এলাকাভুক্ত হইবে। এই ব্যাপারেও কোনক্রমেই এককভাবে কংগ্রেস কোন বিষয়

পরিবর্তন করিতে পারিবে না। এবং মিঃ জিন্নাহ্ এই পরিকল্পনাকেই লক্ষ্য করিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বলেন, 'ইহা অপেক্ষা আর কোন উত্তম শর্ত আদায় করা সম্ভবপর নহে।" (পৃঃ ১৫৫)

আজাদ লিখিয়াছেন, "এইরূপ অবস্থা উদ্ভবের জন্য আমি যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, আমি দেখিয়াছিলাম যে পরিকল্পনার সফলতার জন্য আমি যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলাম তাহা আমাদেরই কর্মদোষে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম তখনই কার্যকরী সমিতির সভা ডাকিয়া অবস্থার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। এই হিসাবে ৮ই আগস্ট কার্যকরী সমিতির সভা আহূত হয়। আমি দেখাইয়া দিই যে, যদি আমরা এই পরিস্থিতি রক্ষা করিতে চাহি তাহা হইলে আমাদের পরিস্কারভাবে বলিতে হইবে যে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির মনোভাব পূর্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতবাদ এমন কি কংগ্রেস সভাপতিও পরিবর্তন করিতে পারেন না। কার্যকরী সমিতি বর্তমানে যে একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা অনুভব করে। একদিকে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে অন্যদিকে যে সমাধান ব্যবস্থা আমরা বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে অর্জন করিয়াছি তাহা বিপদাপন্ন। কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতির বিরোধিতা, সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ করিবে. আবার কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা বর্জন দেশকে ধ্বংস করিবে। শেষ পর্যন্ত আমরা প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রস্তুত করি, তাহাতে জওহরলালের সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতির উল্লেখ থাকে না এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবকেই সমর্থন জানানো হয়।" পূর্বেই কার্যকরী সমিতির উভয় প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

অন্তর্বর্তী সরকার ও স্বাধীনতা

বৃটিশ সরকার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের এই সব বাদ-প্রতিবাদ লক্ষ্য করিলেও বিশেষ কিছু করিবার আছে বলিয়া মনে করে না, এবং মিশন পরিকল্পনার শর্ত অনুযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ১২ই আগস্ট কালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিবার জন্য আহ্বান জানান। মিঃ জিন্নাও এই দিনে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব আমাদের অন্যভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দেয় নাই, কেবলমাত্র সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির পুরাতন প্রস্তাবগুলি নূতন ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অতঃপর মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভায় যোগদান বর্জন করেন। ১৫ই আগস্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মিঃ জিন্নাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রী সভায় যোগদানের ব্যাপারে কোন প্রকার সুফল দেখা দেয় না।

সমস্যার কারণ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

একদিকে পণ্ডিত জওহরলাল তথা কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের উদ্যোগ এবং মিঃ জিন্নাহ্‌র মন্ত্রীসভায় যোগদান ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান অন্যদিকে বাংলা আসামের হিন্দুদের মুসলিম লীগের প্রতি বিরূপ মনোভাব, ঘৃণা ও তৃতীয় এলাকাভুক্তি হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা এবং তাহার জন্যে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় যে নারকীয় তাণ্ডব চলে, তাহা কাহার দোষে, কিভাবে সংঘটিত হয় সেই কলংকজনক ইতিহাস লিখিবার ও প্রকাশ করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া এস্থলে তাহার বর্ণনা দিতে সংযত রহিলাম।

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা লইয়া মাঝে মাঝে যেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন কখনো কখনো ভারতের

নেতৃবর্গ রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও সাংগঠনিক মর্যাদার অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করেন। ভুল বুঝাবুঝি এবং একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস যে এই সমস্যার একমাত্র কারণ তাহা ধরিয়া লইলেও ব্যক্তিগতভাবে নেতৃবর্গ নিজেদের উপর প্রয়োজন অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্ববোধ ও কর্তৃব্যভারের বোঝা নিজ স্কন্ধে লইবার প্রয়াসের ফলেই যে এইরূপ ঘটিতেছিল তাহা তখনও অনেকের মনে আক্ষেপের বিষয় হইয়া উঠে, এবং বর্তমানে যে কোন ইতিহাসের ছাত্রই তাহা বুঝিতে পারে।

গত এক বৎসরের মধ্যেই সকল বিষয়ে আপোষ-মীমাংসা হইবার পরও দেখা যাইতেছে যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ একত্রে কার্য করিতে অক্ষম হয়। সিমলায় অনুষ্ঠিত বৈঠক ব্যর্থ হইবার কারণ যতখানি উভয় সংগঠনের রাজনৈতিক কারণের জন্য নহে, তাহা অপেক্ষা বেশী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। তখন মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ দাবী করেন যে কোন মুসলমান সদস্যকে কংগ্রেস মনোনয়ন করিতে পারিবে না, কংগ্রেসও এই দাবীর নিকট নতি স্বীকার করে না। আর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতির ফলে যাহা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পর দুইটি সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন প্রকার বিরুদ্ধ আন্দোলন হয় নাই, এমন কি এই ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রকার চাঞ্চল্যও দেখা যায় নাই। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংগঠন ও নেতৃবর্গের মতভেদ ও কার্যকলাপের জন্য দেশের জনসাধারণকেই নানাভাবে তাহার খেসারত দিতে হইয়াছে সর্বাধিক।

নেহরু সম্বন্ধে আজাদ

যখন কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল সেইরূপ অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্বন্ধে মওলানা আজাদ 'ভারতের স্বাধীনতা লাভ' পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"জওহরলাল নেহ্‌রু, আমার প্রিয়তম বন্ধু, ছিলেন, ভারতের জাতীয় জীবনে তাহার অবদান সর্বাধিক। তিনি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতের ঐক্য সাধন এবং উন্নয়নের তিনি প্রতীক স্বরূপ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি অনেক সময় ভাবাবেগে তাঁহারা খেয়ালমত কার্য করিতেন; কেবলমাত্র তাহাই নহে অনেক সময় বাস্তব অবস্থার প্রতি তিনি উপযুক্ত মূল্য দিতেন না। তাঁহার অনুমান সাপেক্ষ কর্মের প্রতি প্রীতিই শাসন পরিষদ সম্পর্কে বিবৃতি দানের জন্য দায়ী। এইরূপ অনুমানের দুর্বলতা থাকিবার জন্য ১৯৩৭ সালে যখন ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখনও তিনি ভুল করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশে জমিয়ত-উল-উলেমার সাহায্যে লীগ যথেষ্ট কৃতকার্য হয়। জমিয়তের ধারণা ছিল যে লীগ কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবে। আমি যখন মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য লক্ষ্ণৌ আসি তখন চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও নবাব ইসমাইলের সহিত আলোচনা করি। মুসলিম লীগ পার্টি শুধুমাত্র সহযোগিতা করিবে তাহা নহে বরং কাংগ্রেস কার্যতালিকা মানিয়া চলিবে বলিয়া তাঁহারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন। অবস্থা এমন ছিল যাহাতে তাহাদের মধ্যে একজন মন্ত্রীসভায় যোগদান করিতে পারিতেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম যে উভয়কে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হইবে। চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং নবাব ইসমাইল কংগ্রেস কার্যতালিকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া একটি চুক্তিপত্রে সহিও করিয়াছিলেন। এমন সময় বিহারের মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আমি পাটনা যাই।

কয়েকদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল, খালেকুজ্জামান ও নবাব ইসমাইলকে এই বলিয়া পত্র দিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে একজনকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হইবে। এই জন্য তাঁহারা জওহরলালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহা উত্তর প্রদেশের জন্য নিতান্ত দুঃখজনক ঘটনা। যদি উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগ পার্টির সহযোগিতা গৃহীত হইত তাহা হইলে বাস্তবে মুসলিম লীগ পার্টি

কর্ম পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া যাইত। জওহরলালের কার্য-কলাপই উত্তর প্রদেশের মুসলিম লীগকে নূতন জীবন দান করে। ভারতের ইতিহাসের সকল পাঠকই জানেন যে, উত্তর প্রদেশ হইতেই লীগ নূতনভাবে পুনর্গঠিত হয়। মিঃ জিন্নাহ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাহাই পাকিস্তান গঠনের নেতৃত্ব দেয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে জওহরলালের এই বিষয়ে সকল কার্যের জন্য পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের প্রভাব পথ-প্রদর্শকের কার্য করিয়াছিল।"

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আমন্ত্রণ

পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ মনে-প্রাণে কতখানি হিন্দু মহাসভাপন্থী ছিলেন তাহা কাহারও অজানা ছিল না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মওলানা আজাদের সহিত ভারতের লোকসভায় উর্দু শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন যে তর্কবিতর্ক করেন তাহাতেই তাহার মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব আর একবার প্রকাশ পায়। মওলানা আজাদ পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:

"১৯৩৭ সালে জওহরলালের ভুল যথেষ্ট হইয়াছিল আর ১৯৪৬ সালের ভুলের জন্য তাহা অপেক্ষা আরও অধিকতর মূল্য দিতে হয়।"

উল্লেখ থাকে যে চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং নবাব ইসমাইলকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ না করিবার ফলে কেবলমাত্র মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা যে সম্ভবপর হয় নাই তাহা নহে বরং জাতীয়তাবাদী জমিয়ত-উল-উলেমা সংগঠনের প্রতিও কংগ্রেস কর্তৃক অবহেলা প্রদর্শিত হয়, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বাংলা এবং পাঞ্জাবে মন্ত্রীসভা গঠন সম্বন্ধে কংগ্রে-সের দূরদৃষ্টির যে অভাব দেখা গিয়াছিল তাহাও উল্লেখিত হইয়াছে।

তখনও কলিকাতা শান্ত হয় নাই, মানবহত্যার রক্তের দাগ তখনও কলিকাতার রাজপথ হইতে মুছিয়া যায় নাই, তখনও মানুষে মানুষে অবিশ্বাস কাটে নাই, বাতাসে তখনও রক্তের গন্ধ আর মানুষের মনে

বিদ্বেষের কলুষিত উৎকণ্ঠা কলিকাতা মহানগরীর গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় ভারতের বড় লাট লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ্‌কে শাসন পরিষদে অংশগ্রহণ করিয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে আমন্ত্রণ জানান। এটলী সরকারের মনোভাব যে মুসলিম লীগের অনুকূলে নহে এবং তাহার সকল দাবী যে এটলী সরকার কর্তৃক রক্ষিত হইবে না তাহা জানিয়া মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, আই, আই, চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার, গজনফর আলী এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম মুসলিম লীগ কর্তৃক ঘোষণা করা হয়। বাংলা প্রদেশ হইতে কেবল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন।

কলিকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ধারণা

কিন্তু উল্লেখ থাকে যে, মুসলিম লীগ অনেকদিন হইতেই তপশীল-ভুক্তদের রাজনীতি ক্ষেত্রে সহযোগীরূপে পাইয়াছিল। অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগ অংশগ্রহণ করিলেও সাধারণ রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন প্রকার সমাধান হয় না। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মুসলিম লীগের ধারণা ছিল যে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-সভার সদস্যগণের সহযোগিতায় হিন্দুমহাসভার সক্রিয়তা ও লর্ড ওয়াভেলের পরোক্ষ উৎসাহে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলিকাতায় উক্ত নারকীয় ঘটনা ঘটে। এই সময় লর্ড ওয়াভেল একবার কলিকাতা আসেন এবং অবস্থা নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করেন। নেতৃবর্গের সহিত আলোচনাকালে বাংলা প্রদেশের তদানীন্তন মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম প্রকাশ্যে লর্ড ওয়াভেলকে এইরূপ নারকীয় ঘটনার জন্য দায়ী বলিয়া উক্তি করেন: "লর্ড ওয়াভেল, আপনিই ইহার জন্য দায়ী।" নতুবা সারা ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ ঘটনা

ঘটিতে পারিত না। পূর্বাঞ্চলের সামরিক কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে বাংলার মন্ত্রীসভাকে সাহায্য দান করিলে এ ঘটনার সূচনা হইত না। কংগ্রেস মহল হইতে মুসলিম লীগকে দায়ী করিয়া বলা হয়; ভারত বিভক্তিকরণের উদ্দেশ্য সাধন কল্পেই এইরূপ দাঙ্গার প্রয়োজন ছিল। এই সকল অবস্থা হইতে বোঝা যায় যে রাজনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া এবং পরবর্তীকালে তপশীলদের প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ জিন্নাহ্ বাংলার তপশীল নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মনোনীত করেন। মুসলিম লীগের প্রতি তপশীল সম্প্রদায়ের মনোভাব কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে তপশীল নেতা ডঃ আম্বেদকরের মতবাদ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং পাকিস্তান পরিকল্পনার পক্ষে মত দিয়াছিলেন।

লিয়াকত ও প্যাটেল

মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্যগণকে অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে কোন্ কোন্ দপ্তর দেওয়া হইবে তাহা লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খানকে অর্থ দপ্তর দেওয়া স্থির হয়। কংগ্রেসের ধারণা ছিল নবাবজাদা অর্থ দপ্তর পরিচালনায় অকৃতকার্য হইবেন। কিন্তু দেখা যায় তিনি এমন এক বাজেট তৈয়ারী করেন যাহার ফলে শিল্পপতিগণ এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় চোরাকারবারীরা নূতন করভারের সম্মুখীন হয়, আর সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নূতন করভার হইতে মুক্তি পায়। কেবলমাত্র তাহাই নহে তিনি শিল্পপতিদের এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের গুপ্ত অর্থ ভাণ্ডারের সংবাদ লইবার জন্য কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে সারা ভারতের সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয় কিন্তু বহু কংগ্রেস নেতা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, এমন কি পরিষদে বিরোধিতা করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের স্বীকার করতে হয় যে, নীতি হিসাবে ইহাতে দেশের উপকার হইতে পারে, সেই জন্য

তাহারা বাজেটের বিরোধিতা করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। ইহা ছাড়াও সরকারের ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কঠোরতা ও রক্ষণশীলতার নীতি মানিয়া চলিবার ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ বিশেষ করিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ভীষণ বিরক্ত হন।

স্বাধীনতা লইয়া এটলি ওয়াভেলের মতবিরোধ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে বাংলা এবং আসামের হিন্দু জনসাধারণের মুসলিম লীগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব ভীষণ তীব্র ছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে কলিকাতায় দাঙ্গার জঘন্য রূপ গ্রহণ করিবার ইহাও অন্যতম কারণ। ইতিমধ্যে আসাম প্রাদেশিক সরকার যাহাতে আসামকে বাংলার সহিত তৃতীয় এলাকাভুক্ত হইতে না হয়, তাহার জন্য কংগ্রেস এবং সরকারী মহলে যথেষ্ট আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় শর্ত অনুযায়ী প্রথমে সকল প্রদেশকেই এক নির্দিষ্ট এলাকাভুক্ত হইতে হইবে, পরে জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী এলাকার বাহিরে যাইতে পারিবে। কিন্তু কোন কোন কংগ্রেস নেতার সমর্থনে প্রথমে এলাকাভুক্ত হইতে হইবে—এই শর্ত আসাম সরকার স্বীকার করিতে চাহে না। ইহা লইয়া উর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় এবং গান্ধীজীও আসাম সরকারের পক্ষে মত দেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার মুসলিম লীগের ব্যাখ্যা প্রথমে 'এলাকাভুক্ত হইবে' সমর্থন করেন, এবং এইরূপ ব্যাখ্যাই যথার্থ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তথাপি কংগ্রেস ব্যাখ্যা গ্রহণে অসম্মত হয়।

এই সময় মনে হইতে থাকে মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। কারণ তাহাদের পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার সমালোচনা উঠে নাই; বরং তাহারা কেন্দ্রীয় পরিষদে কতখানি দায়িত্ব পালন করিতে পারে তাহা দেখাইতে ব্যস্ত অন্যদিকে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেস কতখানি বিপর্যস্ত হয় তাহাও ছিল তাহাদের লক্ষ্যের বিষয়। কংগ্রেস কর্তৃক ১০ই আগস্টের

প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় "পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও আমরা সমগ্রভাবে মিশন প্রস্তাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি।" এই জন্য কংগ্রেস যাহাতে পুনরায় পরিকল্পনার বিরোধিতা না করিতে পারে তাহার জন্য মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। আসামের এলাকাভুক্তি সমস্যা সমাধানের জন্যও বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিঃ জিন্নাহ্ মুসলিম লীগ কাউন্সিল পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন, প্রথমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি তারপর কলিকাতায় দাঙ্গা ও আসামের এলাকাভুক্তির মত ব্যাপারগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো এই সকল কারণেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে পারে।

এইরূপের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী উভয় সংগঠনের নেতাদের বিলাতে একটি বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বাইরে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া শূন্য কোন স্থানে উভয় সংগঠনে নেতারা মিলিত হইলে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট তারিখ জানিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। বিলাতে ৩রা ডিসেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈঠক চলে এবং সেখানেও মিঃ জিন্নাহ্ বলেন, কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার স্বীকার করিয়া লইলে কংগ্রেস এলাকাগুলি গঠিত হইবার পূর্বে কোন প্রকারে তাহার বাহিরে থাকিবার সুযোগ পাইতে পারে না, ইহাই মিশন পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যাখ্যা। এলাকাগুলির শাসন ব্যবস্থা রচিত হইবার পর যদি জনসাধারণ মনে করে তাহা হইলেই তাহারা বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যার সহিত বৃটিশ সরকার একমত হয়। কিন্তু কংগ্রেস এবং আসামের নেতারা এইরূপ ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারেন না। ইহাতে মিঃ এটলী অভিমত প্রকাশ করেন যে, হিন্দু মুসলমানের সমস্যা ভারতের জনগণের সমস্যা, এই ব্যাপার লইয়া আমরা পূর্বের মত সময় নষ্ট করিতে পারি না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা একটি নির্দিষ্ট তারিখ বলিয়া দিব, তাহার মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া

হইবে। মিঃ এটলীর সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হইবার পূর্বেই ভারতকে স্বাধীনতা দান করা হইবে এইরূপ উক্তিকে কেন্দ্র করিয়া মিঃ এটলী এবং ভারতের বড় লাট লর্ড ওয়াভেলের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত লর্ড ওয়াভেল বড় লাটের পদ হইতে ইস্তফা দেন। লর্ড ওয়াভেল চাহিয়াছিলেন, মিশন পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া অন্তর্বর্তী সরকার অন্ততঃ দুই বৎসর শাসন পরিচালনা করিলে উভয়ের মধ্যে সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে। দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেহই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে না, ইহা ব্যতীত যখন মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে নূতন কোন দাবী নাই তখন আসামের এলাকাভুক্ত হইবার প্রশ্ন এবং অপরাপর ছোট খাটো সমস্যা অনায়াসেই মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এটলী সরকার সেইজন্য দুই বৎসর সময় নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড ওয়াভেল আরও বলেন যে দেড় শত বৎসর ভারতে বৃটিশ রাজত্ব করিবার পর যদি ভারতীয়দের বিবাদ ও মনোমালিন্য দূর করিতে না পারে, কিম্বা তাহার চেষ্টা না করিয়া ভারত ত্যাগ করে, তাহলে সকলেই বৃটিশ সরকরের পক্ষে কর্তব্যের অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিবে। কিন্তু মিঃ এটলী মনে করেন যদি আমরা শাসন চালাইতে থাকি এবং এই সকল সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করি,—যাহার জন্য যথেষ্ট সময় চিন্তা এবং উপযুক্ত শাসকের প্রয়োজন, তাহা হইলে ইহার মীমাংসা সম্ভব। ইহা ব্যতীত ভারতবাসী আমাদের উপর আস্থা হারাইবে এবং আমাদের প্রতিশ্রুতিকে অবিশ্বাস করিবে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ চূড়ান্তভাবে দেখা দেয় আর ভারতবাসীর নিকট ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের চিত্র অস্পষ্ট থাকিয়া যায়।

মাউন্টব্যাটেনের আবির্ভাব ও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধ

লর্ড ওয়াভেলের পরিবর্তে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ২২শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড় লাট রূপে দিল্লী আগমন করেন, এবং ২৪শে মার্চ ভাইসরয় ও বড় লাট রূপে শপথ গ্রহণ করেন, এবং এই দিনই তিনি

মত প্রকাশ করেন যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নিশ্চিতরূপে ভারতের সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বর্জনের ব্যাপারে আসামের ও কংগ্রেসের মতবাদ বিশেষভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এলাকা গঠিত হইবার পূর্বে কোন প্রদেশ এলাকা বহির্ভূত থাকিতে পারে এইরূপ দাবী কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হইবার জন্যই মুসলিম লীগ কেবিনেট পরিকল্পনা বর্জন করে। মুসলিম লীগ প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করিতে থাকে যে ভারতে বৃটিশশাসন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেস অপরিবর্তন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পর তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে বা উদ্যোগী হয় তাহা হইলে বৃটিশ শাসন অবসানের পর সংখ্যালঘুদের প্রতি কংগ্রেস বর্তমানে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছে বা দিতেছে তাহার উপর কোন প্রকারেই বিশ্বাস রাখিতে পারে না। অতীতে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, বর্তমানে ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটিবে না তাহা চিন্তা করা বাতুলতা। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতায় সমাধান সম্ভবপর সে সময় এইরূপ চিন্তা এক শ্রেণীর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যে চলিতে থাকে; কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার প্যাটেল এইরূপ মধ্যস্থতা মানিতে অস্বীকার করেন। তাহার ফলে পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে পূর্বভাব ফিরিয়া আসে। ওদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যেও যথেষ্ট মনকষাকষি বৃদ্ধি পায়। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল উভয়েই অর্থমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলীর নিকট আইনের কড়াকড়ি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে থাকে, বিশেষ করিয়া সর্দার প্যাটেলের অবস্থা আরও খারাপ হয়। তিনি মনে করিয়াছিলেন স্বরাষ্ট্র এবং দেশরক্ষা দপ্তর এই দুইটি দপ্তরই রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। বিশেষ করিয়া শাসন পরিচালনার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রই একমাত্র দায়িত্বশীল দপ্তর। অনভিজ্ঞ মারাঠা নেতা সেদিন বুঝিতে পারেন নাই যে অর্থ ব্যতিরেকে কোন দপ্তরই কার্যকরী থাকিতে পারে না। সে শিক্ষা তিনি নবাবজাদা

লিয়াকত আলী খানের নিকট পান এবং একথাও বুঝিতে পারেন যে অর্থমন্ত্রীর অবস্থা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের (কোষাধ্যক্ষ) ও খাজাঞ্চীর মত নহে। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং ভারতের হিন্দু মুসলমানের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে সর্দার প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া চিরদিনের জন্য কলংকময় হইয়া থাকিবে।

আবার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

শাসন পরিষদে যখন উভয় সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিদ্বেষভাব নীতি এবং আইনের আড়ালে সঞ্চিত এবং বর্ধিত হইতেছিল তখন কলিকাতার পর নোয়াখালী, বিহার ও বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সংঘটিত হয়। বাংলা প্রদেশে তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা চালু ছিল। ওদিকে নোয়াখালী একটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলা। দাঙ্গার পর সারা ভারতের প্রায় সকল সংবাদপত্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা ও মুসলমানদের কার্যকলাপকে হিন্দু-বিদ্বেষী জেহাদী যুদ্ধের আখ্যা দেওয়া হয়, আর বিহার এবং বোম্বাইয়ের দাঙ্গাকে নোয়াখালীর দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলা হয়। যে দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা শতকরা মাত্র ৮/১০ জন সেখানে তাহারা এইরূপ ভয়াবহ দাঙ্গার ইন্ধন যোগাইতে পারে তাহা আর যে কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আমি নিজে এইরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হইয়া বিশ্বাস করি না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পুলিশ রিপোর্টেও মুসলমানকে দায়ী করা হয়—সেই রিপোর্ট সত্য নহে। স্বাধীন ভারতে এইরূপ রিপোর্টের বিরুদ্ধেও সরকারী অনুসন্ধান ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইহার পর পাঞ্জাবে পাকিস্তানবিরোধী শোভাযাত্রা ও সভাকে কেন্দ্র করিয়া দাঙ্গা বাধে এবং ইউনিয়নিস্ট পার্টির সদস্য খিজির খাঁ প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। সমস্ত দেশের শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের মনে একদিকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ অন্যদিকে প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার আশংকা সকলকে ক্রমেই বিচার-বুদ্ধিহীন করিয়া তুলিতে থাকে।

ইংরাজ শাসক শ্রেণীও ক্রমশঃ দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখাইতে থাকেন, কারণ তাঁহারা তখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে আমরা একজন যুদ্ধ নায়ক লর্ড ওয়াভেলকে ভারতের বড় লাট রূপে ভারতীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইতে দেখিয়াছি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তাঁহার স্থলে বৃটিশ সরকারের বর্তমান নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পাঠানো হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতের হিন্দু-মুসলমান মনে করিয়াছিল যে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে যেমন নির্দিষ্ট সৈন্য সংখ্যা, নির্দিষ্ট গোলা-বারুদ ও হাতিয়ার লইয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যোদ্ধার করিতে হয় ঠিক সেইভাবেই কার্যসিদ্ধি করিবার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এটলি সরকার ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে জানা যায় ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি অর্থাৎ ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করা হইবে। কিন্তু সুদক্ষ লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিভাবে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই সকল কর্মে কৃতকার্য হইলেন তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটনই হইবে আমাদের লক্ষ্যের বিষয়।

যখন লর্ড ওয়াভেল সেনাপতি পদ হইতে সরিয়া আসিয়া বড় লাট হইলেন তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন মওলানা আজাদ এবং তিনি সকল দৌত্য কর্মে মিশনের সহিত কংগ্রেস পক্ষ হইতে সংযোগ স্থাপন এবং আলোচনার নেতৃত্ব দিতেছিলেন। সেদিনকার অবস্থা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের পর ভারতে পুনরায় যেভাবে মুসলমানদের হস্তে শাসনব্যবস্থার প্রাধান্য ও নেতৃত্ব চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া অনেক কংগ্রেসী নেতা ও হিন্দু মহাসভার সদস্যগণ মনে করিয়া ভীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহার যে প্রতিক্রিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করিবার সময় দেখা গিয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার পর হইতে জওহরলাল নেহরুর কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্বন্ধে

বিবৃতি, আসামের এলাকাভুক্তির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ও কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর সমর্থন যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাহার সহিত দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শাসন পরিষদে সর্দার প্যাটেলের ও নেহরুর সহিত নবাবজাদা লিয়াকত আলীর মনোমালিন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের নূতন পথ দেখাইয়া দেয়।

দেশ বিভক্তিকরণে কারা ছিলেন

কেবিনেট মিশন খোলাখুলিভাবে মিঃ জিন্নাকে তথা মুসলিম লীগকে ভারত-বিভক্তি অসম্ভব বলিয়া ব্যক্ত করেন, এবং মিঃ জিন্নাহও সেই প্রকার মতবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন প্রথমে সর্দার প্যাটেলকে তাহার পর নেহরুকে দেশ বিভাগে সম্মত করেন, আর সর্দার প্যাটেল ও নেহরু গান্ধীজীর দেশ বিভক্তিকরণের পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করিতে কৃতকার্য হন। পূর্বেকার মত সেদিন মওলানা আবুল কালাম আজাদের হস্তে এমন কোন শক্তি ছিল না যাহার সাহায্যে তিনি বিভক্তির প্রস্তাব রদ করিতে পারিতেন। তিনি সকলের নিকট গিয়াছিলেন ও আবেদন করিয়াছিলেন যাহাতে ভারত বিভক্ত না হয়, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সভা করিয়া ভারত-বিভক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে চাহিয়াছিলেন। খান আবদুল গফফার ভারত বিভক্ত হইলে তাঁহারা নির্যাতিত হইবেন, খোদাই খিদমতগার সংগঠনকে পাকিস্তান সরকার শত্রু সংগঠন বলিয়া আখ্যা দিবে ইত্যাদি আবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

যে কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে বর্তমানে তাহারাই সর্বপ্রথমে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারত-বিভক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন। এই ঘটনার পর বীতশ্রদ্ধ মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রাপ্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ প্রায় দুই শত বৎসর পর পুনরায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় নির্দিষ্ট হইল। এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য লর্ড

মাউন্টব্যাটেনকে বৃটিশ সরকার যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহার এক বৎসর পূর্বেই সেই কার্য সম্পন্ন হয়।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আর একটু বিশদ রূপে জানিবার প্রয়োজন আছে এবং তাহা কংগ্রেসের ভিতরকার মহলের সংবাদ সম্পর্কে, যাহা মওলানা আজাদ তাঁহার লিখিত "ভারতের স্বাধীনতা লাভ" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আলোচনার সুবিধার্থে তাহার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"অর্থদপ্তরে কয়েকজন পটু ও পুরাতন কর্মচারী ছিলেন যাঁহারা নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের পরামর্শ মত লিয়াকত আলী শাসন পরিষদে কংগ্রেসের সদস্যদের সকল প্রস্তাব কার্যকর করিতে বিলম্ব করিতেন কিম্বা করিয়া দিতেন। সরদার প্যাটেল বুঝিতে পারেন যে, যদিও তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথাপি লিয়াকত আলীর মত ব্যতিরেকে একটি চাপরাসির পদ পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াযান। এইরূপ করুণ অবস্থার মধ্যে কংগ্রেস সদস্যরা বুঝিতে পারেন যে, মুসলিম লীগকে অর্থ দপ্তর দিয়া ভুল করিয়াছেন। এইরূপ অচল অবস্থা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মনে ক্রমে ক্রমে ভারতকে বিভক্ত করিবার ভূমি সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন তিনি নূতন কৌশল খুঁজিতে আরম্ভ করেন তেমনি কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ভারত-বিভক্তির বীজ বপন করিতে থাকেন। ইহা লিখিতভাবে থাকা প্রয়োজন যে ভারতে সর্বপ্রথম সর্দার প্যাটেলই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যখনই লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করেন যে ভারত-বিভক্তি বর্তমানের জন্য সমস্যা সমাধান করিতে পারে তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে সর্দার প্যাটেল তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মুসলিম লীগের সহিত সর্দার প্যাটেল কাজ করিতে পারিবে না। সর্দার প্যাটেলও প্রকাশ্যভাবে বলিতে থাকেন যে লীগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাকে ভারতের কিছু অংশও দেওয়া যায়।"

মওলানা আজাদ অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, নবাবজাদা লিয়াকত আলী সকল সময় পরিষদের আইনের সীমার মধ্যে থাকিয়া কার্য করিতেন, সেইজন্য তাঁহার কার্যকলাপ সমালোচনার বস্তু হইলেও বেআইনী হইত না। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"জওহরলাল প্রথমে কোন ক্রমেই দেশ বিভক্তিতে মত দেন নাই বরং ভীষণভাবে বিভক্তির বিরোধিতা করেন, কিন্তু লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ক্রমে ক্রমে জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতা ভাঙিয়া দেন। ভারতে লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের আগমনের এক মাসের মধ্যেই দেশ পৃথকীকরণবিরোধী জওহরলাল বিভক্তিকরণের সমর্থক না হইলেও অন্ততঃপক্ষে এইরূপ চিন্তার সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন। আমার মনে হয় লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন ও কৃষ্ণমেননের প্রভাবও এ বিষয়ে জওহরলালকে প্রভাবান্বিত করে। আমি আমার দুই সহকর্মীকে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিরত থাকিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি সর্দার প্যাটেল ভারত-বিভক্তিবিরোধী কোন যুক্তি শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমি তাঁহার সহিত দুই ঘণ্টা আলোচনা করি। আমি তাঁহার উত্তর শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত ও দুঃখিত হই, যখন তিনি বলিলেন যে, আমরা পছন্দ করি আর না করি ভারতে দুইটি জাতি আছে এবং তাহা মানিয়া লওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই।"

সর্দার প্যাটেলের এইরূপ উক্তি মওলানা আজাদের পক্ষে দুঃখের কারণ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সর্দার প্যাটেলকে কংগ্রেস সভার বাহিরে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট এবং ঐতিহাসিকদের নিকট তাঁহার এরূপ উক্তি আদৌ দুঃখজনক ছিল না। পুনরায় মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন "তাহার পরও আমি বিভক্তির ব্যাপারে জওহর-লালের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন যে বিভক্তি খারাপ কিন্তু বর্তমান অবস্থা আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে সেই দিকে লইয়া যাইতেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে ভারত-বিভক্তি-করণের বিরোধিতা করিতে নিষেধ করেন। তিনি আরও বলেন,

'এইরূপ বিষয় সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতা করা আমার জন্য ভালো নয়।"

শেষের এই পাঁচটি বাক্য "বিরোধিতা করা আমার জন্য ভাল নয়"-এর মধ্যে দীর্ঘ দিনের হিন্দু-মুসলমাদের সমস্যা এবং তাহার পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে বলিলে ভুল হইবে। বরং তখনকার অবস্থাকে পণ্ডিত নেহরু সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিরোধিতা—যাহা অপরের জন্য ভালো হইত তাহা মওলানা আজাদের জন্য নহে; কারণ তাহার বহু পূর্বেই কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে মওলানা আজাদ জাতীয়তাবাদী অপেক্ষা মুসলমান বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। হয়তো তিনি তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পুনরায় মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "জওহরলালকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এইরূপ মত গ্রহণ করিতে পারি না। স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি আমরা ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিতেছি এবং বর্তমানে আমাদের পূর্ববর্তী কার্যক্রমের পুনরানুসন্ধান না করিয়া অধিকতর জলাভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছি। মুসলিম লীগ কেবিনেট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভারতের সমস্যাসমূহের একটি সন্তোষজনক সমাধান প্রায় দৃষ্টিপথে আসিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মিঃ জিন্নাহ উক্ত পরিকল্পনা বর্জন করিবার একটি সুযোগ পান।"

এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে সর্বশেষ অবস্থায় মিঃ জিন্নাহ কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ অপেক্ষা যাহারা ভারত-বিভক্তির সুযোগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ, তাহারাই এই বিভক্তির জন্য সর্বাধিক দায়ী। পুনরায় মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন, "আমাদের দ্বিতীয় ভুল হয় যখন লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগকে স্ব-রাষ্ট্র দপ্তর দিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা তাহা করি নাই। এইরূপ করিলে আমাদের পক্ষে অনতিক্রম্য অসুবিধা হইত না। কিন্তু সর্দার প্যাটেল স্ব-রাষ্ট্র দফতর নিজে রাখিবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন; এবং আমরা নিজেরাই মুসলিম লীগকে অর্থ দপ্তর দিয়াছিলাম। ইহাই আমাদের বর্তমান দুর্নীতির কারণ। আমি

জওহরলালকে সতর্ক করিয়া বলি যে, আমরা যদি ভারত বিভক্তকরণে সম্মত হই তাহা হইলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করিবে না। বিচারের ফল হইবে-যে ভারত বিভক্ত করিবার জন্য মুসলিম লীগ যতখানি দায়ী কংগ্রেসও ঠিক ততখানি দায়ী।

"তখন সর্দার প্যাটেল, এমন কি জওহরলালও, বিভক্তির সমর্থন করিতেছিলেন। একমাত্র গান্ধীজীই আমার শেষ আশা। তিনি নোয়াখালি ও বিহার ঘুরিয়া ৩১শে মার্চ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। প্রথমেই তিনি মন্তব্য করেন, 'এখন ভারত বিভক্তি ভয়ের কারণ হইয়াছে; মনে হয় বল্লভ ভাই এমন কি জওহর-লালও আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আপনি এখন কি করিবেন? আপনি কি এখন আমার পাশে থাকিবেন? না আপনিও পরিবর্তিত হইয়াছেন?' উত্তরে আমি বলি, 'আমি বিভক্তির বিরোধী। বিভক্তির বিরুদ্ধে আমার মত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। যখনই দেখি সর্দার প্যাটেল এমন কি জওহরলালও পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন তখনই দুঃখিত হই। আপনার কথায় তাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন এখন আমার একমাত্র ভরসা আপনি। আপনি যদি বিভক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তাহা হইলে হয়তো আমরা এখনও এই অবস্থা রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আপনি যদি ইহার সহিত জড়াইয়া পড়েন তাহা হইলে আমার ভয় হয়, আমরা ভারতকে হারাইব।' গান্ধীজী বলেন, "ইহাতে জিজ্ঞাসার কি আছে? যদি কংগ্রেস বিভক্তি মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহা হইবে আমার মৃতদেহের উপর। যতদিন আমি বাঁচিয়া আছি ততদিন ভারত-বিভক্তি প্রস্তাবে সম্মত হইব না। ইহাতে সাহায্য করিব না, এবং কংগ্রেসকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দিব না।'

"তাহার পর গান্ধীজী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সর্দার প্যাটেলের সহিত দুইদিন আলাপ করেন। এই সকল আলোচনার ফল আমি জানিতাম না; কিন্তু তাহার পর আমি যখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করি তখন আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা

গভীর এবং মর্মান্তিক আঘাত পাই। আমি লক্ষ্য করি তিনি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আমি অন্তরে আরও বেশী আঘাত পাই এবং আশ্চর্য হইয়া যাই যখন তিনি সর্দার প্যাটেলের যুক্তিসমূহের পুনরুক্তি করেন। আমি তাহার নিকট দুই ঘণ্টা ওকালতি করি, কিন্তু তাহার মনে কোন প্রকার ছাপ ফেলিতে অক্ষম হই। শেষে হতাশ হইয়া বলি যে, আপনি যখন এইরূপ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন তখন ধ্বংসের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। গান্ধীজী আমার কথার কোন উত্তর দেন না, তিনি বলেন যে, "আমি পূর্বেই পরামর্শ দিয়াছি যে মিঃ জিন্নাহ্‌কে সরকার গঠন করিতে দেওয়া হউক এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণকে তিনি বাছিয়া লউন। তিনি ইহাও বলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি যথেষ্ট অভিভূত হন।

আমি যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সহিত পরদিন সাক্ষাৎ করি তখন তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণ করে তাহা হইলে বিভক্তি রোধ করা যায়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইহাও স্বীকার করেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব মুসলিম লীগের পছন্দ হইতে পারে এবং হয়তো মিঃ জিন্নাহ্‌র সমর্থন লাভ করিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলালের বিরোধিতার জন্য এইরূপ প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। পরে গান্ধীজী আমাকে বলেন, 'অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যাহাতে ভারত বিভক্তি নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।"

উল্লিখিত উক্তির পুনর্বিশ্লেষণ কিম্বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত সম্মান, মতবাদ কিম্বা যুক্তি ভারত-বিভক্তির ব্যাপারে কতখানি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের কার্যকলাপের অন্তরালে ফল্গুধারার মত যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ সক্রিয় ছিল তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব

সম্পর্কে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত নেহরুকে বুঝিতে ভুল হইবে। এই সম্পর্কে মওলানা আজাদ লিখিয়াছেন: 'কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ভারত-বিভক্তির সর্বাপেক্ষা সমর্থক ছিলেন সর্দার প্যাটেল। যদিও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে বিভক্তি ভারতীয় সমস্যা সমাধানের সর্বাত্মক সমাধান ব্যবস্থা। তিনি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এবং আত্মসম্মানে আঘাত পাইয়া বিভক্তির পক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক প্রতি পদক্ষেপে বাধা দান তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। কেবলমাত্র ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি বিভক্তি ব্যবস্থা স্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে পাকিস্তান নামক নূতন রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর নহে, এবং দীর্ঘদিন তাহা স্থায়ী হইবে না। তিনি মনে করিয়াছিলেন পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিবেন। পাকিস্তান অল্পদিনের মধ্যে ধ্বংস হইবে এবং যে-সকল প্রদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহারা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হইবে।' (ভারতের স্বাধীনতা লাভ ২০৭ পৃষ্ঠা)

সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে যে সভা হয় তাহার বর্ণনা দিয়া আজাদ লিখিয়াছেন "আমি ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির বহু সভায় যোগদান করিয়াছি, কিন্তু এই সভায় উপস্থিত থাকা আমার দুর্ভাগ্য এবং অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সভাসমূহে কংগ্রেস ভারতের ঐক্য এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে সাংগঠনিক প্রস্তাব দ্বারা ভারত-বিভক্তির প্রশ্ন চিন্তা করিতেছে। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সর্দার প্যাটেল ও জওহরলালের বক্তৃতার পর গান্ধীজীকেও অংশগ্রহণ করিতে হয়। (পৃঃ ১৯৬-১৯৯),

"আমার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে এইরূপ আত্মসমর্পণ সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করি, কংগ্রেস কমিটি দুর্ভাগ্য-জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বিভক্ত ভারতের জন্য বিয়োগান্ত

ব্যাপার, এবং ইহার পক্ষে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে আমরা এই ঘটনাটিকে পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়াছি। তাহা হইলেও আমাদেরকে মনে রাখিতে হইবে যে জাতি এক এবং ইহার জাতীয় ঐতিহ্য এক থাকিবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অকৃতকার্য হইয়াছি এবং সেইজন্য দেশ বিভক্ত করিতেছি, আমাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহারও প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে আমাদের কৃষ্টি বিভক্ত হয় নাই। পানির মধ্যে একটি লাঠি নিক্ষেপ করিলে মনে হয় পানি বিভক্ত হইয়াছে কিন্তু লাঠি উঠাইয়া লইলে পানি সমান হইয়া যায়, বিভক্তির চিহ্নমাত্রও থাকে না।' সর্দার প্যাটেল আমার বক্তৃতা পছন্দ করেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় প্রায় সকল সময় আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে ভারতের বিভক্তি প্রস্তাব দুর্বলতা কিংবা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা নহে, বরং বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমাধান।

"এইরূপ বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্যেও কিছু সংখ্যক মিলনপ্রয়াসী ব্যক্তি ছিলেন। সকল সময় কংগ্রেসের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক সদস্য ছিলেন যাঁহারা জাতীয়তাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেও তাঁহারা চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা সকল সময় এই যুক্তি দেখাইতেন যে, কংগ্রেস যাহাই বলুক না কেন ভারতে কখনই এক প্রকার কৃষ্টি ছিল না, হিন্দু এবং মুসলমানদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে এইরূপ মনোভাব সম্পন্ন সদস্যরা হঠাৎ ভারতের ঐক্য রক্ষার শ্রেষ্ঠ দাবীদাররূপে মঞ্চে উপস্থিত হন। তাঁহারা বিভক্তি প্রস্তাবের ভীষণভাবে বিরোধিতা করেন, এবং বলেন যে ভারতের কৃষ্টি এবং জাতীয় জীবন বিভক্ত হইতে পারে না।

"প্রথম দিকের আলোচনার পর কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। পণ্ডিত পন্থ এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তৃতা প্রস্তাব গ্রহণে সমর্থ হন না। কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে আজ

পর্যন্ত যে মনোভাব ব্যক্ত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধিতা কিরূপে গৃহীত হইতে পারে ? সেই জন্যই গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়, তিনি সদস্যগণকে কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব সমর্থন ও গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করিলে ২৯জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এবং ১৫জন বিরোধিতা করেন। কিছু সংখ্যক সদস্য প্রকাশ্য-ভাবেই বলিতে থাকেন যে পাকিস্তানের হিন্দুদের কোন প্রকার ভীত হইবার কারণ নাই; কেননা ভারতে সাড়ে চার কোটি মুসলমান থাকিবে। যদি পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার হয় তাহা হইলে ভারতের মুসলমানদের তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কার্যকরী কমিটির সভায় সিন্ধু প্রদেশের সদস্যগণ ভীষণভাবেই বিভক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বপ্রকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক সদস্য প্রকাশ্যে না হইলেও গুপ্ত আলো-চনায় তাহাদের বলেন যে, যদি তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অসম্মান-জনক ব্যবহার পাকিস্তান করে তাহা হইলে ভারতে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে। এই প্রকারের আলোচনা ভবিষ্যতে কিরূপ বিপজ্জনক হইতে পারে তাহা মনে করিয়া আমি মর্মাহত হই। আমার মনে আছে আমাকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের কিরণশঙ্কর রায় এই সকল আলোচনার সংবাদ জানান। তিনি তদানীন্তন সভাপতি আচার্য কৃপালনীর নিকট এই মনোভাব প্রকাশ করেন এবং এইরূপ বিপজ্জনক আলোচনা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে ভারতে মুসলমানরা এবং পাকিস্তানে হিন্দুরা যথেষ্ট অত্যাচারিত হইবে এ বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু কেহই সেকথায় কর্ণপাত করেন না। বরং সকলে তাঁহার ভীত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা তামাশা করেন এবং সদস্যরা আরও বলেন পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার হইলে ভারতীয় মুসলমানদের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং তাঁহারা সেইরূপ ব্যবহার পাইবে। উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি প্রায় ক্রন্দন করিতে থাকেন।" (পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৯)

গফফার খানের ক্ষুব্ধতা

"গান্ধীজী যখন এই সভায় বিভক্তির পক্ষে মত দান করেন তখন সীমান্ত গান্ধী গফফার খান এমনভাবে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন যাহাতে তিনি একটি কথাও বলিতে পারেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি কার্যকরী কমিটিকে ইহা স্মরণ করাইয়া দেন এবং উক্ত কমিটির প্রতি আবেদন জানান যে, চিরকাল তিনি কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন, এখন যদি কংগ্রেস তাহাকে এবং সীমান্ত প্রদেশকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সীমান্ত প্রদেশে ইহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হইবে। শত্রুরা হাসিবে আর বন্ধুরা বলিবে—যতদিন সীমান্ত প্রদেশকে কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল, ততদিন তাঁহারা খোদাই খেদমতগারদের সমর্থন করিয়াছে। কংগ্রেস যখন সীমান্ত প্রদেশের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়াই এককভাবে মুসলিম লীগের সহিত মীমাংসা করিতে চাহে, এবং ভারত-বিভক্তির বিরোধিতা করে না বরং সমর্থন করে, তখন আবদুল গফফার খান পুনঃপুনঃ বলেন যে ইহা খোদারই খিদমতগারদের প্রতি কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ; খোদা-ই খিদমতগারদের বাঘের সম্মুখে ফেলিয়া দিবার মতই হইবে—ইত্যাদি বলিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি একটি করুণ চিত্রের বর্ণনা দেন।" (ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঃ পৃষ্ঠা ১১৬-১১৯)

উল্লেখিত কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সাধারণভাবে ভারতীয় মুসলমানদের শত্রুরূপে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন। ইহাদের সংখ্যা কম ছিল না এবং তাহাদের মনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবসরও ছিল না। যাহা হউক কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি আবদুল গফফার খানকে সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ভবিষ্যৎ সকল কর্মপন্থা গ্রহণের অধিকার দেয়। কিন্তু এই অধিকারের মূল্য কতখানি এবং পাক-ভারত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অবস্থা কি তাহা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও তাহার বাস্তব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য সেদিন সকল

জাতীয়তাবাদী মুসলমান অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সভা ত্যাগ করেন।

মুসলিম লীগ সদস্যদের মধ্যেও একই প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকেই বিভক্তির বিরোধিতা করেন, অনেকেই দুইটি রাষ্ট্রের পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করিতে থাকেন। বাংলা প্রদেশেরও শ্রীশরৎচন্দ্র বোস, শ্রীকিরণশংকর রায়, জনাব সোহরাওয়ার্দী, জনাব আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলা প্রদেশের বিভক্তি রদ করিয়া স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা রাষ্ট্র গঠনের আলোচনা করেন, কিন্তু তাহা বেশী দূর অগ্রসর হয় না। বিভক্তি প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত হইবার পরই এটলী সরকার ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতকে স্বাধীনতা দানের তারিখ নির্দিষ্ট করেন, এবং মিঃ র‍্যাডক্লিফকে উভয় রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণের যোগ্য ব্যক্তি মনে করিয়া প্রস্তাব করেন। মুসলিম লীগও কংগ্রেস কমিশনকে স্বীকার করিয়া লয়। ভারত বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী সাম্প্রদায়িকতা

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খণ্ডিত হইয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। ১৪ই আগস্ট পাঞ্জাব, সিন্ধুর অংশবিশেষ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পেশোয়ার, বেলুচিস্তানসহ স্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত হইল আর পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের অংশ লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হইলেও উভয় পাকিস্তানই একই প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পাকিস্তান হিসাবে পরিচিতি লাভ করিল। বাকী অংশটা ভারত সাম্রাজ্য হিসাবেই রহিয়া গেল। ইহার করদ ও মিত্র রাজ্যগুলিও ভারতের অন্তর্গত হইল। ১৪ই আগস্টের প্রথম প্রহরেই তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন পাকিস্তানের সীমানা ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা করিলেন আর ১৫ই আগস্ট ভারতের সীমারেখা ঘোষণা করিয়া স্বাধীন ভারতের সূচনা হইল। আদর্শবাদী হিন্দু-মুসলমানের মনে সেদিন যে ক্ষোভ দেখা গিয়াছিল চোখের পানিতে যে ব্যথা ও বেদনার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতা সূর্যের অস্ত যাওয়ার সময় হইতে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গত দুই শত বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতাকামী বহু যুবক আত্মদান করিয়াছে; স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শের পিছনে বুকের তাজা রক্ত দান করিয়াছে; ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে প্রাণ দান করিয়াছে; জেল জরিমানা, কালাপানির যন্ত্রণার সেই সব বেদনাবহ স্মৃতি এই সব দেশপ্রেমিকদের মনে যেমন মূর্ত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি অন্য দিকে মীর কাশিম, হায়দার আলী, টিপু সুলতান, বাহাদুর শাহ সহ অগণিত ভারতীয় স্বাধীনতাকামী মুসলমান ও হিন্দু যুবকের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইল চিন্তা করিয়া অনেকেই আনন্দবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাই হউক খণ্ডিত ভারত অনেকের বুকে আঘাত হানিয়াছিল। যাহারা অখণ্ড

ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁহারা গভীর দুঃখ ও হতাশায় নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। আর এর জন্য যাঁহারা দায়ী সে সকল নেতা খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রনায়ক হইয়া বিজয়ীর বেশে জনগণের সামনে হাজির হইলেন। কত আনন্দ কত হাসিখেলা। যে হিন্দু মুসলমান এতদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হেতু ক্ষুব্ধ মন লইয়া একে-অপরকে পছন্দ করিত না তাহারা আজ উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতীতের মনোমালিন্য ভুলিবার চেষ্টা করিল। কলিকাতার পথ গোলাপ আর আতরের খুশবুতে ভরপুর হইয়া উঠিল। অনেকেই মনে করিলেন সাম্প্রদায়িকতা রূপ বিষবৃক্ষটি শিকড়শুদ্ধ ধ্বংস হইয়াছে।

এই রকমের স্বাধীনতা লাভ যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ফল নহে তাহা রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী বৃটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "বৃটিশের উপনিবেশগুলো রক্ষা ও শাসন করিবার মত গ্রেটবৃটেনে উপযুক্ত যুবক ও শাসকের অভাব।" সেই কারণেই কেবল ভারতবর্ষ নহে বৃটিশ-শাসিত অনেক রাষ্ট্রকেই একের পর এক স্বাধীনতা দান করিতে হয়। তাই বলিয়া স্বাধীনতাকামী যে সকল নেতা ও কর্মী স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আত্মাহুতি দিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা কেহই কোন দিন ভুলিতে পারিবেন না; বরং তাঁহাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা সকলের মনে চিরদিন অম্লান হইয়া থাকিবে। এইরূপ পটভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় হিসাবে নিযুক্ত করায় কংগ্রেসী নীতিকে অনেক ভারতীয়ই সঠিক বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বোসের ইংরাজ-বিরোধী ভূমিকা ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যকলাপকে কংগ্রেস কর্তৃক অস্বীকৃতির ফলে ভারতীয় জনমনে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জাপানের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক করিয়া সুভাষচন্দ্রের বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্তৃক সমালোচিত হওয়াটাও অনেক ভারতীয়ই সঠিক বলিয়া মনে করেন নাই।

ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতবিরোধ ঘটে। মিঃ জিন্নাহ্ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন এবং প্রকাশ্যে বলেন যে যত অল্প জায়গাই পাই না কেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিবই এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে সেখানকার ভাইসরয় হইতে দিব না।

বিরূপ মাউন্টব্যাটেন

এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিবার ফলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব যেমন বাড়িয়া যায় তেমনি পাকিস্তানের স্বার্থ ক্ষুন্ন করার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার রাজনৈতিক সীমানা যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। এই অবস্থায় হিন্দু জনসাধারণ খুশী হইলেও মুসলমানদের মনে মাউন্টব্যাটেন-বিরোধী ক্ষোভ ফুটিয়া উঠে। বলা বাহুল্য মুসলমানদের সে ক্ষোভ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল না।

বিভক্তি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী হয় নি

এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান, আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের সীমারেখা যদিও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রবহমান নদীটিকে ধার্য করা হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, মুর্শিদাবাদের সীমান্ত ব্যতীত নদীয়া ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় একটা শুষ্ক খাল ছাড়া আর কিছুই নাই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বীরভূমের রামপুর হাট মহকুমা ও মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানভুক্ত না হইয়া পশ্চিম বাংলায় রহিয়া গেল। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণাকে বাদ দিয়া লোক দেখানো ভাবে খুলনা জেলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত করা হইল। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি সর্বতোভাবে ভঙ্গ করা হইল।

পাহাড়ী এলাকাতেও দেখা গেল ছোট ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশ-গুলি ভারতে পড়িয়াছে। আর নিম্নদেশ পড়িয়াছে পূর্ব পাকিস্তানে। এমনকি ছাতকের সিমেন্ট কারখানা পড়িয়াছে পূর্ব পাকিস্তানে। আর কাঁচামাল চুনাপাথরের ঢিপো পড়িয়াছে ভারতে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র দর্শনা চিনিকল ছাড়া কোন কল-কারখানাই পূর্ব পাকিস্তানে রহিল না। সেতাবগঞ্জে পড়িল চিনিকল ও গোটা তিনেক কাপড়ের কল। যাহাদের মালিক ছিল হিন্দু, সে ক'টিই থাকিল পূর্ব পাকিস্তানে। টাকার অভাবে সুতা ও তুলার আমদানী যে সম্ভব হইবে না সে কথা জানিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইল। সারা ভারতে হিন্দু জনসাধারণ কয়েক মাসের মধ্যেই আর্থিক সংকটে পাকিস্তান ধ্বংস হইয়া যাইবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বিভক্তিতে জনগণের খেদ

নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর এলাকার সীমারেখা এমনভাবে নির্ধারিত হইল, যাহাতে অনেক লোকের বসত-বাড়ীও বিভক্ত হইয়া গেল—পায়খানা রান্নাঘর একদিকে আর বসতঘর পড়িল অন্যদিকে। বণ্টন নামার এ রকম অবস্থা দেখিয়া অনেকেই কংগ্রেসের বিরূপ সমালোচনা করিতে থাকেন। এবং খোলাখুলিভাবে বলিতে শোনা যায় যে, ভারত বিভক্ত করিয়া কংগ্রেস অন্যায় করিয়াছে।

ইহা অপেক্ষা পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন কর্তৃক ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তিনটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট করা অনেক ভাল ছিল। তাহাদের অনেকেই মিঃ জিন্নাহ্‌র দূরদৃষ্টির প্রশংসা করিতে থাকেন।

যখন পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখা লইয়া জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যায়, তখন মিঃ শরৎ বসু, মিঃ কিরণশংকর রায়, মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মিঃ আবুল হাশিম প্রমুখ জননেতা-গণ আসাম মণিপুর ও বাংলাসহ বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠা করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাদ সাধিয়াছিলেন কংগ্রেস সংগঠন। অচিরেই এরূপ সিদ্ধান্ত সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

বাস্তবে দেখা গেল সমগ্র বাংলা ও আসাম লইয়া যে পূর্ব পাকিস্তান গঠন করার কথা ছিল তাহাও হইল না। অতঃপর শুধুমাত্র ভারতই বিভক্ত হইল না, বিভক্ত হইল পশ্চিম পাঞ্জাব এবং বাংলা ও আসাম; আর তাহার জনগণের আশা-আকাংক্ষা। পারিবারিক সম্মান ও সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পৈতৃক সম্পত্তি যেমনভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ঠিক তেমনিভাবেই জাতীয় স্বার্থের প্রতি নজর না রাখিয়া ভারত বিভক্ত হইল। ফলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ পুনরায় অংকুরিত হওয়ার জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে থাকিল।

দিল্লীতে দাঙ্গা

এই রকম হিংসা ও বিদ্বেষের মধ্যে যখন সীমারেখা স্থির হইল, তাহার কিছু দিন পরেই দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সর্দার প্যাটেল প্রমুখ শান্তিশৃংখলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের শান্তি রক্ষা ব্যাপারে নিশ্চয়তা ও উদাসীনতা, এমন কি জঙ্গি মনোভাব সম্পন্ন হিন্দু দাঙ্গাকারীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দুনিয়ার সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করে। এমনকি গান্ধীজী অসহায় বোধ করিতে থাকেন এবং নেতাদের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়েন। প্রায় দু'মাস দাঙ্গা চলে, পরে ধীরে ধীরে গান্ধীজীর চেষ্টায় দাঙ্গা বন্ধ হয়।

পাঞ্জাবে দাঙ্গা

তারপরই পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার নগ্ন নৃশংসতা সকলকে বিস্মিত করে। প্রচার করা হয় সংখ্যালঘু মুসলমানরাই ঐ সকল

দাঙ্গার জন্য দায়ী। শান্তি শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ ও মুসলমানদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। কিন্তু গান্ধীজী এই সকল প্রচারণার বিরোধিতা করেন। পাঞ্জাবের দাঙ্গা থামিয়া গেল কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব মুসলমান শূন্য হইল আর পশ্চিম পাঞ্জাবেও কোন হিন্দু থাকিল না। এইভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইল।

পশ্চিম বাংলা ও আসামের সীমান্ত এলাকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যেমন কলিকাতা আসিল না তেমনি ভাগীরথীর পূর্ব তীরে অবস্থিত কলকারখানাগুলোর একটিও তাহার ভাগ্যে জুটিল না।

সাম্প্রদায়িকতার পুনরাবৃত্তি

পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে অচিরেই যে অর্থ সংকট দেখা দিবে সে বিষয়ে সকলেই একমত হইয়া ভবিষ্যতের দুর্দশার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ্ তাঁহার মতের কোন পরিবর্তন করিলেন না। এ অবস্থার মধ্যে একদিকে পূর্ব বাংলা হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, যাহারা কোনদিনই মুসলমানদের সহ্য করিতে পারে নাই তাহারা, ঘৃণাবশে মুসলমানদের উপর নানা রকমের অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল। মুসলমানদের অচ্ছুত ও হরিজনদের মত মনে করিত বলিয়া তাহারা এ এলাকা পাকিস্তান হইতে পারে বুঝিতে পারিয়া ১৪ই আগস্টের পূর্ব হইতেই পূর্ব বাংলা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া যাইতে থাকে। আসামের সিলেট অঞ্চলের হিন্দুরাও ঠিক একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পাকিস্তান ঘোষণার পর এধরনের হিন্দু নর-নারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম সত্য-মিথ্যা অত্যাচার অনাচারের কথা ফলাও করিয়া প্রকাশ করে এবং পশ্চিমবাংলা ও আসামের দিকে পা বাড়ায়। যেখানেই তাহারা গিয়াছে তদানীন্তন আসাম ও পশ্চিম বাংলা সরকার মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার আশেপাশে তাহাদের

থাকিবার যেমন ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তেমনি এসকল বাস্তুহারারা স্থানীয় মুসলমানদের উপর নানা রকম অত্যাচারও শুরু করে। অনেক সময় মনে হইত বাস্তুহারা হিন্দুদের এরূপ জঘন্য ব্যবহারের পিছনে হয়তো বা সরকারের মদদ আছে। বাস্তুহারারা কোথাও জবরদস্তি মুসলমানদের বাড়ী দখল করে, কোথাও মুসলমানদের মাঠের ফসল জোর করিয়া বাড়ী নিয়া যায়, কোথাও ভালো-ভালো গাছের ডাল-পালা কাটিয়া জ্বালানী করে, কোথাও কোথাও বা পুকুরের মাছ লুটপাট করে। এসব কাজে বাধা দিলে অথবা আপত্তি জানাইলে খুন-জখম ও বাড়ীঘরে আগুন লাগানো চলিতে থাকে। থানায় অভিযোগ করিলে সেখানেও এধরনের বাস্তুহারা কর্মকর্তা থাকায় মুসলমানরা কোন রকমের সাহায্য পায় না। বরং মুসলমানদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল মুসলমানদের কাছে বন্দুক ছিল সরকার সেসব জমা নিয়া নেন। মুসলমানরা মুসলিম লীগ করিয়াছিল বলিয়া সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেওয়া হয় না। এমনকি যাহাদের চাকুরী ছিল তাহাদেরও চাকুরী হইতে অনেক ক্ষেত্রে বিদায় দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসী মনোভাবসম্পন্ন মুসলমানরাও এ সকল অত্যাচার হইতে রেহাই পায় না। কিন্তু দেখা যায় বৃটিশ আমলে যে সকল হিন্দু-পুলিশ অফিসার ও সরকারী কর্মচারী কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের ঘৃণ্য অত্যাচার করিয়াছিল তাহারা বহাল তবিয়তে খোশ মেজাজে চাকুরীতে বহাল থাকে। সমাজের মধ্যেও এসকল ব্যক্তি একটা কংগ্রেসী টুপি মাথায় দিয়া নির্ভেজাল কংগ্রেস হইয়া যায় ও মুসলমান নিধন অত্যাচারে ইন্ধন জোগাইতে থাকে। যে কংগ্রেস সংগঠন সকল সময় প্রচার করিত যে দেশ স্বাধীন হইলে, বৃটিশ শাসনের অবসান হইলে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ থাকিবে না, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইল। একদিকে যেমন পূর্ব পাকিস্তান হইতে কৌলিন্য বজায় রাখিতে হিন্দুগণ পশ্চিমবাংলা ও আসামে চলিয়া গেল তেমনি পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা জীবন ও মান ইজ্জত বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমাইলো।

মুসলমান খেদা আন্দোলন

কিছুদিন পর যখন আসামে কংগ্রেসী রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল তখন 'মুসলমান খেদা' নামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকমের অত্যাচার শুরু হইল, এমন কি হাতি দিয়া আসাম হইতে মুসলমান বিতাড়নের ব্যবস্থা করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেসী নেতারা থাকিলেন নির্বাক, আবার অনেক কংগ্রেস নেতাই চুপি চুপি এরকম কার্যকলাপকে সমর্থনও জানাইলেন।

"বাঙাল খেদা" আন্দোলন

তাহার কিছুদিন পর 'মুসলমান খেদা' স্তিমিত হইয়া আসিলেও দুর্গাপূজার প্রাক্কালে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন শুরু হয়। ধর্মনির্বিশেষে অগণিত বাঙালী শিশু ও নারীর উপর নির্বিচারে অত্যাচার শুরু হয়। যাহার ফলে বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারী ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাংলায় আসিয়া আশ্রয় লইল। আসামে সাম্প্রদায়িক রূপ যে কত নিকৃষ্ট ও হিংস্র তাহা সেদিন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের অহিংস নামাবলীর আচ্ছাদনেও ঢাকা যায়। শেষ পর্যন্ত আসাম সরকার কি করিতে চায় তাহাও কেহ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না।

একদিন এই আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বিরোধিতার কারণে এবং সারা ভারত কংগ্রেসী কর্মকর্তা, নেতা ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে বৃটিশ পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন কর্তৃক ঘোষিত ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব বাতিল করা হয়। এই ব্যবস্থাপনা যে ভারত বিভক্তির অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

বহিরাগত বিতাড়ন আন্দোলন

আজ আসামে 'মুসলমান খেদা' বন্ধ হইয়াছে 'বাঙাল খেদা' বন্ধ হইয়াছে। শুরু হইয়াছে বহিরাগত বিতাড়ন আন্দোলন। দুঃখ ও

লজ্জার কথা হইলেও ইহাই বাস্তব সত্য যে আসামবাসী চায়—"আসামে অবস্থিত যে কোন ভারতীয় ভারতেই বহিরাগত।" এই আঞ্চলিকতাবোধ যে অগণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদবিরোধী সে বিষয়ে সকলেই একমত হইলেও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহাই দেখিবার বিষয়।

কলিকাতায় দাঙ্গা

দেশ বিভক্ত হইবার সাথে সাথে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "ভারতীয় কোন মুসলমান পাকিস্তানে বাস্তুহারা হইয়া আসিতে পারিবেন না।" কিন্তু বিরূপ অবস্থার চাপে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানের উভয় অংশে বাস্তুহারা রূপে যাইতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে ভারতের কংগ্রেস সরকার পাকিস্তানী হিন্দুদের ভারতে যাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করার ফলে পাকিস্তান হইতে হিন্দুদের ভারতে চলিয়া যাওয়ার কার্যক্রম পুরাদমে চলিতে থাকে। ফলে পশ্চিম বাংলা ও আসামের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিতে থাকে। এমন কি ১৯৫০ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় বেশ বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া যায়। এই দাঙ্গা কেবলমাত্র কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি বাঙলার সর্ব পশ্চিম প্রান্ত বর্ধমান জেলাতে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা সমিতি স্থাপন করে। ইস্পাত নগরী আসানসোল হইতে শুরু করিয়া কয়লাখনির মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যেও নানাবিধ অত্যাচার চলিতে থাকে; এবং অনেক শ্রমিক পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসে। বর্ধমান ও বিহার শহরেও লুঠতরাজ, খুন-জখম ইত্যাদি চলিতে থাকায় মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের একটা বিরাট অংশ দেশ ছাড়িয়া পাকিস্তান চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা

ছোটখাট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সকল সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চলিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরেও দাঙ্গা শুরু হয়। কিন্তু মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও জনগণের চাপে দাঙ্গাকারীরা একদিনের মধ্যে দাঙ্গা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এই দাঙ্গায় হিন্দুদের জীবনরক্ষার জন্য ঢাকার মুসলমান যুবকগণ তৎপর হইয়া উঠে এবং নিজেদের প্রাণ দিয়া এই দাঙ্গা বন্ধ করে। এই দাঙ্গ বন্ধ করিতে যাইয়া দুইজন মুসলমান যুবক শহীদ হয়। সেই হইতে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিন্দুদের জাতীয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর কলিকাতায় শ্রীমতি মৈত্রী দেবীর চেষ্টায় ও স্বর্গীয় জয়প্রকাশ নারায়ণ, জনাব কাজী আবদুল ওদুদ, জনাব ফখরুদ্দিন আলী আহমদ, জনাব হুমায়ুন কবির, শ্রী ডক্টর সেন, শ্রীমতি সুভদ্রা দেবী, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ সমাজসেবীগণ মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করেন।

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

দুঃখের বিষয় আজিও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয় নাই। পূর্বে যেমন বলা হইত বৃটিশ সরকারই সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করিত এবং তাহাদের শাসনের অবসান হইলেই সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না—তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য নহে তাহা প্রমাণিত হইল। অবশ্য ইহা আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে যে ইংরেজ সরকারই তাহাদের শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে সকল সময় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ফলে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সবসময়ই কার্যকরী থাকে

এবং সকল লোকই সময় ও অবস্থার সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। তাহা ছাড়াও অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ, যেমন সময় বিশেষে সক্রিয় হইয়া উঠে তেমনি জাতীয়তাবোধহীন কুসংস্কার অশিক্ষা ও কুশিক্ষা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উস্কানী দেয় না বরং সাম্প্রদায়িকতার উৎস স্বরূপ হইয়া দেখা দেয়। সেজন্যই শান্তিকামী জনসাধারণ ও সরকারকে সকল সময় এরূপ শত্রুর বিরুদ্ধে সজাগ থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তবে দেখা যায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে '৬৪ সালের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হইলেও আজিও ভারতে এরূপ দাঙ্গা বন্ধ হয় নাই। বরং এলাকা বিশেষে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের জন্যে ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের পূর্ব পাকিস্তানের যুবশক্তি প্রবল আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক লইয়া মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থায় বৈষম্য, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে বৈষম্য যাতে না থাকে এবং করুণামূলক দান যাহাতে অবিলম্বে বন্ধ হয় সে জন্য শাসক গোষ্ঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু দেখা যায় তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বৈষম্যের কথা মুখে স্বীকার করিলেও বাস্তবে যা কিছু করণীয় ছিল সে সম্বন্ধে সময়োচিত ব্যবস্থা লইতে বিলম্ব করার ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের প্রেসিডেন্ট হন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের কর্ণধার ও সভাপতি ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো পিপলস পার্টির নেতা ও সভাপতি ছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসনের অবসান

ঘটাইয়া দেশে গণতান্ত্রিকতা ফিরাইয়া আনার জন্য বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিলেন এবং পাকিস্তানের উভয় অংশে সাধারণ নির্বাচন দিলেন। নির্বাচনে দেখা গেল শেখ মুজিবুর রহমান ও তাহার আওয়ামী লীগ দল সর্বাপেক্ষা অধিক আসন দখল করিয়াছেন; কিন্তু ভুট্টো সাহেব ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের চক্রান্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দেওয়া হইল না। বরং পূর্ব পাকিস্তা-নের যুবশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করা হইল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে স্তিমিত স্বাধীনতা আন্দোলন সত্যিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হইল। আওয়ামী লীগের বহু নেতা ও সদস্য জীবনরক্ষার জন্য ভারতে চলিয়া গেলেন। বহু যুবক ও সৈনিকও পাকিস্তানী সামরিক-জান্তার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত সরকার গোপনে এসকল মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খান যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধে পাকিস্তান যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জয়লাভের কোনই আশা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানেও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভারতীয় সৈনিকরা মিলিত হইয়া স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করিল। লক্ষাধিক পাকিস্তানী সৈনিক ও অফিসার ভারতীয় ও মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। প্রতিষ্ঠিত হইল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীন বাংলাদেশে দাঙ্গা হয় নাই

স্বাধীন বাংলাদেশ হইবার পর এখানে কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও দাঙ্গা হয় নাই বা দেখা যায় নাই। কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এ পর্যন্ত সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় সাড়ে তের হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়াছে, এর ফলে জান ও মালের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও তুলনাহীন।

বাংলাদেশে হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন,

তাঁহারা স্বাধীনভাবে রুজী-রোজগার করেন, পূজাপার্বণ করেন, এসব বিষয়ে কোন মুসলমান কোন দিনই বাধা দেয় নাই। হিন্দুরা তাহাদের পরিবারের বেশীর ভাগ লোককেই ভারতে রাখিয়াই বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করেন সেজন্যও কোন বাংলাদেশী মাথা ঘামান নাই। কিন্তু ভারতে নামাজের জামাতে শূকর ছাড়িয়া দিয়া, মসজিদে শূকরের মাংস ফেলিয়া দাঙ্গার সূত্রপাত করা হয়। এছাড়াও আরও বহু রকমের অজুহাত তো আছেই।

হরিজনদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা

ইদানীং ভারতে সাম্প্রদায়িকতা শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যে হইতেছে তাহা নহে হরিজনদের বিরুদ্ধেও ইহা সংঘটিত হইতেছে। বাংলাদেশে হরিজন যে নাই তাহা নহে, মেথর-ঝাড়ুদার ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর বহু লোক আছে—যাহাদের ভারতে অচ্ছুত বলা হয়, কিন্তু কাজের সময় ছাড়া তাহারা যে হরিজন একথা কেউ কোনদিন চিন্তা করিতে পারে না। হাটে-ঘাটে কাফে, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হলে, ধর্মস্থানে তাহারা অবাধে যাতায়াত করে, উঠে-বসে, খায়দায়, সব কিছুই করে; ছুৎমার্গের কোন প্রশ্নই এখানে নাই। বাংলাদেশে কেহই অচ্ছুৎ নহে।

গো-হত্যা বন্ধ আন্দোলন

কয়েক বছর আগে গান্ধীজীর বিশিষ্ট অনুগামী কংগ্রেসী নেতা, হিন্দু সমাজের অধ্যাত্মবাদী গুরু, বিনোবাভাবে, যিনি ভূ-দান যজ্ঞে নেতৃত্ব দেন তিনি হঠাৎ করিয়া ধুয়া তুলেন, হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ভারতে গো-হত্যা বন্ধ করিতে হইবে। এব্যাপারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহের এই বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, গো-বধ বন্ধ না করিলে তিনি সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করিবেন। প্রয়োজন হইলে তিনি আমরণ অনশন করিবেন

বলিয়া হুমকি দেন। এ বিষয়ে খোলাখুলি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের ইঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যতীত ভারতের অপর সকল রাজ্য সরকার গো-হত্যা বন্ধ নিবারণ আইন পাশ করেন। গো হত্যা বন্ধ হইল। মুসলমান ও অহিন্দুদের গো-মাংস খাওয়া বন্ধ হইল। এমনকি মুসলমানদের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোরবানীও ইহাতে ব্যাহত হইল। মনে রাখিতে হইবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এরূপ আইন যে ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহোক এরূপ কার্যকলাপের মূলে যে প্রবণতা বা ইচ্ছা কার্যকরী হইতে দেখা গেল, তা যে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনের বহিঃপ্রকাশ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন

ইদানীং আসামে-পাঞ্জাবে, অন্ধ্রে ও আরও বিভিন্ন রাজ্যে স্বায়ত্ত শাসনের আওয়াজ তুলিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। আঞ্চলিকতার চিন্তাধারা অখণ্ড ভারত চিন্তাধারার বিরোধী যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইল ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে বারবার এ অবস্থার উদ্ভব কেন হয়? এ ব্যাপারে কি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব দায়ী? সেখানে কি মুসলমানরা তেমন সাম্প্র-দায়িক হইবার ক্ষমতা আজিও রাখে? ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ত ইহাকে সত্য বলিতে পারে না। তবে প্রকৃত সত্য কি?

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	১৪	বাংলার পার্টিকে	বাংলার প্রজা-পার্টিকে
১৯০	৯	এ সঙ্গে	এ প্রসঙ্গে
২০২	২০	কংগ্রেসের	কংগ্রেসকে
২৫৮	১৬	ডঃ আহমেদ কর	ডঃ আম্বেদকর
২৮৫	১১	ভাই হিন্দু মহাসভা	তাই হিন্দু মহাসভা
২৮৭	৩	খণ্ডিত ভারত হইয়াছে	'খণ্ডিত ভারতে' লেখা হইয়াছে
৩০১	৪	শত	শর্ত
৩০৬	২০	যায় না	থায় না

IFB-82-83-P-3139 3250-1-2-1983

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৯	মনোভাব হইয়াছিল	মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল।
২২	৮	কার্লমার্কস কতিপয় বৃটিশ	কার্লমার্কসসহ কতিপয় বৃটিশ।
২৪	২৭	প্রজা ও কৃষকমূলক	প্রজা ও কৃষককূলকে
৪১	১৯	পক্ষম	পঞ্চম
৪২	২৬	নিরত	নিরত
৪৫	২৬	জনাব বদরুদ্দিন তৈয়বুজী	জনাব বদরুদ্দিন তৈয়বজী
৫৭	২২	কর্মচারী	কার্যকরী
৬৬	৪	অতি বিলম্বে	অনতি-বিলম্বে
৭১	১	রহমতুল্লা পিয়ানী	রহমতুল্লাহ সিয়ানী
৮১	৮	গণতন্ত্র সংশোধিত	শাসনতন্ত্র সংশোধিত
৮৯	২৫	এই নির্ভীক ও	এই নির্ভীক
৯০	৬	চক্রির চক্রান্ত তাহা পূর্ণ	চক্রির চক্রান্ত তাহা চূর্ণ
৯৮	২	"আল-বালাবা প্রেস"	আল্-বালাগ্ প্রেস
৯৯	৩	পুলিস মিঃ ওয়াকার	পুলিশ সুপার মিঃ ওয়াকার
১১৫	৭	মালাকয়-জেলার	মালাবার জেলার
১১৬	১৯	যুক্ত প্রদেশের কাটারপুর	যুক্ত প্রদেশের কাটারপুর
১১৬	২১	হিন্দু মহাভারত	হিন্দু মহাসভার
১১৭	২১	কয়েকটি বিষয় হইয়াও	কয়েকটি বিষয় লইয়াও
১২১	১৩	হঠাৎ খসিতে পারে না	হঠাৎ আসিতে পারে না
১৪৬	৫	মূল অবশ্য	মূল্য অবশ্য
১৪৬	২৩	মনে রুটির স্বার্থ	মনে হয় রুটির স্বার্থ
১৪৯	১৯	যথেষ্ট নিরপেক্ষ ভূতে	যথেষ্ট নিরপেক্ষ ভাবে
১৬৭	২১	Couiibutory	Contributory

গ্রন্থপঞ্জী

১।	ভারতে মুসলিম রাজনীতি	শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
২।	ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া	শ্রীজওহরলাল নেহরু
৩।	খন্ডিত ভারত	শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ
৪।	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা	শ্রীনরহরি কবিরাজ
৫।	মুসলিম ইন্ডিয়া	মহাম্মদ নোমান
৬।	ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা	মেহতা পট্টবর্দ্ধন
৭।	প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন	কমরেড মুজফফর আহমদ
৮।	ভারতীয় সংগ্রাম	শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস
৯।	কংগ্রেসের ইতিহাস	শ্রীপট্টভি সিতারামাইয়া
১০।	বৃদ্ধ হিন্দু বালা	রাজনারায়ণ বসু
১১।	দি ইন্ডিয়ান মুসলমান	হান্টার
১২।	দি ইন্ডিয়ান এনুয়েল রেজিস্টার	মিত্র
১৩।	ভারতের হিন্দু-মুসলমান	শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী
১৪।	এশিয়ার সাম্রাজ্য	টরেন্স
১৫।	মারাঠাদিগের ইতিহাস	গ্রান্ডডাফ
১৬।	স্টেটসম্যান অব ইন্ডিয়া	রবার্ট বাইরন
১৭।	ইন্ডিয়া ইন মেকিং	স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
১৮।	ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম	মওলানা আবুল কালাম আজাদ
১৯।	লর্ড মিন্টোর জীবনী	মিঃ বুকান
২০।	নেহরু জিন্নাহ্ পত্রালাপ	শ্রীজে.বি. কৃপালনী
২১।	পাকিস্তান পরীক্ষিত	জনাব রেজাউল করিম
২২।	পাকিস্তান ভারতের সখ্যতা	জনাব শওকতুল্লা আনসারী
২৩।	ও, পি, সি, আইন	দুররানী
২৪।	মেরে বিচার	লালাহর দয়াল
২৫।	পলিটিক্যাল ইন্ডিয়া	স্যার জন ক্যানিং